খ্রীষ্টধর্মের প্রাথমিক জগৎ ও এর পটভূমি
The World of the First Christianity and its Background
পাষ্টর এস. এ. পলাশ সম্পাদিত

IBC/BACIB

পাষ্টর এস. এ. পলাশ সম্পাদিত

খ্রীষ্টধর্মের প্রাথমিক জগৎ ও এর পটভূমি

The World of the First Christianity and its Background

পাষ্টর এস. এ. পলাশ (এম.টিএইচ)
সম্পাদিত

খ্রীষ্টধর্মের প্রাথমিক জগৎ ও এর পটভূমি

The World of the First Christianity and its Background

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC) ও বিব্‌লিক্যাল এইড্‌স ফর চার্চেস এন্ড ইনষ্টিটিউশন ইন বাংলাদেশ (BACIB)

খ্রীষ্টধর্মের প্রাথমিক জগৎ ও এর পটভূমি

The World of the First Christianity and its Background

Copyright © International Bible Church (IBC) and Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

The materials are taken from following books as well as from open internet sources:

1. Edwin Yamauchi, *The World of the First Christians* (Lion Publishing, England, 1981)
2. Carter Lindberg, *A Brief History of Christianity* (Blackwell Publishing, 2006).
3. Michael Grant, *Jesus: An Historian's Review of the Gospels* (New York: Scribner's 1977)
4. Vernon H. Neufeld, *The Earliest Christian Confessions* (Grand Rapids: Eerdmans, 1963)
5. Walter Bauer, *Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity* (Sigler Press, 1971).
6. Frederick Fyvie Bruce, *The Canon of Scripture* (Intervarsity Press, 1988).
7. P. R. Ackroyd and C. F. Evans, *Cambridge History of the Bible, Volume 1*, (Cambridge University Press, 1970).
8. S.J.D Cohen, *From the Maccabees to the Mishnah* (Westminster Press, 1987).
9. Oscar Cullmann, *The Early Church: Studies in Early Christian History and Theology,* (Philadelphia, Westminster, 1966).
10. H.J. De Jonge, "The New Testament Canon," in *The Biblical Canons,* eds. de Jonge & J. M. Auwers (Leuven University Press, 2003) p. 309

Research, Study, Edit and Re-write: Pastor Shamsul Alam Polash (M.R.E; M. Th)

Translators of Various Sources: Bitu Bakshi and Samuel A. Ricky

Graphics design and Maps: Ruth Salome

This book **'The World of the First Christianity and its Background'** has been developed and printed under the partnership program with **DCB Foundation**, USA.

Price: BDT 300.00
US$ 5.00

Published by:
International Bible Church (IBC) and Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email: 01714075742; contact@ibc-bacib.com; bacib123@yahoo.com
Visit website: **https://ibc-bacib.com**

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের কিছু কথা	৯
মুখবন্ধ	১০
যিহূদীদের জগৎ	১৩
রোমীয় শাসনের অধীনে যিহূদীরা	১৫
ম্যাক্কাবীয়দের বিদ্রোহ	১৫
আন্তিয়খস (১৭৫-১৬৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)	১৫
রোমীয়দের বিজয়	১৭
হেরোদ	১৮
হেরোদীয় স্থাপত্য	২৩
রোমীয়দের পেশা	২৪
যিহূদীদের চোখে রোমীয়দের পেশা	২৬
উদ্‌যোগীগণ	২৮
যিহূদীদের বিদ্রোহ	৩০
মাসাদা দুর্গ	৩২
যিরূশালেমের পতন	৩৪
বার কোচবা বিদ্রোহ	৩৬
চিঠির গুহা	৩৭
হিব্রু ও অরামিক ভাষা	৪১
যিহূদীদের ধর্মীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়	৪৫
শমরীয় সম্প্রদায়	৪৫
ফরীশী সম্প্রদায়	৪৬
এসেনিস সম্প্রদায়	৪৮
সদ্দূকী সম্প্রদায়	৫১
সমাজ-ঘর	৫২
মিশনাহ্‌ ও তালমুদ	৫৫
রোম সাম্রাজ্য জুড়ে থাকা যিহূদীরা	৫৭
মিশরের যিহূদীরা	৫৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
সিরিয়ার যিহূদীরা	৬০
তুরস্ক ও গ্রীসের যিহূদীরা	৬১
মেসোপটেমিয়ার যিহূদীরা	৬৪
ইতালির যিহূদীরা	৬৫
যিহূদী ও খ্রীষ্টিয়ান	৬৭
পৌরাণিক কাহিনী ও কাল্ট ধর্ম-বিশ্বাস	৭১
গ্রীক ধর্ম-বিশ্বাস	৭২
প্রথম রহস্যময় ধর্মানুষ্ঠান	৭২
ডায়োনাইসাসের গুপ্ত ধর্মানুষ্ঠান	৭৪
অর্ফিয়াস ও তার ধর্মগোষ্ঠী	৭৬
অলিম্পিয়ান দেবতারা	৭৭
গ্রীক দর্শন	৮১
পিথাগোরাসের মতবাদ	৮১
দার্শনিকরা যেসব শব্দ ব্যবহার করতেন	৮৩
প্লেটো	৮৫
প্লেটোর অনুসারীগণ	৮৮
অ্যারিস্টটল	৯১
অ্যারিস্টটলের অনুসারীরা	৯২
সংশয়বাদী	৯৩
পিরহোন	৯৩
হতাশাবাদী	৯৪
বৈরাগ্যবাদী	৯৭
গ্রীক ভাষা	৯৭
গ্রীকদের শিক্ষা	৯৯
ক্লিন্থেস	১০১
ক্রিসিপাস	১০২
প্যানেশাস	১০২
পসিডোনিয়াস	১০৩
রোমীয় বৈরাগ্যবাদীরা	১০৩
প্রেরিত পৌল ও বৈরাগ্যবাদ	১০৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্টোয়িক (বৈরাগ্যবাদী) শিক্ষা	১০৭
ভোগবাদীরা	১০৮
মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মসমূহ	১১১
সিবিলস	১১২
‘মহান মাতা’	১১৩
ইফিষের দেবী আর্তেমিস/ দীয়ানা	১১৪
আইসিস ও সেরাপিস	১১৫
ফৈনীকিয়া ও সিরিয়ার দেবতা	১১৭
অরেলিয়ান (২৭০-৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)	১২০
মিথ্রাস	১২০
মিশরীয় জ্যোতিষশাস্ত্র	১২২
জ্ঞানবাদীরা	১২৩
জ্ঞানবাদীদের শিক্ষা	১২৫
রোম সাম্রাজ্য	১২৭
সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি	১২৮
রোমের সূচনা	১২৮
রোম প্রজাতন্ত্র	১২৯
রোমের ইতালি জয় করার নির্ঘন্ট	১৩১
রোমের সম্প্রসারণ	১৩২
রোমের বিজয়	১৩৩
আভ্যন্তরীণ অস্থিরতা	১৩৭
যুলিয় সিজার (কৈসর)	১৩৮
সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি	১৩৮
সাম্রাজ্যের নেতৃবর্গ	১৪১
সম্রাট আগস্ত	১৪১
তিবিরিয়	১৪২
গায়	১৪৩
ক্লৌদিয়	১৪৩
নিরো	১৪৪

বিষয়	পৃষ্ঠা

ফ্লাভিয়ান সম্রাটগণ ---- ১৪৫
ভ্যাসপাসিয়ান ---- ১৪৫
তীত (টাইটাস) ---- ১৪৬
ডমিশিয়ান ---- ১৪৬
নার্ভা ---- ১৪৭
বিদেশী সম্রাটগণ ---- ১৪৭
ট্রাজান ---- ১৪৭
খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি রোমীয়দের দৃষ্টিভঙ্গী ---- ১৪৭
সেভেরি ---- ১৫১
কারাকাল্লা ---- ১৫১
এলাগাবালাস ---- ১৫১
খ্রীষ্টধর্ম ও সম্রাটগণ ---- ১৫২
ডেসিয়াস ---- ১৫২
ডায়োক্লিশান ---- ১৫২

সাম্রাজ্যের সংগঠিতকরণ ---- ১৫৫
রোম সরকার ---- ১৫৫
রোমীয় কর ব্যবস্থা ---- ১৫৬
রোমীয় সৈন্যবাহিনী ---- ১৫৮
লিজিয়ন (বাহিনী) ---- ১৫৮
লিজিয়ন সৈন্যের কর্মকর্তারা ---- ১৬০
শতপতি ---- ১৬০
বেতন ও সাজ-সরঞ্জাম ---- ১৬০
বাহিনী সৈন্যদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ---- ১৬১
সহায়ক সৈন্যবাহিনী ---- ১৬২

রোমের জনগণ ---- ১৬৫
সিনেট সভার সদস্যগণ ---- ১৬৫
অশ্বারোহী সৈন্য ---- ১৬৬
দরিদ্র শ্রেণী ---- ১৬৭
দাস-দাসী ---- ১৭০
দাসত্ব থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দাস-দাসী ---- ১৭৫

বিষয়	পৃষ্ঠা

রোমীয়দের জীবন ও বিশ্বাস ———————— ১৭৭
সামাজিক প্রতিষ্ঠান ———————— ১৭৮
বিয়ে ও বিয়ে-বিচ্ছেদ ———————— ১৭৮
রোমীয়দের শিক্ষা ———————— ১৮২
অপরাধ ———————— ১৮৪
রোমের ব্যবসা-বাণিজ্য ———————— ১৮৫
ভারতের সাথে রোমের ব্যবসা-বাণিজ্য ———————— ১৮৭
সমুদ্রযাত্রা ———————— ১৮৮
বই ও গ্রন্থাগার ———————— ১৮৯
রোমীয়দের ভাষা ———————— ১৯১
প্রাচীন বিশ্বের ঔষধ ———————— ১৯৪

রোমীয় শহর ও নগর ———————— ১৯৭
রোমীয়দের ভবন ও দালানগুলো ———————— ১৯৭
কৃত্রিম নালা ———————— ১৯৯
আবর্জনা পরিত্যাগ ———————— ২০০
স্নানাগার ———————— ২০১
রোমীয় সড়ক ও জনপথ ———————— ২০৩

খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন ———————— ২০৯
রোমীয় নাটক ———————— ২০৯
রথের দৌড় প্রতিযোগীতা ———————— ২১০
গ্লাডিয়েটর ও (বিনোদনমূলক) রক্তাক্ত খেলা ———————— ২১২

রোমীয়দের ধর্ম ———————— ২১৭
রোমীয়দের দেব-দেবতারা ———————— ২১৭
দৈববাণী ———————— ২২০
সম্রাটের উপাসনা ———————— ২২২
যিহূদী ও খ্রীষ্টিয়ান ———————— ২২৪

খ্রীষ্টধর্মের প্রাথমিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত-সার ———————— ২২৯
যীশু খ্রীষ্টের জীবন (২-৮ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ২৯-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) ———————— ২৩০

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রারম্ভিক খ্রীষ্টধর্ম (৩৩-৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ)	২৩১
প্রেরিতিক চার্চ	২৩১
যীশু খ্রীষ্টের উপাসনা করা	২৩২
যিহূদী ধর্মের শিক্ষার ধারাবাহিকতা	২৩৩
খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপর নির্যাতন এবং প্রেরিত পরবর্তী চার্চ	২৩৩
চার্চের বা মণ্ডলীর কাঠামো	২৩৪
প্রারম্ভিক খ্রীষ্টিয় লেখাগুলো	২৩৫
প্রারম্ভিক প্রচলিত ধর্ম-বিরুদ্ধ বিশ্বাস	২৩৬
পবিত্র বাইবেলের ক্যানন	২৩৭
রোমান সাম্রাজ্যে চার্চের বিস্তৃতি (৩১৩-৪৪৬)	২৩৯
খ্রীষ্টধর্মের আইগত বৈধরূপ	২৩৯
মহান কনস্টানটাইন	২৪০
ডায়োসিস (বিশপদের এক্তিয়ারভূক্ত এলাকা) কাঠামো	২৪৩
পোপের শাসন এবং তার প্রাধান্য	২৪৩
ইকুমেনিকাল কাউন্সিল	২৪৪
নাইসিন এবং পোস্ট-নাইসিন পিতাগণ	২৪৫
পেন্টার্কি	২৪৫
সন্ন্যাসবাদ	২৪৬
পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা	২৪৭
এক নজরে খ্রীষ্টিয় ধর্ম-বিশ্বাসের বিজয়	২৫০
নতুন নিয়মের পটভূমি ও প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব	২৫১

প্রকাশকের দুটি কথা

বাংলাদেশের খ্রীষ্টিয় সমাজের লোকদের হাতে আমরা পবিত্র বাইবেলের নানা রকম অধ্যয়ন পুস্তক তুলে দেবার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে চলছি। আমরা ইতমধ্যেই অনেক পুস্তক প্রকাশ করেছি এবং খ্রীষ্টিয় সমাজের অনেক লোক তা অধ্যয়ন করছে পবিত্র বাইবেলের উপর জ্ঞানার্জনের জন্য। আমরা 'অধ্যয়নের গভীরতায় ...' নামক একটি অধ্যয়ন সিরিজ প্রকাশ করেছি এবং এর প্রকাশনা এখনও চলছে। আশা করি এই সব পুস্তকের মাধ্যমে যারা পবিত্র বাইবেলের উপর গভীর জ্ঞান অর্জন করতে চান তারা অনেক উপকৃত হবেন।

এবার আমরা আমাদের সাধারণ প্রকাশনা থেকে একটু ভিন্নধর্মী পুস্তকের উপর কাজ করেছি। আপনাদের হাতে যে পুস্তকটি তুলে দিচ্ছি তাতে নতুন নিয়ম ও প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টধর্ম ও এর পটভূমি এবং এর অনুসারীদের বিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবেন।

আমরা সবাই জানি যে, প্রায় দুই হাজার বছর ধরে খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বে এবং সমাজের মূল্যবোধের উপর একটি বড় প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্থিরতার সময় এটি রোমীয় সাম্রাজ্যের অস্পষ্ট এক কোণে শুরু হয়েছিল। প্রথম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা যা লিখেছিলেন এবং অনুভব করেছিলেন তা তাদের নিজস্ব সময়ে নিহিত ছিল। সুতরাং, সেই সময় সম্পর্কে বোঝার মধ্য দিয়ে নতুন নিয়মের ঘটনাসমূহ এবং শিক্ষাকে আরও সহজে বোঝা যায়। এই বইটিতে খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে সাধারণ মানুষের আশ্চর্যজনক পরিশীলিত জীবনধারা এবং তাদের কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাসের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পাঠকদেরকে গ্লাডিয়েটরদের খেলাধুলা এবং পৌত্তলিক মন্দিরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, সাথে সাথে যিহূদী সম্প্রদায়, গ্রীক চিন্তাবিদ এবং রোমান সম্রাটদেরও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুস্তকটিতে শাসক ও শাসিতদের ঘরবাড়ি ও পরিবেশের বর্ণনা রয়েছে। পুস্তকটিতে আকর্ষণীয় রঙিন ফটোগ্রাফ এবং বিশেষভাবে নির্ধারিত মানচিত্র এবং চিত্রগুলো এই প্রজন্মের জন্য প্রথম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বিশ্বকে পুনরায় উস্থাপন করতে সহায়তা করে। আশা ও বিশ্বাস করি পুস্তকটি পাঠের মধ্য দিয়ে যারা পবিত্র বাইবেল বিশেষ করে নতুন নিয়ম ও প্রাথমিক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে চায় তাদের কাছে এটি একটি মাইল ফলক হিসাবে কাজ করবে।

আমরা বিশ্বাস করি, পাঠক এই পুস্তকটি থেকে নতুন নিয়মের পটভূমি সম্পর্কে অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন এবং মণ্ডলীর সেবাকর্মে ও মণ্ডলী স্থাপনে আরও ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারবেন। পরিশেষে যারা এই পুস্তকটি প্রস্তুত করতে আমাদেরকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন তাদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মঙ্গলময় ঈশ্বর সদাপ্রভু তাদের সকলকে নিরন্তর মঙ্গল দান করুন।

ধন্যবাদান্তে,
পাষ্টর এস. এ. পলাশ (এম, টিএইচ)
এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান, আই.বি.সি ট্রাষ্ট

মুখবন্ধ

গ্রীক ও রোমীয়দের রাজত্বকালটা ছিল একটি সাংস্কৃতিক মোড় পরিবর্তনের সময়কাল। খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দী ছিল রোমীয় সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পর্যায়। তখন কেবল সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে নয়, কিন্তু নতুন চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা করেও তারা নতুন নতুন দেশ জয় করেছিল। জয় করার সঙ্গে সঙ্গে নতুন রাস্তাঘাট ও শহর নির্মিত হয়েছে এবং তারা তাদের সাথে নতুন ধর্ম, রীতিনীতি ও সংস্কৃতি সেই সব জায়গায় নিয়ে গেছে। সেই সময় থেকেই মূলত আধুনিক বিশ্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত এক কোণে, যিহূদিয়া, শমরীয়া ও পলেষ্টিয়দের ভূচিত্রে অন্য এক ধরণের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। রোমীয় শাসন আমলে রোমীয়দের মদদপুষ্ট যিহূদী ও রোমীয় বিরোধীদের নজরের বাইরে, একটি নতুন ধর্মীয় আন্দোলন শুরু হয়েছিল। যিরূশালেম থেকে শুরু হওয়া সেই আন্দোলন এক শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ ইউরোপ এবং আফ্রিকা ও এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনশো বছর পরে এটি রোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হয়েছিল।

সমস্ত প্রত্যাশা ছাড়িয়ে খ্রীষ্টধর্ম তার প্রাথমিক বিরোধীদের উপহাস গুড়িয়ে দিয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, এটি তৎকালীন বিশ্বকে একেবারে উলট-পালট দিয়েছিল। যে সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্মের জন্ম হয়েছিল, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এটি সেই সাম্রাজ্যের চেয়ে আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, এবং তা দীর্ঘস্থায়ী রূপ লাভ করে পুরো বিশ্বের পরিবর্তনের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছিল।

যখন এর যাত্রা শুরু হয়েছিল, খ্রীষ্টধর্ম তখনকার রাজনৈতিক ঘটনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। যীশুর জন্মের বড়দিনের গল্প শুরু হয়েছিল, 'সরাইখানায় কোনো জায়গা ছিল না' এরকম বক্তব্য দিয়ে। সম্রাট একটি আদমশুমারির আদেশ জারি করেছিলেন যে আদেশের কারণে যিহূদী পরিবারগুলোকে তাদের পূর্বপুরুষদের বাড়িতে ফিরে যেতে হয়েছিল। এর ত্রিশ বছর বা তার পরে দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেওয়ার অজুহাতে যীশুকে রোমীয় আইনের অধীনে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। খ্রীষ্টধর্মের প্রথম মহান মিশনারী, তার্ষের পৌল, তার বার্তা ঘোষণার জন্য সমসাময়িক সাহিত্যের জ্ঞান এবং তাঁর রোমীয় নাগরিকত্ব উভয়ই ব্যবহার করেছিলেন।

এই নতুন বিশ্বাসের উপর রোমীয় রাজনীতির একমাত্র প্রভাব ছিল না। গ্রীক সংস্কৃতি ও গ্রীক সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত (হেলেনিস্টিক) বিশ্ব– এর উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। 'সাধারণ' গ্রীক ভাষা সেই সময়কার বাণিজ্য, ভ্রমণ এবং সংস্কৃতির

ভাষা হিসাবে প্রাচীন বিশ্বে ব্যবহৃত হত। প্রায়শই তাদের নতুন শহর, তাদের থিয়েটার এবং মার্কেট, চমৎকার রাস্তা, মন্দির এবং জনসাধারণের ভবনগুলো প্রাথমিক খ্রীষ্টধর্মের জন্য ব্যবহৃত হতে লাগল। তাই ধর্মপ্রচারের জন্য এটি একটি ভাল সূচনা ছিল। যদিও যীশু এবং তাঁর সময়কার অনুসারীরা অরামিক ভাষায় কথা বলতেন, কিন্তু 'নতুন নিয়মের' লক্ষ্য ছিল তখনকার পরিচিত বিশ্বের সমগ্র জনগণ; তাই এটি গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছিল। আর এর লেখার বিষয়বস্তুগুলো গ্রীক চিন্তাধারাগুলোকে বিবেচনায় নিতে হয়েছিল, যাতে এর পাঠকরা সুসমাচারের বার্তাকে সহজে গ্রহণ করতে পারেন।

পরবর্তীতে, গ্রীক দর্শন খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের মূলকে হুমকির মুখে ফেলেছিল, যখন এটি মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্বের সাথে একীভূত হয়েছিল। কিন্তু গ্রীক দর্শন খ্রীষ্টধর্মের অনুসারীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার কারণে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীকে ও এর শিক্ষাগুলোকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংজ্ঞায়িত করতে প্ররোচিত করেছিল।

সুতরাং, খ্রীষ্টধর্মের উত্থান তার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির উল্লেখ ছাড়া সম্পূর্ণরূপে বোঝা যাবে না। এই বইয়ের উদ্দেশ্য সেই প্রেক্ষাপট তুলে ধরা। নতুন নিয়মের সাথে ক্রমাগত এর ক্রসরেফারেন্স থাকায়, এই ছবিটি জটিল হয়ে ওঠে না। এগুলো তখনই উল্লেখ করা হয়েছে যখন প্রসঙ্গ তা দাবি করে। যীশু, পিতর, পৌল এবং তাদের অনুসারীদের কাহিনীগুলো তাদের সাংস্কৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী পুনরায় বলা এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। বরং, এটি বিজয়ী এবং যাজক, স্থপতি, পণ্ডিত, যোদ্ধা এবং বণিকদের জগতের সাথে সম্পর্কিত, যারা যীশুর এবং নতুন মণ্ডলীর আগমনের জন্য মঞ্চের পিছনের পর্দা তৈরি করেছিল।

ফলাফল হিসেবে এটি এমন একটি বই যেটি নতুন নিয়মের উপর আলোকপাত করে এবং প্রথম শতাব্দীর একটি তথ্যপূর্ণ ভূমিকা প্রদান করে। এর মূল লক্ষ্য হল নতুন নিয়ম এবং নতুন নিয়ম পরবর্তী খ্রীষ্টধর্মের প্রসারের কারণ বোঝার ক্ষেত্রে এটির পরিবেশ উপলব্ধি করা আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা দেখানো। এটি যে ঘটনাগুলো নথিভুক্ত করেছে তা একটি বাস্তব জগতে, ইতিহাসের একটি প্রকৃত সময়ে এবং এমন জায়গাগুলোতে সংঘটিত হয়েছিল যা আজও দেখা যায়, সেগুলোর ছবি তোলা যায় এবং উপলব্ধি করা যায়।

পুস্তকটি পাঠের মধ্য দিয়ে নতুন নিয়মের ছাত্র-ছাত্রীরা ও উৎসাহী খ্রীষ্টভক্তগণ গ্রীক-রোমীয় সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পরিবেশে খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বাস কিভাবে নতুন দিক-দর্শনের হাতছানি দিয়ে নতুন বিশ্ব গড়ে তুলেছে তা বুঝতে পারবেন।

খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের নির্যাতনের উদ্দেশে শৌল মহাপুরোহিতের কাছ থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে দামেস্কে যাওয়ার পথে প্রভু যীশু তাঁকে যে দর্শন দেন এটি তারই একটি কল্পিত চিত্র।

যিহূদীদের জগৎ

প্রাচীনকালে যিহূদীদের মাতৃভূমি হিসেবে পরিচিত বর্তমান ইস্রায়েল দেশ ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট একটি দেশ। এটি উত্তরের দান অঞ্চল থেকে দক্ষিণের বের-শেবা পর্যন্ত কেবল ১৫০ মাইল (২৪০ কিলোমিটার) এবং পশ্চিমের যাফো থেকে পূর্বের যিরীহো শহর পর্যন্ত ৫০ মাইলেরও (৮০ কিলোমিটার) কম জায়গা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এর ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন কিছুটা বেলজিয়ামের চেয়ে ছোট এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভার্মন্ট অঙ্গরাজ্যের চেয়ে কিছুটা বড়।

মিশর ও মেসোপতেমিয়ার মাঝে স্থল যোগাযোগের পথ হিসেবে যিহূদিয়া, শমরীয়া, পলেষ্টিয়া তথা বর্তমান ইস্রায়েল দেশের অবস্থান প্রধান শক্তিগুলোর কাছে খুবই উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছিল। মগিদ্দো গিরিপথের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সড়কটিকে নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য সেখানে অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডারের মৃত্যু এবং ৩০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অনুষ্ঠিত ইপসোসের যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ইস্রায়েল দেশটি দখলের জন্য মিশরীয় ও সিরিয় সৈন্যবাহিনীরা যুদ্ধে সাত বার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল, অথবা তারা দেশটিকে দখল করেছিল।

যীশু খ্রীষ্টের সময়ে ইস্রায়েল দেশের মানচিত্র

রোমীয় শাসনের অধীনে যিহূদীরা

ম্যাক্কাবীয়দের বিদ্রোহ

গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডারের বিজয়ের ফলে গ্রীক সংস্কৃতি ও ভাষা অনেক জায়গাতে ছড়িয়ে পড়েছিল। আলেকজান্ডারের অনুবর্তী হওয়া সেনাধ্যক্ষগণ, মিশরের টলেমি এবং সিরিয়ার সেলুকাস তাদের নিজস্ব বিষয়গুলো শাসন প্রণালীর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন যা গ্রীক ও স্থানীয় উপকরণের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিল।

আন্তিয়খস (১৭৫-১৬৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

৪র্থ আন্তিয়খস এপিফেইনস ছিলেন একজন সেলুসিড শাসনকর্তা, যিনি গ্রীক সংস্কৃতিকে উন্নীত করার প্রচেষ্টার দ্বারা যিহূদীদেরকে একটি বিদ্রোহের জন্য খেপিয়ে তুলেছিলেন (এই প্রক্রিয়াকে সচরাচর 'গ্রীককরণ' বা হেলেনাইজেশন বলে উল্লেখ করা হতো)। আর এই বিষয়ে তিনি সম্ভ্রান্ত যিহূদীদের সমর্থন লাভ করেছিলেন, যারা সাংস্কৃতিক দিক থেকে "গ্রীক" হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে একজন যিহূদী মহাযাজকের ভাই তার 'যীশু' নামটি পরিবর্তন করে গ্রীক নাম 'যাসোন' রেখেছিলেন। আর তিনি মহাযাজক হওয়ার জন্য আন্তিয়খসকে ঘুষ দিয়েছিলেন। তিনি একটি শরীরচর্চা কেন্দ্র নির্মাণ করে অন্য যিহূদীদের সুনামকে ক্ষুন্ন করেছিলেন কারণ সেখানে নগ্নভাবে পরিচালিত শরীরচর্চা মন্দির থেকে দেখা যেতো। এক সময় যাসোন স্পার্টাতে নির্বাসনে গিয়ে নিজেকে শেষ করে দিয়েছিলেন।

আন্তিয়খস যিহূদীদের বিশ্রামবার পালন ও ত্বক্‌চ্ছেদ নিয়ম নিষিদ্ধ করেন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যে সব খাবার অশুচি হিসেবে বিবেচিত হতো এমন খাবার তাদেরকে খেতে বাধ্য করেছিলেন। এই সময় একজন যিহূদী মা ও তার সাত ছেলে নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে শুকরের মাংস খেতে অস্বীকার করলে তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছিল। তখন মন্দির এলাকার মধ্যে সিরিয় দেবীর সাথে সম্পৃক্ত ধর্মীয় যৌনাচারের চর্চা করা হতো।

১৬৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, গ্রীক দেবতা জেউসের উদ্দেশ্যে নির্মিত বেদির উপর একটি শুকর উৎসর্গ করা হয়েছিল। এটিকে ভাববাদী দানিয়েলের করা "সর্বনাশা ঘৃর্ণার বস্তু" ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা হিসবে মনে করা হয়েছিল (দানিয়েল ১১:৩১)।

রোমীয় শাসনের অধীনে যিহূদীরা

মত্তথিয় নামের একজন পুরোহিত এবং তার ছেলেরা বিরোধী দল হিসেবে যিহূদীদের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মত্তথিয়ের ছেলেদের মধ্যে তার বড় ছেলের নাম ছিল যিহূদা, যাঁকে "হাতুরী" ম্যাক্কাবি বলে ডাকা হতো। ১৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ডিসেম্বরে মন্দির পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে ম্যাক্কাবীয় বিদ্রোহ সফল হয়েছিল। বর্তমানে যিহূদীরা ঐ ঘটনাকে মনে করে 'মন্দির প্রতিষ্ঠার পর্ব' বা 'আলোর উৎসব' পালন করে থাকে।

[প্রতি বছর প্রতিটি যিহূদী পরিবারে আজও আলোর উৎসব পালন করা হয়। আর এই সময় আটটি দাহমুখের প্রদীপ জ্বালানো হয়, কারণ প্রথা অনুসারে, ১৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যিরূশালেমের মন্দির পুনঃর্নির্মাণের পর সাত-শাখাবিশিষ্ট একটি বাতিদানের এক দিনের জন্য প্রয়োজনীয় তেল দিয়ে আট দিন পর্যন্ত তা জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল।]

১৬১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যিহূদাকে হত্যা করার পরে, তার ভাই যোনাথন নেতৃত্বের দায়িত্বভার তুলে নিয়েছিলেন। ১৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাকে মহাযাজকের পদও দেয়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন সুদীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতায় টিকে থাকা হাসমোনীয় বংশধরদের (যিহূদার সর্বশেষ জীবিত ভাই শিমনের নাম অনুসারে রাখা হয়েছিল) প্রথম ব্যক্তি, যাদেরকে ৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ঐ পদ ধরে রাখতে হয়েছিল। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা একটি পরিবারের হাতে থাকার বিষয়টি অনেক ধর্মপ্রাণ যিহূদীরা সাদরে গ্রহণ করে নি।

১২৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যিহূদা ও যোনাথনের ভাগ্নে যোহন হির্কানাস যিহূদীদের পক্ষে রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন, যা কেবল ৬৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল যখন রোমীয়রা যিহূদা, শমরীয়া ও পলেষ্টিয়দের দেশকে তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

রোমীয়দের বিজয়

[পম্পে ছিলেন সেই রোমীয় সামরিক কর্মকর্তা, যিনি যিহূদিয়া, শমরীয়া ও পলেষ্টিয়দের দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে পুরোপুরি শেষ করে দিয়েছিলেন।]

৬৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভূমধ্য-সাগরীয় জলদস্যুদেরকে উৎখাত করার জন্য রোমীয় নেতা পম্পেকে অপরিসীম ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। তিনি এই কাজটিকে খুবই দক্ষতার সাথে তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর এর পরবর্তী চিন্তাধারার প্রতিফলন হিসেবে তিনি তার সৈন্যবহর নিয়ে বর্তমান ইস্রায়েল দেশে প্রবেশ করেছিলেন– যেখানে দুই ভাই মহাযাজকের পদ নিয়ে বিবাদে মেতে ছিলেন। পম্পে তার উচ্চাকাঙ্খী ছোট ভাই এরিস্টো-বুলাসের বিরুদ্ধে বড় ভাই হির্কানাসের পক্ষ নিয়েছিলেন। ৬৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পম্পে যিরূশালেম দখল করেছিলেন এবং মন্দিরের মহাপবিত্র স্থানে বছরে এক বার যেখানে মহাযাজক প্রবেশ করতেন, সেখানে প্রবেশের ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিলেন। তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হলো এই যে, তিনি মন্দিরের কোন কিছুই স্পর্শ করেন নি। এর ফলে যিহূদীরা ব্যপকভাবে তার বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে নি।

পম্পে গ্রীকদের উপনিবেশ হিসেবে পরিচিত দিকাপলীর আওতাধীন দশটি সংঘবদ্ধ শহরকে সুসংগঠিত করেন। আর গালীল সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত সিথোপলিস শহর (বৈৎশিয়ান) সহ সিরিয়া ও জর্ডানে অবস্থিত আরও নয়টি শহরকে এর অন্তর্ভুক্ত করেন। এই নয়টি শহরের মধ্যে দামেস্ক, ফিলাদিল্‌ফিয়া (আম্মান), পেলা, গেরাসা ও গাদারা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল।

হেরোদ

ইদুমীয়রা ছিল একটি গোষ্ঠী, যাদেরকে নাবাতীয় আরবীয়রা দক্ষিণ যিহূদিয়ার পশ্চিম দিকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং সেখানে যিহূদিয়ার হাসমোনীয় শাসকরা তাদেরকে জোর করে যিহূদী ধর্মে দীক্ষিত করেছিল। এই কারণে ইদুমীয়রা সাম্প্রতিক কালের সন্দেহভাজন যিহূদী হিসেবে পরিচিত ছিল। যদিও তারা চতুর ছিল, তবে তাদের এমন কোন যোগ্যতা ছিল না যে নিজেদের স্বার্থের জন্য রোমীয়দের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে।

হেরোদ আন্তিপাতের

প্রায় ৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে হেরোদ আন্তিপাতের যিহূদীদের শাসন করতেন। তিনি হির্কানাসের উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করেছিলেন এবং পম্পের আস্থাভাজন হয়েছিলেন। যখন ৪৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট যুলিয় কৈসরকে (জুলিয়াস সিজার) অবরুদ্ধ করা হয়েছিল– এই আন্তিপাতের কৈসরকে সাহায্য করার জন্য যিহূদীদেরকে প্রণোদিত করেছিলেন। আর কৃতজ্ঞতার প্রতিদান হিসেবে, কৈসর যিহূদীদেরকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন।

আন্তিপাতের ছেলে মহান হেরোদ ছিলেন উচ্চপর্যায়ের একজন সুবিধাবাদী ব্যক্তি। রোমীয় গৃহযুদ্ধের অরাজকতার মধ্যে তিনি তার মিত্রতা পম্পে থেকে কৈসর, কৈসর থেকে অ্যান্তনি, অ্যান্তনি থেকে অক্টাভিয়ানে (আগস্ত) পরিবর্তন করেছিলেন। দক্ষিণে নাবাতীয় আরবীয়দের এবং পূর্বে পার্থীয়দের বিপক্ষে তিনি রোমের জন্য একটি শক্তিশালী নিরপেক্ষ রাষ্ট্র উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মহান হেরোদ

৩৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যিহূদিয়ার নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্য তিনি যে যুদ্ধ করেছিলেন, তাতে রোমীয় সৈন্যরা তার পক্ষ হয়ে লড়েছিলেন এবং ৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হেরোদকে যিহূদিয়ার রাজা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। আর ঐ সময় রাজা হেরোদ অযিহূদী

সৈন্যদের উপর নির্ভর করতেন। এছাড়াও অক্টাভিয়ান তাকে রাণী ক্লিওপেট্রার কেল্টটিক দেহরক্ষী ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। বিদেশী ভাড়াটে সৈন্যদের জন্য তিনি প্রাচীন শমরীয় শহরটিকে শেবাস্ততে পরিণত করেছিলেন। তিনি কৈসরিয়ায় শমরীয় অঞ্চলে প্রথম গভীর জলের সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করেছিলেন।

[হেরোদ কৈসরিয়াতে গভীর জলের সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করে শহরটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। আর এই লক্ষ্যে দুইটি বৃহত্তর সামুদ্রিক স্রোত প্রতিরোধক বাঁধ নির্মাণ করা হয়, যা একেক বারে ৩.৫ একর জায়গা রক্ষা করতে সক্ষম ছিল।]

রাজনীতিতে সফল হলেও, রাজা হেরোদ ব্যক্তিগত জীবনে তিক্ততা নিয়ে অসুখী ছিলেন। সুন্দরী হাসমোনীয় রাজকন্যা মরিয়মনে সহ তিনি মোট দশ জন স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছিলেন। যদিও তিনি তাকে প্রচন্ড ভালবাসতেন, তবে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সন্দেহ করতেন বলে তিনি তাকে মেরে ফেলেছিলেন। পরবর্তীতে ৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তার (মরিয়মনের গর্ভজাত) দুই ছেলেকে হত্যা করেছিলেন। আর যখন তিনি দেখতে পান যে, প্রিয় ছেলে আন্তিপাতের তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, তখন তিনি তাকেও (৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) তার নিজের মৃত্যুর আগে হত্যা করেছিলেন। ইনিই ছিলেন সেই কুখ্যাত রাজা, যিনি প্রভু যীশুর জন্মের পরে অসংখ্য শিশুকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন (মথি ২:১৩-১৮)।

রোমীয় শাসনের অধীনে যিহূদীরা

খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ও খ্রীষ্টাব্দ বিষয়ক সময় নির্ধারণের পদ্ধতিটি ষষ্ঠ শতাব্দীতে একজন সন্যাসীর দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছিল। যাহোক তিনি সম্রাট আগস্ত কৈসরের রাজত্বকালের সময় গণনায় চার বছর ভুল গণনা করেছিলেন। কারণ প্রভু যীশুর জন্ম অবশ্যই ৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হেরোদের মৃত্যুর পূর্বেই হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, সময়টি নির্ধারণ করা হয়েছিল জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গণনার উপর নির্ভর করে।

এরপর রাজা হেরোদের রাজ্য তার তিন ছেলের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়: আর্খিলয়কে যিহূদিয়া; অন্তিপাসকে গালীল ও পেরিয়া (ট্রান্সজর্ডান) এবং ফিলিপকে গালীল সাগরের দক্ষিণে অযিহূদীদের অধ্যুষিত সুবিশাল অঞ্চল দেয়া হয়েছিল।

রাজা ফিলিপের শাসনকাল (৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ – ৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) ছিল সুবিচারপূর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত ঘটনাবৈচিত্রহীন। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে হর্মোণ পাহাড়ের ঢালে রূপান্তরিত হয়েছিলেন (মার্ক ৯:২-৮), সেটি রাজা ফিলিপেরই শাসনাধীন অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। কৈসরিয়া-ফিলিপীতে হর্মোণ পাহাড়ের পাদদেশেই পিতর ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রভু যীশুই হলেন সেই প্রতীক্ষিত খ্রীষ্ট (মশীহ) (মার্ক ৮:২৯)।

গালীল ও পেরিয়ার প্রাদেশিক শাসনকর্তা অন্তিপাসকে তার ধূর্ততার জন্য প্রভু যীশু তাকে 'শিয়াল' বলে ডাকতেন। প্রাক্তন সৎ ভাইয়ের স্ত্রী হেরোদিয়ার সাথে ব্যভিচারী

[আকাশ থেকে তোলা 'হেরোদিয়াম' নামের দুর্গ, যা হেরোদ যিরূশালেমের ৭ মাইল দক্ষিণে একটি পাহাড়ের চূড়ায় তৈরি করেছিলেন।]

সম্পর্ক থাকার কারণে বাপ্তিস্মদাতা যোহন তাঁর নিন্দা করেছিলেন। হেরোদিয়ার মেয়ের (সম্ভবত শালোমী) খুবই সংবেদশীল নাচে আবেগপ্রবণ হয়ে তিনি তাকে অঙ্গীকার করেছিলেন, সে যা চাইবে, তা তাকে দেয়া হবে। আর তিনি উদ্দেশ্যবিহীনভাবে তার ইচ্ছা পূরণ করতে যোহনের কাটা মাথাকে থালাতে করে হেরোদিয়ার কাছে পাঠিয়েছিলেন। নাছোড়বান্দার মত তার এই বিরক্তিকর অনুরোধকে রক্ষা করতে গিয়ে হেরোদ নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। কারণ ৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ থেকে রাজার পদে উন্নীত হওয়ার জন্য রোমীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তখন তার স্ত্রী সহ তাকে ফ্রান্সে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল।

আর্খিলয় ছিলেন 'তার বাবার চরিত্রের প্রতিমূর্তি'। কারণ ক্ষমতাসীন অবস্থায় তিনি তার শত্রুদের ৩ লোককে হত্যা করেছিলেন। যোষেফ ও মরিয়ম মিশর থেকে ফিরে এসে, খুবই বুদ্ধিমত্তার সাথে আর্খিলয়ের অঞ্চল এড়িয়ে গালীলে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। তার শাসন এতো নৃশংস ছিল যে যিহূদী ও শমরীয়রা ঐক্যবদ্ধভাবে সফলতার সাথে ৬ খ্রীষ্টাব্দে তাকে তার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য করেছিল। এর ফলে আর্খিলয়ের অধিকৃত অঞ্চলে সরাসরি রোমীয় শাসন-কর্তাদের দ্বারা শাসিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়েছিল।

আরও একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন রাজা ১ম আগ্রিপ্প– ইনি ছিলেন মহান হেরোদের নাতি। তাকে রোমে রাজকীয় পরিবারের সান্নিধ্যে লালন-পালন করা হয়েছিল। সম্রাট ক্যালিগুলার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে তাকে প্রথমে রাজা ফিলিপের অঞ্চল এবং পরবর্তীতে ৩৯ খ্রীষ্টাব্দে গালীল প্রদেশ ও পেরিয়া প্রদেশ দেয়া হয়। যখন ৪১ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালিগুলাকে গুপ্তভাবে হত্যা করা হয়েছিল তখন আগ্রিপ্প ক্লৌদিয়কে সম্রাট হিসেবে নির্বাচন করতে

সাহায্য করেন। আর উপহার হিসেবে তাকে যিহূদিয়া ও শমরীয়ার রাজা করা হয়েছিল– তিনিই ছিলেন প্রথম রাজা যিনি যিহূদীদেরকে একটি প্রজন্ম হিসেবে শাসন করেছিলেন। প্রজাদের কাছে তার জনপ্রিয়তা রক্ষায় তিনি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিলেন এবং সিবদিয়ের ছেলে প্রেরিত যাকোবকে হত্যা করেন, যিনি ছিলেন প্রভু যীশুর বারো জন শিষ্যের একজন (প্রেরিত ১২:১)। আগ্রিপ্প কৈসরিয়াতে জনসভায় বক্তৃতা দেয়ার সময় মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে মারা যান (প্রেরিত ১২:২১-২৩)।

[হেরোদ নির্মিত জলের কৃত্রিম প্রণালী, যা দিয়ে কর্মিল পাহাড়ের উপরস্থ নদী থেকে কৈসরিয়াতে জল সরবরাহ করা হতো।]

এরপর রাজা ১ম আগ্রিপ্পর ছেলে ২য় আগ্রিপ্প রাজা হিসেবে শাসন করতে শুরু করলেও প্রকৃত ক্ষমতা রোমীয় শাসনকর্তাদের হাতে ছিল। তিনি দ্রুষিল্লার (তার এক বোন যিনি রোমীয় শাসনকর্তা ফীলিক্সকে বিয়ে করেছিলেন) সাথে একত্রে প্রেরিত পৌলের কথা শুনেছিলেন। প্রেরিত পৌল তখন নিজের পক্ষে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সেটি প্রেরিতদের কাজের বিবরণীতে উল্লেখ রয়েছে (প্রেরিত ২৪:১-২৭)। রোম থেকে তিনি তাঁর সিংহাসন পেয়েছিলেন বলে ৬৬ খ্রীষ্টাব্দে যে যিহূদী বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তিনি তার বিরোধিতা করেছিলেন। রাজা ২য় আগ্রিপ্পর বেরেনিস নামের অন্য এক বোন তীত নামের একজন রোমীয় সেনাধ্যক্ষের গৃহকর্ত্রী

হয়েছিলেন এবং এই তীতই ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যিরূশালেম দখল করেছিলেন।

[কৈসরিয়াতে পাওয়া প্রস্তর অনুলিপি, যাতে পন্তীয় পীলাতের কথা উল্লেখ রয়েছে।]

হেরোদীয় স্থাপত্য

হেরোদ যে একজন বিস্ময়কর স্থপতি ছিলেন, তা সাম্প্রতিক কালের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মার্কের লেখা সুখবরের ১৩ অধ্যায় অনুসারে,

[‘মন্দিরের পশ্চিম দেয়াল সংলগ্ন বিলাপ করার স্থান’, সুবিস্তৃত উচুঁ জায়গা– যার উপর রাজা হেরোদ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।]

যিরূশালেমে তাঁর মন্দির পুনঃনির্মাণের বিষয়ে (১৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যা শুরু হয়েছিল) প্রভু যীশুর শিষ্যেরা খুবই প্রশংসা করেছিলেন। মন্দির পুনঃনির্মাণের সর্বশেষ কাজটি ৭০ খ্রীষ্টাব্দে এটি রোমীয়দের দ্বারা ধ্বংস হওয়ার ৬ বছর আগে সম্পন্ন হয়েছিলে। এখন যা কিছু বাকী রয়েছে, তা হলো এর বিস্তৃত উচুঁ জায়গা এবং এর পশ্চিমে রয়েছে মন্দিরের দেয়াল সংলগ্ন বিলাপের জন্য নির্ধারিত স্থান– যেখানে আজও যিহূদীরা

মন্দিরের ধ্বংস নিয়ে বিলাপ করে থাকে। আরও দর্শনীয় জায়গা হিসেবে উন্মুক্ত রয়েছে মরুসাগরের পশ্চিম তীরের মাসাদা দুর্গ ও পূর্ব তীরের ম্যাকেরাস দুর্গ। আর এই ম্যাকেরাস দুর্গে বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। রাজা হেরোদের সময়কার আরও চমৎকার নির্মাণশৈলীর নমুনাগুলো পাওয়া যায় যিরীহোতে। আর যিরীহোতেই রাজা হেরোদ মারা গিয়েছিলেন এবং এখানকার হেরোদিয়াম দুর্গে তাকে সমাহিত করা হয়েছিল।

রোমীয়দের পেশা

রাজা ১ম আগ্রিপ্পের সংক্ষিপ্ত শাসনকাল (৪১-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) ছাড়া ৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৬ খ্রীষ্টাব্দে যিহূদীদের প্রথম যুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত, ধারাবাহিকভাবে চৌদ্দজন রোমীয় শাসনকর্তা যিহূদিয়াকে শাসন করেছিলেন। যিহূদিয়ার শাসনকর্তারা ‘প্রাদেশিক প্রশাসনিক নেতা’ অথবা ‘রোমান সাম্রাজ্যের অধীন প্রাদেশিক দেওয়ান’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। রোমীয়দের অশ্বারোহণের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট থাকতেন এমন শ্রেণী থেকে তারা আসতেন এবং দামেস্কে সিরিয়ার কূটনৈতিক প্রতিনিধির অধীনে থাকতেন। যিহূদিয়াকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ হিসেবে মনে করা হতো। আর এর শাসনকর্তাদের অধীনে সাহায্যকারী হিসেবে ৩,০০০ সৈন্যের একটি দল থাকতো, যারা কৈসরিয়াতে অবস্থান করতো। তবে উৎসবের সময়ে, বিশেষত যিহূদীদের নিস্তারপর্বের সময়, মন্দির এলাকার উপর নজরদারি করার জন্য ৫০০ সৈন্যের একটি দলকে যিরূশালেমের আন্তনিয়া দুর্গে পাঠিয়ে দেয়া হতো।

পন্তীয় পীলাত ২৬-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট তিবিরিয়ের অধীনে যিহূদিয়ার শাসনকর্তা

[রোমীয়রা যিহূদীদের কাছ থেকে খুব বেশি কর আদায় করতেন। চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের এই চিত্রটি প্রজাদের কর দেয়ার বিষয়টিকে তুলে ধরছে।]

হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ছিলেন রোমের নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশাসনিক নেতা, সেজানুসের আশ্রিত। পীলাত তার কৌশলবর্জিত কর্মকান্ডের দ্বারা যিহূদীদেরকে খেপিয়ে তুলেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, তিনি মন্দিরের তহবিল থেকে অর্থ নিয়ে কৃত্রিম জল সরবরাহের প্রণালী তৈরির কাজে ব্যবহার করেছিলেন এবং যিরূশালেমে অবস্থানরত লোকদের সম্রাটের প্রতিমূর্তি ব্যবহারের এক সামরিক নিয়মের প্রচলন করেছিলেন– যা যিহূদী ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি আঘাত হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছিল। নির্মম শক্তি নিয়ে তিনি বিরোধিতাকে প্রতিহত করতেন। একজন রাজকীয় ভন্ড হিসেবে তিনি যিহূদীদের চাপের কাছে মাথা নত করে প্রভু যীশুকে ক্রুশে দেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন (মথি ২৭:১৫-২৬)। এই ঘটনাটি ঘটেছিল ৩০ খ্রীষ্টাব্দে অথবা কোন কোন লেখকের যুক্তি অনুসারে ৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সেজানুসের পতনের পরে, যখন পীলাতের নিজের অবস্থানও যখন অনিরাপদ হয়ে পড়ে।

[৫-৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বৈৎলেহমে লোকগণনার রেজিষ্ট্রেশনের দৃশ্য সম্বলিত ছবি]

[সম্রাট তীতের সৈন্যদের যিরূশালেমের মন্দির থেকে সাত শাখাবিশিষ্ট বাতিদানটি নিয়ে কুচকাওয়াজ করার ছবি]

রোমীয় শাসনের অধীনে যিহূদীরা

যেমন ফীলিক্স নামের ল্যাটিন অর্থ 'ভাগ্যবান', তেমনি তিনি ছিলেন একজন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস, অথবা প্রাক্তন ক্রীতদাস, যিনি ৫২-৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যিহূদিয়ার শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আর তার ভাই প্যালাস ছিলেন সম্রাট ক্লৌদিয়ের (৪১-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) অধীনস্থ রোমীয় কোষাগার বিষয়ক সচিব। ইতিহাসবিদ ট্যাসিটাস তার বিষয়ে বলেন: "এক দাসের তেজস্বিতায় সব ধরণের নিষ্ঠুরতা ও কামনা নিয়ে তিনি রাজকীয় কার্যক্রম চালাতেন।" কৈসরিয়াতে প্রেরিত পৌলকে বন্দী করে তিনি তাঁর কাছ থেকে ঘুষের আশা করেছিলেন (প্রেরিত ২৪:২৬)।

যখন ফীষ্ট (৬০-৬২ খ্রীষ্টাব্দ) ফীলিক্সের পরে শাসনকর্তা হিসেবে আসেন, তখন প্রেরিত পৌল একজন রোমীয় নাগরিক হিসেবে তাঁর অধিকারকে ব্যবহারের সুযোগটি কাজে লাগিয়ে সরাসরি সম্রাট কৈসরের কাছে আবেদন করেছিলেন এবং ঐ সময় কৈসর হিসেবে ক্ষমতাসীন ছিলেন নিরো।

যিহূদীদের চোখে রোমীয়দের পেশা

সবচেয়ে বড় যে আঘাতটি যিহূদীরা অনুভব করেছিল, সেটি ছিল তাদের জাতীয় গর্বের প্রতি আঘাত। কারণ তারা বিশ্বাস করতো যে, ঈশ্বর তাদেরকে তাঁর বিশেষ লোক হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাই তারা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকত কখন পুরো পৃথিবীর লোকেরা ঈশ্বরের উপাসনা করতে যিরূশালেমে আসবে। কিন্তু এর পরিবর্তে সেখানে এসে হাজির হয়েছিল রোমীয়রা এবং তাদের পুতুলস্বরূপ শাসকরা। যারা তাদের পবিত্র স্থানকে অপবিত্র করেছিল এবং তাদের আইন-কানুন ও রীতিনীতিকে অবজ্ঞা করেছিল।

মহান রাজা হেরোদ কৈসরিয়াতে সম্রাট আগস্তের জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি সেখানে সম্রাটের মূর্তি স্থাপন করে, সেটিকে গ্রীক দেবতা জেউস হিসেবে চিত্রিত করেন ও গ্রীক দেবী হেরার মূর্তি স্থাপন করে, সেটিকে রোম হিসেবে চিত্রিত করেন– আর এগুলোকে যিহূদীরা প্রতিমাপূজা বলে মনে করতো। কৈসরিয়া ও যিরূশালেমে তিনি রঙ্গমঞ্চ এবং বৃত্তাকার ক্রমউচ্চ আসনশ্রেণী সন্নিবেশিত রঙ্গমঞ্চ তৈরি করেছিলেন– যেখানে প্রতি চার বছর অন্তর সম্রাট আগস্ত কৈসরের সম্মানে বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলার আয়োজন করা হতো। আর ধর্মীয় রীতিনীতির সাথে এর সম্পৃক্ততার বিষয়টি এবং সেখানে প্রতিযোগীদের নগ্ন উপস্থিতি যিহূদীদের খুবই অসন্তুষ্ট করতো। সবচেয়ে জঘণ্য দিক হিসেবে, রোমীয় রাজত্বকে চিহ্নিত করতে রাজা হেরোদ যিরূশালেমের মন্দিরের প্রধান ফটকে স্বর্ণ নির্মিত বিশালাকৃর্তির একটি ঈগল পাখি রেখেছিলেন।

রোমীয় শাসনের অধীনে যিহূদীরা

উত্তর-পশ্চিম সিরিয়া থেকে আসা পার্থীয়দেরকে তল্লাশী করার জন্য যিহূদিয়াতে রোমীয় সৈন্যদেরকে বসানো হতো। তাদেরকে কখনো পুরোপুরিভাবে রোমীয়রা জয় করতে পারেনি। সৈন্যরা যিহূদিয়ার শান্তি রক্ষা, দাঙ্গা প্রতিরোধ এবং বাণিজ্যিক যাত্রা পথগুলোকে নিরাপত্তা প্রদানে সক্ষম হয়েছিল।

সামরিক সদর-দপ্তর কৈসরিয়াতে থাকলেও, যিরূশালেমে অবস্থিত সেনানিবাস থেকে এটিকে বিচ্ছন্ন রাখা হতো। সৈন্যরা মন্দিরের বাইরের অংশে সব সময় দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতো। তবে নিস্তারপর্বের সময় যখন সেখানে তীর্থযাত্রীরা আসত, তখন আরও সৈন্যদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হতো।

কে দেশকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সেই বিষয়ে যিহূদীদের কোন বিভ্রান্তির মধ্যে রাখা হয়নি। সাজ-সজ্জা পরিহিত সৈন্যদেরকে রাস্তায় দেখতে পাওয়ার বিষয়টি যেন তাদের কাছে প্রাত্যহিক জীবনের একটি বিষয় হয়ে উঠেছিল। সামরিক কাজকর্ম থেকে তাদেরকে দায়মুক্ত রাখা হতো কারণ মোশির আইন-কানুনে বিশ্রামবারে অস্ত্রশস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ এবং সৈন্যরা অযিহূদীদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে বলে আশা করা হতো।

রোমীয় রাজত্বের সবচেয়ে ঘৃণিত দিকটি ছিল তাদের চাপানো মাত্রাতিরিক্ত করের বোঝা। প্রদেশগুলোর কাছ থেকে আশা করা হতো যেন তারা সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক বিষয়গুলোর অধিকাংশ খরচের ভার বহন করে। সিরিয়া প্রদেশে, লোকদের মাথাপিছু আয়কর ছিল একজন লোকের এক বছরের পুরো আয়ের শতকরা এক ভাগ। এছাড়াও রয়েছে রপ্তানী ও আমদানী শুল্ক এবং ফসলের উপর আরোপিত কর: বীজ জাতীয় শস্যের উৎপাদনের দশ ভাগের এক ভাগ; আংগুর-রস জাতীয় পানীয়, মদ, ফলমূল ও তেলের উৎপাদনের পাঁচ ভাগের এক ভাগ– এছাড়াও ক্রয় বাবদ কর, জমি হস্তান্তরের মাধ্যমে কর প্রদান, জরুরী বিষয়ভিত্তিক কর এবং রোমীয়দের এমন আরও অনেক কর/শুল্ক আরোপ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নৈতিকতার তত্ত্বাবধানকারী বলে ডাকা হতো এমন একজন রোমীয় কর্মকর্তাকে যিনি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন বটে, কিন্তু তিনি তার এই অধিকারকে যারা জোর করে আরও বেশি রাজস্ব আদায়ে সক্ষম হবে এমন কারো কাছে বিক্রি করে দিতেন। আর এরা নির্ধারিত করের চেয়ে আরও বেশি আদায় করতো এবং বাড়তি অংশ নিজেদের কাছে রেখে দিত। বিষয়টি এমন যেন তারা ধনীদের কাছ থেকে ঘুষ আদায় করছিল এবং গরিব লোকেরা সত্যিকার অর্থে রোমীয় সরকারকে

কর দিচ্ছিল।

রোমীয়দের বিরুদ্ধে প্রায়ই যিহূদীরা বিদ্রোহ করতো এবং তাদের মন্দ আচরণের মধ্য দিয়ে এর সূত্রপাত ঘটতো। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ভেন্টিডিয়াস কুমানাসের (৪৮-৫২ খ্রীষ্টাব্দ) শাসনকালে একজন রোমীয় সৈন্য চামড়ায় গুটানো যিহূদী ধর্মীয় পুস্তককে আগুনের মধ্যে ছুড়ে মেরেছিল। এতে যিহূদীরা এতোটা বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠেছিল যে কুমানাস ঐ সৈনিককে মৃত্যুদন্ড দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। গালীলীয় যিহূদার অধীনে যিহূদীরা অতিরিক্ত কর আদায় নিয়ে খুবই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু খুব নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রোহীদেরকে হত্যার মধ্য দিয়ে এই বিদ্রোহ থেমে গিয়েছিল (প্রেরিত ৫:৩৭)। তারা বিদ্রোহ করেছিল কারণ তারা বিরোধী রোমীয়দের কাছে থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল। যিহূদী রাজনৈতিক দল ‘উদ্‌যোগী’ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছিল এবং ‘এসেনিস’ নিজেদের সম্প্রদায় সমর্থিত সাধারণ নাগরিকত্ব বেছে নিয়েছিল।

এই পেশার কিছু লাভজনক দিকও ছিল। রোমীয়রা শান্তিকে সুনিশ্চিত করেছিল এবং যোগাযোগের জন্য ভাল রাস্তাঘাট তৈরি করেছিল– ফলে যিহূদীরা ব্যবসা করতে উৎসাহিত হয়েছিল। রোমীয়রা সব সময় স্থানীয় রীতিনীতিকে সম্মান করতো, ধর্মীয় স্বাধীনতার অনুমোদন ও স্বায়ত্তশাসনের অনেক সুবিধা দিত। তারা অনেক স্নানাগার ও সরকারী দপ্তর নির্মাণ করেছিল। যিহূদী প্রাচীনবর্গের সমাজ (যিরূশালেমে মিলিত হতেন এমন সত্তর জন যিহূদী ধর্মীয় নেতা ও মহাযাজকের সমন্বয়ে গঠিত মহাসভা) ধর্মীয় বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং রোমীয় প্রাদেশিক শাসনকর্তার অধীনস্থ হয়ে তারা সরকার ও বিচার প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করতে পারতেন। যদিও তারা কিছু ফৌজদারী মামলা নিয়ে চেষ্টা চালিয়েছিলেন, তবে যা মনে হয় এটি চূড়ান্ত শাস্তি দানে বাধ্য করতে সক্ষম ছিল না এবং এই কারণে প্রভু যীশুকে রোমীয় শাসনকর্তা পীলাত মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন।

উদ্‌যোগীগণ

সম্রাট আগস্ত কৈসর তার কূটনৈতিক প্রতিনিধি কুরীণিয়ের মধ্য দিয়ে লোকগণনার আদেশ দিয়েছিলেন, যার কথা প্রভু যীশুর জন্ম বিবরণীতে উল্লেখ রয়েছে এবং এটিই ছিল কর পরিমাপের প্রথম পদক্ষেপ। এটি জানতে পারা যায় যে, লোকগণনার এই আদেশ তিনি পর্যায়ক্রমিক ভাবে মিশরেও দিয়েছিলেন।

৬ খ্রীষ্টাব্দে কুরীণিয়ের দ্বিতীয় বার যিহূদিয়াতে লোকগণনার আদেশ জারী করেছিলেন। এই আদেশ যিহূদীদের গালীলীয় যিহূদার নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে

রোমীয় শাসনের অধীনে যিহূদীরা

[ক্ষমতাসীন শক্তিকে বাধা দান প্রায়ই গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহের আকার ধারণ করে। যিহূদীদের জাতীয় স্বাধীনতাকে ফিরে পেতে উদ্‌যোগী রাজনৈতিক দলের সদস্যরা একই কৌশল ব্যবহার করেছিলেন।]

উদ্বুদ্ধ করলেও তা ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়েছিল। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এর মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একটি প্রতিরোধী ভাবধারা সৃষ্টি হয়। আর এই প্রতিবাদীরাই পরবর্তীতে উদ্‌যোগী রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দলের সদস্যরা রোমীয়দেরকে কর দিতে অস্বীকার করতো এবং এই বিষয়ে রোমীয় ও যিহূদী– উভয় পক্ষের সহযোগীদেরকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত থাকত।

প্রভু যীশুর শিষ্যদের মধ্যে শিমোন উদ্‌যোগী দলের একজন প্রাক্তন সদস্য ছিলেন। আর তিনি একজন রাজনৈতিক আন্দোলনকারী হিসেবে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। আর এই কারণে কিছু পণ্ডিতগণ প্রস্তাব করেছিলেন যে, প্রভু যীশু উদ্‌যোগী আন্দোলনের সাথে সহমর্মী হয়েছিলেন। এখানে যে বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া হয় তা এই যে, প্রভু যীশুর আরেক জন শিষ্য মথি একজন কর আদায়কারী ছিলেন। উদ্‌যোগী নীতি থেকে দূরে সরে এসে প্রভু যীশু একটি মুদ্রায় সম্রাট কৈসরের প্রতিমূর্তি দেখিয়ে বলেছিলেন: “সম্রাটকে যা দেয়া উচিৎ, তা তাঁকে দাও” (মথি ২২:১৫-২২)।

যখন গালীলীয় যিহূদার ছেলেরা একটি বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন– তাদেরকে যিহূদার শাসনকর্তা তিবিরিয় আলেকজান্ডার (৪৬-৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলেছিলেন। ফ্যাদাস যখন শাসনকর্তা ছিলেন (৪৪-৪৬ খ্রীষ্টাব্দ), তখন থুদা নামের

একজন দাবী করেছিলেন যে, তিনি যর্দন নদীকে দুই ভাগ করতে পারেন। আর যখন ফীলিক্স শাসনকর্তা ছিলেন, তখন মিশর থেকে একজন ভন্ড ভাববাদী এসে জৈতুন পাহাড়ের উপর কয়েক হাজার লোককে সমবেত করেছিলেন। প্রেরিত পৌল এই ভন্ড ভাববাদীকে ভুল করে সেই রোমীয় কর্মকর্তা ভেবেছিলেন, যিনি তাকে মন্দির এলাকায় দাঙ্গার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন (প্রেরিত ২১:৩৮)।

ফীলিক্সের অধীনেই আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী যিহূদী উদ্‌যোগীদের একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী দল (যাদেরকে 'সিকারি' বলা হত– এর সদস্যরা তাদের পোশাকের নীচে লুকিয়ে রাখা ছোরা দিয়ে প্রতিপক্ষ রোমীয়দের ও তাদের সহযোগীদেরকে গোপনে হত্যা করতো) প্রথমবারের মত সম্মুখে এসে মহাযাজককে হত্যা করেছিল। উদ্‌যোগী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বেড়ে ওঠার সাথে সাথে রোমীয় শাসনকর্তা আলবিনাস (৬২-৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) ও ফ্লোরাসের (৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) ক্রমবর্ধমানভাবে কঠিনতর হয়ে ওঠা নীতিমালা একত্রিতভাবে ৬৬ খ্রীষ্টাব্দে যিহূদী বিপ্লবের সূচনা করেছিল।

যিহূদীদের বিদ্রোহ

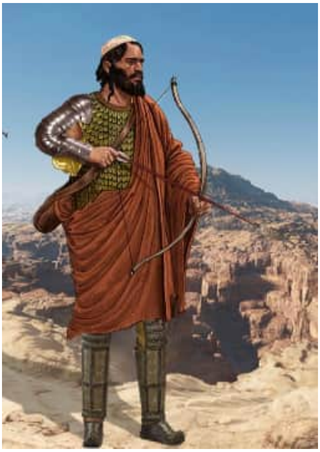

যোসিফাস: (৩৭-১০০ খ্রীষ্টাব্দ) যোসিফাস ছিলেন এক পুরোহিত এবং হাসমোনীয়দের বংশধর। তিনিই হলেন প্রধান ইতিহাসবিদ যার উপর যিহূদীদের প্রথম শতাব্দীর ঘটনাবলীর জন্য আমাদেরকে নির্ভর করতে হয়। তার লেখা বিস্ময়কর বইটি হলো *The Jewish Antiquities*, যা ৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, যা পুরাতন নিয়মে উল্লেখিত ঘটনাবলী থেকে শুরু করে তার সময়কার সামগ্রিক ঘটনাবলীকে আমাদের কাছে তুলে ধরে। তার *Contra Apion* বইটি আলেক্‌জান্দ্রিয়া থেকে আসা একজন যিহূদী-বিরোধী পণ্ডিতের আক্রমণ থেকে যিহূদী ধর্মমতকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিল। তার বই *Autobiography* এবং প্রাণবন্ত ও অমূল্য *Jewish War* কে তার নিজের আচার -আচরণের বিরুদ্ধে আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য লেখা হয়েছিল– আর এগুলো সন্দেহাতীতভাবে তার নিজস্ব প্রবনতায় রঙিন। প্রকৃতপক্ষে যোসিফাস গালীল প্রদেশে যিহূদী সেনাপতি হিসেবে কাজ করতেন। কিন্তু ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে যোটাপাটাতে সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে তিনি রোমীয়দের কাছে আত্মসমর্পন করেন।

রোমীয় শাসনের অধীনে যিহূদীরা

যিহূদী বিদ্রোহ কেবল রোমীয় সৈন্য বাহিনীর ভারে চাপা পড়েনি, বরং উদ্‌যোগীদের যাদেরকে সেই সময়ে ‘জেলট’ বলা হত তাদের মধ্যকার তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক দলাদলির কারণে এটি ব্যর্থ হয়েছিল– যা রোমীয়দের চেয়ে একে অপরের উপর অপেক্ষাকৃত বেশি আঘাত হেনেছিল। ইতিহাসবিদ ইউসেবিয়াসের মতে, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল যেন তারা যিরূশালেম ছেড়ে পেল্লায় চলে যায়– যা গালীল সাগরের দক্ষিণে ট্রান্সজর্ডান এলাকায় অবস্থিত। আর যখনই বিদ্রোহের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল তখনই সিরিয়া ও মিশরে যিহূদী ও অযিহূদীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায় এবং হাজার হাজার যিহূদী প্রাণ হারায়।

যিহূদিয়া ও শমরীয়া সহ আশেপাশের অঞ্চলের যিহূদীরা প্রথমে খুবই বিস্ময়করভাবে সফল হয়েছিল। তারা যিরূশালেমের পশ্চিমের বৈৎহোরোণের গিরিপথে সিরিয়া থেকে রোমীয় ১২তম সৈন্যবহরকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল। আর এই সংবাদ শুনে সম্রাট নিরো তার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সামরিক কর্মকর্তা, ভ্যাসপাসিয়ানকে ব্রিটেন থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ভ্যাসপাসিয়ানের ৫ম ও ১০ম সৈন্যবহরের সাথে তার ছেলে তীত মিশরের ১৫তম সৈন্যবহরে গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। আর তাদের যৌথ সৈন্যবাহিনীর সমন্বয়ে গালীলীয়দেরকে দমন করা হয়েছিল।

৬৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সম্রাট নিরো এক গুপ্ত হত্যায় প্রাণ হারিয়েছিলেন। পরবর্তী ঘটনার জের হিসেবে একই বছরে ধারাবাহিকভাবে তিন জন সম্রাটের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া নিয়ে অরাজকতা দেখা দেয়। আর ৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভেসপাসিয়ানকে তার সৈন্যবাহিনী সম্রাট হিসেবে অভিবাদন জানায়। ঐ সময় ছেলে তীতকে যুদ্ধের দায়িত্বে রেখে তিনি যিহূদিয়া ছেড়ে রোমে চলে গিয়েছিলেন। পাঁচ মাস অবরোধের পর যিরূশালেমের দেয়াল ভাঙ্গা হলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, যা আর কখনো পুনঃনির্মাণ করা হয়নি। ১৯৬৮ ও ১৯৭৬ সালের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া খনন কাজ থেকে স্থাপত্যের চমৎকার খণ্ডাংশ আবিস্কার করা হয়, যেগুলো রোমীয় আক্রমণের সময় আত্মরক্ষামূলক প্রাচীর থেকে মন্দিরের উপর নিক্ষেপ করা হয়েছিল। যোসিফাসের বিবৃতি অনুযায়ী দশ লাখেরও বেশি যিহূদী ঐ সময় মারা যায় এবং প্রায় ১০০,০০০ যিহূদীকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়। আর রোমীয়রা

[রোমীয় স্বর্ণমুদ্রা]

তাদের এই বিজয়কে উদ্‌যাপন করে ধারাবাহিকভাবে অসংখ্য মুদ্রা চালু করার মাধ্যমে– যাতে প্রদর্শিত খেজুর গাছের নীচে কান্না বিজড়িত স্ত্রীলোকটির চিত্র যিহূদিয়ার অবস্থাকে চিহ্নিত করেছিল। ৬৯ ও ৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে এই মুদ্রাগুলো চালু করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ৭৭ ও ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে স্মারক হিসেবে আবারও চালু করা হয়েছিল। দশম সৈন্যবহর স্থায়ীভাবে যিরূশালেমে অবস্থান করেছিল; অসংখ্য ছাদের টালির পদদলিত টুক্‌রা সেখান থেকে উদ্বার করা হয়েছে।

পুরো রোমীয় সাম্রাজ্যের সব জায়গাতে, যিহূদীদেরকে জোর করা হতো যেন তারা মন্দিরের সংরক্ষিত দান/ উপহারকে ‘যিহূদী কর’ হিসেবে রোমের জুপিটার মন্দিরে পাঠিয়ে দেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সম্রাট ডোমিশিয়ান একজন নব্বই বছরের বৃদ্ধ লোককে খোলামেলাভাবে এটি পরীক্ষা করতে আদেশ দিয়েছিলেন সে ত্বক্‌চ্ছেদ করানো যিহূদী কি না, এরকম যদি পাওয়া যায় তবে সে ঐ কর দিতে বাধ্য থাকতো।

মাসাদা দুর্গ

মাসাদা দুর্গটি একটি পাথুরে মালভূমির উপর অবস্থিত। মরুসাগরের উত্তর উপকূল থেকে ১৪০০ ফুট (৪৩৪ মিটার) উপরে অবস্থিত। ঐতিহ্য অনুসারে জানা যায় যে, এই খাড়া পাহাড়ের চূড়াটি ম্যাক্কাবীয় যিহূদার ভাই যোনাথন সেলুসিডসদের বিপক্ষে সুরক্ষিত করে রেখেছিলেন। মহান হেরোদ এটিকে তার নিজের আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এই মালভূমিটি চারদিক থেকে চারটি দরজা সহ ত্রিশটি সুউচ্চ স্তম্ভ সহকারে দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল।

জল সরবরাহের দুইটি কৃত্রিম প্রণালী এবং অসংখ্য জলাধার নির্মাণ করা হয়েছিল, যেগুলো জলের প্রতিদিনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য পর্যাপ্ত ছিল। এই জল কৃত্রিম ঝর্ণা, বিভিন্ন ধরণের স্নানাগার এবং বাগানের কাজেও ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হতো।

রোমীয় শাসনের অধীনে যিহূদীরা

[এখানে মাসাদাতে অবস্থিত রাজা হেরোদের গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদের তিনটি সারির যে চিত্র দেখা যাচ্ছে, তা আকাশ থেকে তোলা।]

আবিস্কৃত খনন কাজ থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে, রাজকীয় প্রাসাদের ভবনগুলো চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল। সম্ভবত এগুলোর কিছু ভবনকে উচুঁ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বাসভবন, প্রশাসনিক কেন্দ্র, স্নানাগার, গুদাম, কর্মশালা ও সেনানিবাস হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সবচেয়ে দর্শনীয় দিক ছিল তিনটি সুউচ্চ খাড়া পাহাড় সারির উপর প্রাসাদটির অবস্থান। এটি মনোরঞ্জন ও বিশ্রামের জন্য ব্যবহার করা হতো। একটি ঝুলন্ত সিড়ির মাধ্যমে তিনটি পাহাড়ের সারিকে সংযুক্ত করা হয়েছিল। স্তম্ভের সারিগুলো ভবনগুলোর ছাদকে ধরে রেখেছিল। প্রাসাদের দেয়ালগুলো বিভিন্ন ধরণের চিত্র, জ্যামিতিক চিত্র ও ফুলের কারুকাজ শোভিত নকশা দিয়ে সাজানো হয়েছিল এবং এর অনেক মেঝেই ছিল রঙিন কারুকাজ বিশিষ্ট পাথরে তৈরি।

মহান রাজা হেরোদের মৃত্যুর পরে মাসাদা প্রাসাদে রক্ষীসেনাদল স্থায়ীভাবে অবস্থান করতো। আর ৬৬ খ্রীষ্টাব্দে যিহূদী বিদ্রোহের সময়, এটিকে উদ্‌যোগীরা দখল করে নেয়। তারা রাজা হেরোদের প্রাসাদকে তাদের বসবাসের এলাকা ও নিয়ন্ত্রণকারী অবস্থান হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

ব্যবহারিকের চেয়ে অলঙ্কারিক হিসেবে স্থাপত্য শিল্পের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সাজসজ্জাকে সরিয়ে নিয়ে ভবনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। বৃহৎ কক্ষগুলোর মধ্যে বিভাজনের ব্যবস্থা করে সেগুলোকে কিছু সংখ্যক পরিবারের বসবাসের উপযোগী জায়গা হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। অবশিষ্ট হিসেবে

প্রতিটি কক্ষে রান্নার চুলা ছিল।

কিছু উদ্‌যোগী সদস্য সমাজের ধনী শ্রেণী থেকে এসেছিল। ভবনগুলোর একটিতে তৈলস্ফটিক ও সোনা দিয়ে তৈরি বিভিন্ন পাত্র এবং মজুতকৃত মুদ্রার স্তুপ আবিস্কৃত হয়েছিল। এই উদ্‌যোগীরা শুচিকরণ স্নানাগার ও স্নানের জলাশয় এবং যিরূশালেম অভিমুখী সমাজ-ঘর তৈরি করেছিল। এটি ছিল উপাসকমণ্ডলীর জন্য নির্ধারিত দেয়াল বরাবর চারটি সারির আসনবিশিষ্ট একটি আয়তাক্ষেত্রাকার ভবন।

বিপ্লবের শেষের দিকে অনেক পরিবার নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় মাসাদা প্রাসাদে গিয়েছিলেন। কাদামাটি ও ছোট পাথর দিয়ে তাদের জন্য কুঁড়েঘর তৈরি করা হয়েছিল– এগুলো মূলত অবশিষ্ট ভবনগুলোর চারদিকে তৈরি করা হয়েছিল। ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যিরূশালেমের মন্দির ধ্বংসের পর, মাসাদা সর্বশেষ চিহ্ন হিসেবে বিপ্লবকে শক্তহাতে আঁকড়ে ধরে অবশিষ্ট হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছিল। কিন্তু ৭২ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয় দশম সৈন্যবহর হাজার হাজার সাহায্যকারী সৈন্য নিয়ে মাসাদার দিকে অগ্রসর হয়েছিল। সেখানে পৌঁছানোর পরে যে কোন বিপ্লবীকে পালাতে বাধা দিতে তারা সেখানে আটটি সেনা শিবির এবং মাসাদার চারদিক ঘিরে ৩ মাইল ব্যাপি অবরোধ দেয়াল স্থাপন করে। মাটি দিয়ে অবরোধের সুবিশাল কেল্লা তৈরি করা হয়েছিল এবং অবশেষে ৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয়রা প্রাসাদটির দেয়াল ভাঙ্গতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু আত্মসমর্পনের পরিবর্তে, উদ্‌যোগীরা তাদের ব্যক্তিগত সবকিছু একত্র করে পুড়িয়ে দেয়। তারপর তারা দশ জন লোককে বেছে নিয়েছিল যেন যতক্ষণ না পর্যন্ত রোমীয়দের প্রতিরোধকারী ৯৬০ জন লোকের সকলে মারা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে অবস্থানরত পরিবারগুলোর সব সদস্যদেরকে মেরে ফেলতে পারে। আর ঐ অবস্থায় কেবল দুই জন স্ত্রীলোক ও পাঁচ জন ছেলেমেয়ে গুহায় লুকিয়ে থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

যিরূশালেমের পতন

রোমীয় সম্রাট ট্রাজানের রাজত্বকালে ১১৫-১১৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় সিরেনাইকা (লিবিয়ায়), মিশর ও সাইপ্রাসে যিহূদী বিদ্রোহ মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। সাইপ্রাসে যিহূদীরা ২৪০,০০০ জন অযিহূদী লোককে হত্যা করেছিল বলে বলা হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে যিহূদীদেরকে ঐ দ্বীপ থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল।
১৩১-১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট হাড্রিয়ানের রাজত্বকালে বার কোচবা যিহূদীদের শেষ বৃহত্তর বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের এই যুদ্ধের কোন সাক্ষী

নেই। লেখক ডিও ক্যাসিয়াসের মতে সম্রাট হাড্রিয়ান গ্রীক সংস্কৃতিকে খুবই ভালবাসতেন বলে তিনি যিরূশালেমকে একটি হেলেনীয় শহরে পরিণত করতে চেয়েছিলেন এবং যিহূদীদের ত্বক্‌চ্ছেদ প্রথাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

বার কোচবার নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহ এবং যিহূদীদের চলমান প্রতিরোধ সত্ত্বেও, যিরূশালেমকে রোমীয়রা ১৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দখল করে নিয়েছিল এবং এভাবে ১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যিরূশালেমের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত যিহূদীদের সর্বশেষ দুর্গ বেত্তারের পতন ঘটেছিল। আইলিয়া ক্যাপিটোলিনা নামে যিরূশালেমকে সম্রাট হাড্রিয়ান একটি অযিহূদী শহর হিসেবে পুনঃনির্মাণ করেন এবং তাতে যিহূদী ও যিহূদী থেকে আসা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন।

পরবর্তীতে যখন যিহূদীদেরকে যিরূশালেমে ফিরে আসার অনুমতি দেয়া হয়, তখন থেকে তারা মন্দিরের পশ্চিম দেয়াল সংলগ্ন স্থানে মন্দিরের ধ্বংস নিয়ে শোক করে থাকে– যার সত্যতা ৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পাওয়া যায়। এর পরে মন্দির পুনঃনির্মাণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল এবং ধর্মত্যাগী সম্রাট জুলিয়ান এতে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন– কিন্তু এক ভূমিকম্প বা বিষ্ফোরণের কারণে তাদের এই প্রচেষ্টা হতাশায় পরিণত হয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদরা সাম্প্রতিককালে দেয়ালে খোচিত ঐ সময়কার যিশাইয় ৬৬:১৪ পদের উপর একটি উদ্ধৃতি আবিস্কার করেন, যা ছিল মন্দির পুনঃনির্মাণ বিষয়ক একটি প্রত্যাশার অভিব্যক্তি।

[জৈতুন পর্বত থেকে দেখা যিরূশালেম।]

বার কোচবা বিদ্রোহ

বিখ্যাত রব্বি আকিবা মশীহ হিসেবে ভানকারী বার কোশিবাকে– বার কোচবা ‘তারার পুত্র’ বলে ঘোষণা করেছিলেন। যে প্রসঙ্গে এটি করেছিলেন তা হল– পুরাতন নিয়মে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছিল যে ‘যাকোবের তারা’ ইস্রায়েলের অত্যাচারকারীদেরকে ধ্বংস করবেন। বার কোচবার বিদ্রোহ এতোটাই সুদূরপ্রসারী ছিল যে, ইতিমধ্যে যিহূদিয়া, শমরীয়া ও পলেষ্টিয় অঞ্চলে অবস্থানরত ষষ্ঠ ও দশম সৈন্যবহরকে সাহায্যের জন্য রোমীয়রা তৃতীয় এবং বাইশতম সৈন্যবহরকে সাহায্যের জন্য চেয়ে পাঠান এবং সেই লক্ষ্যে জার্মান ও দানিউবের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈন্যদেরকে সরিয়ে নিয়ে তাদের সমন্বিত করার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। আর এই লড়াইয়ে বাইশতম সৈন্যবহর পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। সম্রাট হাড্রিয়ান বিট্রেনের শাসনকর্তা জুলিয়াস সেভেরাস সহ তার সবচেয়ে যোগ্য সামরিক কর্মকর্তাদের রোমীয়দেরকে সাহায্য করার জন্য পাঠান। বার কোচবার যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি না হয়ে রোমীয়রা সব বিদ্রোহীগুলোকে একত্রিত করে এক জায়গাতে অবরোধ করে রাখেন। আর এভাবে হাজার হাজার বিদ্রোহী ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মারা যায়। তৃতীয় শতাব্দীর একজন ইতিহাসবিদ ডিও ক্যাসিয়াস বর্ণনা করেন যে, রোমীয়রা যিহূদীদের ৯৮৫টি বসতি ও পঞ্চাশটি দুর্গ ধ্বংস করে দেয়।

নৃশংসতার মধ্য দিয়ে বার কোচবা বিদ্রোহের অবসান এমনভাবে ঘটেছিল যে, সব

রোমীয়দের বিরুদ্ধে যিহূদীদের বিদ্রোহের একটি চিত্র

পরিবারগুলো পালিয়ে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। আর এই ঘটনা সম্পর্কে যেরোম (৩৪৫-৪১৯ খ্রীষ্টাব্দ) অবগত ছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে (১৯৬০-১৯৬১) দক্ষিণ মরুসাগরের যিহূদিয়ার প্রান্তরে অবস্থিত গুহায় প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের দ্বারা বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

রোমীয় শিবিরগুলোর অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায় গভীর গিরিখাতের উওর ও দক্ষিণে অবস্থিত সুউচ্চ খাঁড়া পাহাড়গুলোতে। সেখানে সৈন্যরা অবস্থান করতেন যেন নীচের গুহাগুলো থেকে যিহূদীরা পালিয়ে যেতে না পারে।

চিঠির গুহা

রোমীয় শিবিরের প্রায় ১১০ গজ (১০০ মিটার) নীচে হচ্ছে 'চিঠির গুহা'য় ঢোকার দুইটি প্রবেশ পথ। তিনটি বৃহৎ গুহা প্রাকৃতিক সরু পথের দ্বারা সংযুক্ত। এগুলোতে প্রাপ্ত জিনিসপত্রের মধ্যে বিদ্রোহ চলাকালীন জীবনের একটি ছবির সন্ধান পাওয়া যায়।

বার কোচবা বিদ্রোহের সময়ে গুহার মধ্যে যে লোকজন বসবাস করতো তার প্রথম স্বচ্ছ প্রমাণ হিসেবে একটি মুদ্রা পাওয়া যায়, যা গুহার প্রবেশ পথের ঠিক বাইরে পাওয়া যায়– মুদ্রাটির এক পাশে ছিল বার কোচবার প্রথম বিদ্রোহীর নামের ছাপ– 'শিমিয়োন' এবং অপর পাশে ছিল 'যিরূশালেমের মুক্তি'। যিহূদীরা কতটা তাদের স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্খিত ছিল এটি তাই নির্দেশ করেছিল। গুহাটি অবশ্যই বেশ কিছু পরিবারের লুকানোর

[১৯৬০-১৯৬১ সালে ইগায়েল ইয়াদিন 'চিঠির গুহা'তে তার খনন কাজের অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। গুহায় ঢোকায় প্রধান প্রবেশপথে যেতে হত দড়ি দিয়ে তৈরি মই বেয়ে, যেটির নিরাপত্তা দলের একজন সদস্যের দ্বারা নিশ্চিত করা হতো। দলের সদস্যরা গুহার তিনটি হলঘরের একটিতে অবস্থান করছেন।]

জায়গা ছিল। আর এদের হাড়গুলোকে গুহার মধ্যে স্তুপাকারে পাওয়া যায়। এটি ধারণা করা হয় যে, রোমীয়রা চলে যাওয়ার পর গুহায় মারা যাওয়া ঐ সব হতভাগ্য লোকদের আত্মীয়-স্বজনরা সেখানে এসে ওগুলো সংগ্রহ করেছিল।

এই গুহার বিশেষ লক্ষ্যণীয় আবিষ্কারটি ছিল বার কোচবার নিজের লেখা পনেরটি

[প্রত্নতাত্ত্বিক আবিস্কারের ফলে বার কোচবা বিদ্রোহের আরও অনেক তথ্য বের হয়ে এসেছ]

চিঠি। অধিকাংশ চিঠি তিনি নিজেই লিখেছিলেন এবং তা ঐ সময় যিহূদিয়াতে প্রচলিত তিনটি ভাষায় লেখা হয়েছিল, অর্থাৎ– অরামিক, হিব্রু ও গ্রীক ভাষায়। কেবল একটি কাঠের ফলকে লেখা ছাড়া বাকী সবগুলো চিঠি তিনি প্যাপিরাস কাগজে লিখেছিলেন।

একটি চিঠিতে তিনি কুটিরোৎসবের ভোজের প্রয়োজনীয় সরবরাহের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। বাকী চিঠিগুলো ঐন্-গদি অঞ্চলের বার কোচবার অধিনায়ককে উদ্দেশ্য করে লেখা। যে কেউ তাদের অমান্য করবে ঐ সব লোকদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য

তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল। তিনি বিদ্রোহকে বেশি শক্তিশালী করতে আরও দলীয় সদস্য পাঠানো এবং লবণ ও খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

কিন্তু এই সব অধিনায়কদের আনুগত্য ও সমর্থন ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছিল। যখন তারা ঐন্-গদিতে থাকা জাহাজের সামগ্রী সঠিকভাবে ব্যবহারে ব্যর্থ হয়েছিল– তখন তিনি তাদেরকে লিখেছিলেন: ‘তোমাদের অন্য ভাইদের কথা চিন্তা না করে, ইস্রায়েলের নিজস্ব জিনিসপত্র তোমরা ভোগ করো– তোমরা শান্তিতে খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রাম করো।’

[বার কোচবা বিদ্রোহ চলাকালীন যে সব পরিবার পালিয়ে গিয়ে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল, তারা তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র তাদের সাথে করে সেখানে নিয়ে এসেছিল। মনোরম বড় আকারের কাঁচের বাটি খেজুরের আঁশ দিয়ে সুরক্ষার জন্য বাঁধা হয়েছিল। খননে যা পাওয়া গেছে এগুলোর মধ্যে: উইলোর গাছের ডাল-পালা থেকে তৈরি ঝুড়ি, সেলাইয়ের জন্য ভেড়ার লোম, প্রসাধনী তেলের জন্য গ্লাসের ধারক, মূল্যবান পাথরের কাছাকাছি এমন পাথর দিয়ে তৈরি একটি গলার হার এবং কাঠের কাঠামোতে রাখা এই আয়না। বড় বাটি ও জগ হচ্ছে রোমীয়দের কাছ থেকে নেয়া ১৯টি ব্রোঞ্জের সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি উপকরণ, যেগুলো একটি ঝুড়িতে পাওয়া। বিধর্মী দেবতাদের মূর্তি সম্বলিত হাতওয়ালা জগ, মালিকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে যেগুলোতে পরিবর্তন আনা হয়েছিল।]

রোমীয় শাসনের অধীনে যিহূদীরা

হিব্রু ও অরামিক ভাষা

[একজন আধুনিক হিব্রু লিপিকার]

পুরাতন ও নতুন নিয়ম লেখার মধ্যবর্তী সময়ে, যিহূদীদের প্রাত্যহিক ভাষা হিসেবে হিব্রুকে পরিবর্তন করে অরামিক করা হয়েছিল। কিন্তু যিহূদী রব্বিরা তাদের পান্ডিত্যপূর্ণ শিক্ষার ক্ষেত্রে হিব্রু ভাষার ব্যবহারকে অব্যাহত রেখেছিলেন। আর এর প্রতিফলন হিসেবে আমরা যিহূদী আইন-কানুনের পুস্তক 'মিশনাহ্'কে দেখতে পাই, যা হিব্রু ভাষায় লেখা হয়েছিল। ডেড সি স্ক্রলের মধ্যকার অধিকাংশ এসেনি সম্প্রদায়ের নথিপত্রগুলো হিব্রু ভাষায় লেখা হয়। বাইবেলের নতুন নিয়মে মূল বাক্যকে যখন উদ্ধৃত হিসেবে উপস্থাপন করা হতো তখন হিব্রুর পরিবর্তে অরামিক ভাষা ব্যবহার করা হতো।

অরামিক একটি সেমেটিক ভাষা, যা প্রকৃতপক্ষে সিরিয়ার আর্মেনীয়রা ব্যবহার করতো। মধ্যপ্রাচ্যে এটি আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছিল কারণ আসিরিয়া ও পারসীকদের দূর্বহ ও প্রাচীন লিখন পদ্ধতিতে লেখা হস্তাক্ষরের চেয়ে অরামিক বর্ণমালা ব্যবহার করা খুব সহজ ছিল। আর তারা এই ভাষাটি কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক কারণে গ্রহণ করেছিল।

[খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর অরামিক লেখার খন্ডাংশ]

রাজকীয় অরামিক (খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০-২০০) ভাষা বেশ অভিন্ন ছিল যা দূরবর্তী আনাতোলিয়া ও আফগানিস্তান থেকে প্রাপ্ত শিলালিপিগুলোতে দেখতে পাওয়া যায়। পবিত্র বাইবেলের ইষ্রা ও দানিয়েল পুস্তকের কিছু অনুচ্ছেদকে এই উপভাষায় লেখা হয়েছে।

অন্যান্য সময়কাল ও উপভাষাগুলো নিম্নরূপ:

মধ্যযুগীয় অরামিক (খ্রীষ্টপূর্ব ২০০-২০০ খ্রীষ্টাব্দ): সম্রাট আলেকজান্ডারের মধ্যপ্রাচ্য জয় করার পরে, গ্রীক ভাষা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে এবং অনেকগুলো স্থানীয় উপভাষার সৃষ্টি হয়। আর এই সময়ের মধ্য থেকেই নতুন নিয়ম, ডেড সি স্ক্রলের কিছু অংশ, বার কোচবা বিষয়ক লেখা, নাবাতীয় ও পালমিরেনীয় লেখাগুলোর অরামিক সংস্করণগুলো পাওয়া যায়।

শেষ যুগীয় অরামিক (২০০-৭০০ খ্রীষ্টাব্দ): এই যুগটিতে অরামিকের পশ্চিমী শাখাটি শমরীয় ও প্যালেষ্টাইনের খ্রীষ্টিয় সাহিত্যে অরামিক ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করে। অরামিকের প্রাচ্যীয় শাখাটি সিরিয়, বাবিলের তালমুদিক অরামিক ও মান্দিক ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

যখন প্রভু যীশু ‘ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন তুমি আমায় পরিত্যাগ করেছ?’ (*এলী এলী লামা শবক্তানী*) বলে ক্রুশের উপর চিৎকার করছিলেন, তখন প্রকৃতপক্ষে তিনি অরামিক ভাষায় তা বলছিলেন। নতুন নিয়মের অনেক শব্দ রয়েছে, যেগুলো অরামিক থেকে বর্ণান্তরিত করা হয়েছে। পিতরের কৈফা নামটি এসেছে *কেফা* থেকে যার অর্থ ‘পাথর’ এবং অনুরূপভাবে, থোমা এসেছে *‘টোমা’* (যমজ) থেকে। *বার* শব্দটি অরামিক, যার অর্থ পুত্র– যা এই সব নামের ক্ষেত্রে দেখা যায়– বর্থলময়, বার -যোনা, বারাব্বা ও বরতীময়। (হিব্রু ভাষায় পুত্র সমার্থক শব্দ অর্থ ‘বেন’)। গলগাথা শব্দটি এসেছে ‘গলগোল্টা’ (মাথারখুলি) শব্দ থেকে এসেছে এবং মারানা আথা বাক্যাংশটি এসেছে যথাক্রমে *মারান* (আমাদের প্রভু) ও *এটা* (আসুন) শব্দ থেকে।

ডেড সি স্ক্রল ও বার কোচবা বিষয়ক লেখা বাদে, নতুন নিয়মের সময়কার যিহূদিয়া, শমরীয়া ও এর আশেপাশের অঞ্চল থেকে আসা অরামিক ভাষায় বড় আকারের লেখাগুলোর মধ্যে কেবল একটির অস্তিত্ব টিকে ছিল, যেটি হচ্ছে– ‘মেগিল্লাত তাকানিত’ (উপবাস বিষয়ক স্ক্রল)। অন্যান্য প্রায় সবগুলো লেখাই সংক্ষিপ্ত লিপি হিসেবে চুনা পাথরের বাক্সের উপর রয়েছে, যে বাক্সগুলোকে ১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যারা মারা গিয়েছিলেন তাদের অস্থি সংরক্ষণে ব্যবহার করা হয়েছিল। একজন প্রত্নতত্ত্ববিদের মধ্য দিয়ে যিরূশালেমের জৈতুন পর্বতে ২৯টি অস্থি সংরক্ষণের ধারকগুলোর খোদাইকৃত লিপি পাওয়া যায়, যেগুলোর মধ্যে ১১টি অরামিক, ৭টি হিব্রু ও ১১টি গ্রীক ভাষায় লেখা।

যিহূদীদের বাবিলে নির্বাসনের কিছু কাল পরে হিব্রু শাস্ত্রের অরামিক অনুবাদ এবং ব্যাখ্যাকরণকে টার্গুম বলা হতো। এই টার্গুম তাদের জন্য করা হয়েছিল যারা হিব্রুর চেয়ে অরামিক ভাল বুঝতে পারতেন। দানিয়েল, ইষ্রা ও নহিমিয় ছাড়া পুরাতন নিয়মের বাকী সব পুস্তকগুলোর টার্গুম সংস্করণ রয়েছে। প্রাচীনতম বিদ্যমান টার্গুম, কুমরানের ডেড সি স্ক্রল থেকে এসেছে। একটি গুহা থেকে উদ্ধার করা হয় ইয়োবের অংশ বিশেষের উপর টার্গুমের ব্যাপক একটি অংশ, যার সময়কাল: খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০-১০০।

[টার্গুম]

পুরাতন নিয়মের পঞ্চপুস্তকের উপর প্রধান টার্গুমটি ‘অনকেলস’ নামে পরিচিত। এটি পুরোপুরি হিব্রু ভাষার আক্ষরিক সংস্করণ এবং মনে করা হয় এর উৎপত্তি হয়েছিল যিহূদিয়া, শমরীয়া ও আশেপাশের অঞ্চলে এবং পরবর্তীতে ২য় ও ৫ম খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে বাবিলে সম্পাদন করা হয়েছিল। ভাববাদীদের পুস্তকের উপর প্রধান টার্গুমটি ‘যোনাথন’ হিসেবে পরিচিত। এটিকে অনকেলসের অনুকরণে করা হলেও, এটি অপেক্ষাকৃত কম আক্ষরিক অনুবাদ।

রোমীয় শাসনের অধীনে যিহূদীরা

[প্রভু যীশুর সময়ে যিরূশালেমে অবস্থিত যিহূদীদের মন্দিরের একটি দৃশ্য ।]

যিহূদীদের ধর্মীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়

শমরীয় সম্প্রদায়

অসিরিয়রা যখন ইস্রায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় দশটি বংশকে বন্দি করেছিল তখন তারা এদের অনেক লোককে ৭২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ঐ সময় মেসোপটমিয়া ও সিরিয়া থেকে অনেক অযিহূদীদেরকে তাদের জায়গায় বসতি স্থাপন করতে দেওয়া হয়। আর এই অযিহূদী লোকেরা সেখানে থেকে যাওয়া যিহূদীদের সাথে পারস্পরিক বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। এদের মধ্য দিয়েই একটি মিশ্র জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়, যাদেরকে শমরীয় বলা হয়ে থাকে।

৪৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যিহূদী নেতা নহিমিয় (নহিমিয় ৪ অধ্যায়) যিরূশালেম শহরের দেয়াল পুনঃনির্মাণের কাজ শুরু করেন। এই নির্মাণ কাজে সাহায্যের জন্য শমরীয়রা যে সাহায্যের প্রস্তাব করেছিল তা তিনি প্রত্যাখান করেছিলেন। তারপর তিনি এই বিষয়ে তাদের শাসনকর্তা সন্‌বল্লটের বিরোধীতার সম্মুখীন হয়ে শসস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা করেন এবং যিরূশালেমের দেয়াল পুনঃনির্মাণের কাজ চালিয়ে যান।

শমরীয়রা তাদের শাসনকর্তা দ্বিতীয় সন্‌বল্লটের অধীনে গরিষীম পাহাড়ে একটি পৃথক মন্দির নির্মাণ করে। তখন যিহূদী ও শমরীয়দের মাঝে দূরত্বের ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পায়। গরিষীম পাহাড়ের নিজস্ব মন্দিরে কেবল উপাসনার ক্ষেত্রেই শমরীয়রা যিহূদীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি, বরং তারা পবিত্র শাস্ত্রের পুরাতন নিয়মের শুধু প্রথম পাঁচটি পুস্তককে তাদের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু ১২৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে

[ছবিতে গালীল থেকে আসা যিহূদীদেরকে যিরূশালেমে যাওয়ার জন্য শমরীয়দের পাহাড়ী এলাকার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল।]

যিহূদী নেতা যোহন হির্কানাস শমরীয়দের ঐ মন্দিরটি ধ্বংস করে দেন।

প্রভু যীশুর সময়ে শমরীয় ও যিহূদীদের মাঝে খুবই শত্রুতা ছিল। কোন কোন সময় শমরীয়রা যিহূদী তীর্থযাত্রীদেরকে তাদের এলাকার মধ্য দিয়ে যেতে বাধা দিত। অন্য দিকে, সেখানকার অধিকাংশ যিহূদী মনে করতো যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তে উল্লেখিত "দয়ালু শমরীয়" (লূক ১০:২৯-৩৭) বলে কোন শমরীয় সেখানে ছিল না।

বর্তমানে প্রায় ১,০০০ শমরীয় এখনও জীবিত আছে। তারা প্রধানত চারটি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী থেকে এসেছে। তাদের অনেকে এখনও গরিষীম পাহাড়ে তাদের পবিত্র স্থানের কাছে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে জীবন যাপন করছে। অন্যরা ইস্রায়েল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সেখানে তারা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসাবেই বিবেচিত হয়। কোনমতে টিকে থাকা এই ধর্মীয় সম্প্রদায় বা উপদলটি কোন মন্দির ছাড়াই সত্যিকার অর্থে এখনো নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপনে ভেড়া উৎসর্গ করে, কিন্তু যিহূদীরা তাদের মন্দির ছাড়া তা করতে পারে না।

ফরীশী সম্প্রদায়

ফরীশী নামের আক্ষরিক অর্থ 'বিচ্ছিন্ন জনেরা'। তাদের উৎপত্তির কথা বিবেচনা করলে, আমাদেরকে সেই 'ধার্মিক' (ইব্রীয় হাসিদিম) আন্দোলনের দিকে ফিরে যেতে হবে, যেখানে তারা ম্যাক্কাবীয়দের সাথে খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে যিহূদী সংস্কৃতিতে গ্রীক সাংস্কৃতিক উপকরণের প্রবর্তনকে বাধা দিয়েছিল।

[একজন সাধারণ ফরীশীর পোশাক।]

স্বতন্ত্র দল হিসেবে ফরীশীদের কথা প্রথম উল্লেখ করা হয়েছিল মহাযাজক যোনাথনের (খ্রীষ্টপূর্ব ১৬০-১৪৩ শতাব্দী)। যেখানে এসেনিস দলের সদস্যরা নতুন কোন যুগের এক রাজ্যের সন্ধান করতো, সেখানে ফরীশীরা অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্র দল হিসেবে টিকে থাকার আপোষ করতে ইচ্ছুক ছিল। আর এই কারণে এসেনিসরা তাদেরকে 'ভন্ড' বলে ডাকত। অন্যদিকে, ফরীশীরা দৃঢ়ভাবে পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতো এবং এই বিষয়ে প্রায়ই তাদের সাথে সদ্দূকীদের ঝগড়া-বিবাদ হতো। কারণ তারা এই মত পোষণ করতো যে, 'যেহেতু মৃতদের কোন পুনরুত্থান নেই, তাই যে জগত আসছে

তাতে মৃতদের কোন অংশ নেই’। মূলত সদ্দূকীরা পেশাগতভাবে পুরোহিত ছিল, তাই মন্দিরে উপাসনার রীতিনীতি পালনের বিষয়ে তারা সব সময় সজাগ থাকত। আর ফরীশীরা প্রাথমিকভাবে ধর্ম-শিক্ষক ছিল যারা মৌখিক আইন-কানুন অনুসারে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দিত– যা ছিল লিখিত আইন-কানুনের মতই প্রাচীন।

[একজন গোঁড়া যিহূদী তার সকালের প্রার্থনা করছেন। যার কপালে রয়েছে চামড়ার ছোট বাক্স, যাতে মোশির আইন-কানুনের লিখিত অংশ বিশেষ রয়েছে– আইন-কানুন বিষয়ক আদেশের আক্ষরিক ব্যাখ্যা, যাতে আইন-কানুনকে নিজের সাথে বেঁধে ফেলতে পারেন।]

মোশির আইন-কানুন (তৌরা/ পঞ্চপুস্তক) ব্যাখ্যায় তাদের সর্বপ্রথম উদ্যোগটি ছিল তাদের সময়কার পরিবর্তনশীল অবস্থার কাছে বিশদ ব্যাখ্যার মাধ্যমে অনন্তকালীন আইন-কানুনকে উপস্থাপন করা। দ্বিতীয়ত, তারা আইন -কানুনের চারপাশে একটি সুরক্ষা দেয়াল সৃষ্টি করতে চাইত। বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের দ্বারা আইন-কানুনকে ভেঙ্গে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে চাইত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, যদি আইন-কানুন বলে– সকালের মধ্যে কোন কাজ শেষ করতে হবে, তাহলে রব্বিরা আরও একটি ধাপ এগিয়ে যাবেন এবং বলবেন যে সকালের আগে মধ্য রাতের মধ্যেই কাজটি শেষ করতে হবে। একজন দর্জি অবশ্যই শুক্রবারে তার কাপড়ে সূঁচ বসাবে না এই ভয়ে যে, যদি এটিকে তিনি তার সাথে রাখেন তবে বিশ্রামবারের নিয়মটি ভেঙ্গে যাবে। এটি ছিল নগণ্য বিষয় নিয়ে অক্ষরে অক্ষরে আইন-কানুন পালনের একটি উদাহরণ। প্রভু যীশু এরকম আক্ষরিক আইন-কানুন পালনের নিন্দা জানিয়েছিলেন (মথি ২৩:১-২৮)।

তবে যাহোক, সব ফরীশীরাই ভন্ড ছিল না। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগেকার প্রজন্মের, বাবিল থেকে আসা হিল্লেল নামের একজন বিখ্যাত রব্বি বলেছিলেন: ‘যা কিছু তোমার কাছে ঘৃণ্য, তা অন্যের প্রতি করো না।’ আবার হিল্লেলের নাতি গমলিয়েল ঐ সময়কার খুবই বিখ্যাত একজন রব্বি ছিলেন। প্রেরিত পৌল যার অধীনে পড়াশোনা করেছিলেন এবং খ্রীষ্টকে গ্রহণের আগে তিনি একজন খুবই উদ্যোগী ও আগ্রহী ফরীশী ছিলেন।

ফরীশীরা উদ্‌যোগীদের বিপ্লবী নীতির বিরোধিতাও করতো। ফরীশীদের নেতা

যোহানান বেন জাক্কাই সম্রাট ভেসপাসিয়ানের কাছ থেকে যাফোর কাছে যামনীয়াতে (যব্‌নী) একটি বিদ্যালয় খোলার অনুমতি নিয়েছিলেন যেখানে রব্বি হবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হত, যা ফরীশী মতবাদকে যিহূদী-রোমীয় যুদ্ধের মধ্যেও টিকে থাকতে সাহায্য করেছিল।

এসেনিস সম্প্রদায়

নতুন নিয়মে এসেনিস নামে কোন ধর্মীয় উপদলের নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে এদের বিষয় কেবল ইতিহাসবিদ যোসিফাস, ফাইলো ও প্লিনি এল্ডারের লেখা থেকে পাওয়া যায়। অধিকাংশ পন্ডিতেরা তাদেরকে কুমরানের সন্যাসী সম্প্রাদায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেনে, যারা ১৯৪৭ সালে আবিস্কৃত ডেড সি স্ক্রলগুলো তৈরি করেছিলেন।

যদিও বিবাহিত এসেনিসরা গ্রামের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু সর্বোচ্চ আদর্শনীয় লক্ষ্য অর্জন করতে পারতো কুমরানের ব্রহ্ম সম্প্রদায়। সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সদস্যরা এর সম্পত্তিকে সার্বজনীনভাবে ব্যবহার করতো। তারা ধর্মীয় প্রথাগত নিমজ্জনের পুনরাবৃত্তি ঘটাতো এবং সাধারণ ভোজে অংশ নিত। তারা মনে করতো যে, সদ্দূকীরা দূর্নীতিপরায়ণ এবং ফরীশীরা পুরোপুরিভাবে প্রথাগত নিয়ম-কানুন পালনে অক্ষম।

এসেনিসদের ‘দামেস্ক নথিপত্র’ অনুসারে জানা যায় যে, বিশ্রামবারে যদি কেউ গর্তে পড়ে যায়, তবে তারা তাকে কোন প্রকার যন্ত্র-সরঞ্জাম ছাড়া উদ্ধার করার পক্ষপাতি। যাহোক, ফরীশীরা এই মত পোষণ করতো যে, বিশ্রামবার পালনের চেয়ে জীবন রক্ষা করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রভু যীশু সম্ভবত এসেনিসদেরকেই নির্দেশ করেছিলেন যখন তিনি সেই লোকদের নির্দেশ করেছিলেন (মথি ৫:৪৩) যারা শিক্ষা দিত যে শত্রুকে ঘৃণা করা তাদের কর্তব্য।

ডেড সি স্ক্রলগুলোর দলটি স্পষ্টতই যে দুইজন মশীহের প্রত্যাশা করতো, তারা হলেন: লেবির বংশ থেকে যাজক মশীহ এবং যিহূদার বংশ থেকে রাজকীয় মশীহ। তারা বিশ্বাস করতো যে, শেষ কালের দিনগুলোতে যখন

[এসেনিসরা দলবদ্ধ হয়ে মরু-সাগরের গুহায় বাস করতো ও ধর্মগুরুর অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করতো।]

আলোর সন্তান ও অন্ধকারের সন্তানদের মাঝে চূড়ান্ত যুদ্ধ হবে, তার আগে তারা থাকবেন। 'ধার্মিকতার শিক্ষক' হিসেবে তাদের অজ্ঞাতনামা নেতার উপর মহাযাজক নির্যাতন চালিয়েছিলেন।

১৯৫১ ও ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে, খিরবেত কুমরানের খনন থেকে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, যিহূদী নেতা হির্কনাসের (খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৪-১০৪) সময়ে এসেনিসরা সেখানে বসতি স্থাপন করেছিল। কমপক্ষে ৪০০ জন লোক কুমরানে থাকতো। এক হাজারেরও বেশি সমাধির একটি কবরস্থানে সংগৃহীত হয়েছে স্ত্রীলোক ও ছেলে-মেয়েদের অস্থিগুলো– এগুলো সম্ভবত বিবাহিত এসেনিস পরিবারের সদস্যদের।

ডেড সি স্ক্রলে সংগৃহীত হয়েছে পুরাতন নিয়মের হিব্রু পান্ডুলিপি। নবম শতাব্দীর হিব্রু পুরাতন নিয়মের ম্যাসোরেটিক অনুলিপির চেয়েও এক হাজার বছরের পুরনো এটি। আগে ম্যাসোরেটিক অনুলিপির উপর অনুবাদকদেরকে নির্ভর করতে হত। পরবর্তী নথিপত্রের সাথে তুলনা করলে দেয়া যায় যে, এগুলো সঠিক অনুলিপি। অন্যান স্ক্রলগুলো নির্দেশ করে যে, 'সেপ্টুয়াজিন্ট' নামের পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ সম্ভবত ভিন্ন কোন হিব্রু মূল অনুলিপি থেকে তৈরি। আবার কিছু সংখ্যক অনুলিপি শমরীয়দের দ্বারা গৃহীত পুরাতন নিয়মের ব্যাখ্যাকৃত প্রথম পাঁচটি পুস্তকের ধরনের অনুরূপ হিসেবে পাওয়া যায়।

স্ক্রলের মধ্যে প্রথমবারের মত অপ্রামাণিক (এপেক্রিফাল) কাজগুলোর হিব্রু ও অরামিক পান্ডুলিপি পাওয়া যায়, যেমন– 'তোবিত' ও 'এক্লেসিয়াসটিকাস'। আর এগুলোর জন্য আগে আমাদের কেবল গ্রীক সংস্করণ ছিল। এছাড়াও অন্যান্য যেসব কাজ রয়েছে তাদের মধ্যে 'হনোক', 'জুবিলী' এবং অপ্রামাণিক 'আদিপুস্তক' দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মীয় উপদলটির সাথে সংযুক্ত লেখাগুলোও আবিস্কৃত হয়েছে এবং যার অংশীভূত হয়েছে– 'দামেস্ক নথিপত্র', *শৃঙ্খলা বিষয়ক সারগ্রন্থ*, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের গান, মন্তব্য এবং *যুদ্ধ বিষয়ক স্ক্রল*। অবিশ্বাস্য পরিমাণ সোনা ও রুপার সত্যিকার মানচিত্র সম্বলিত একটি তাম্র স্ক্রলও এতে স্থান পায়।

যিহূদীদের ধর্মীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়

[প্রথম যিহূদী যুদ্ধের সময়ে কুমরানের এসেনিসরা তাদের ডেড সি স্ক্রল পাঠাগারের পান্ডুলিপিগুলো এই গুহাগুলোতে লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং একজন মেষপালক ১৯৪৭ সালে হঠাৎ তা খুঁজে পেয়েছিল।]

প্রত্নতাত্ত্বিক খননগুলোর ৭ম গুহা থেকে উদ্ধারকৃত গ্রীক লেখাগুলোকে একজন বিখ্যাত পন্ডিত নতুন নিয়মের পান্ডুলিপি হিসেবে সনাক্ত করেন। কিন্তু তা এত বেশি খণ্ডিত যে, এই দাবীকে তা সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়।

প্রভু যীশুর আগে ধার্মিকতার শিক্ষককে ক্রুশ বিদ্ধ করে মেরে ফেলা হয়েছিল এবং মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছিল– জনপ্রিয় এই অনুমানের কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। বাপ্তিস্মদাতা যোহন তপস্বী ও সন্যাসী ছিলেন, কুমরানের কাছে বাস করতেন এবং তাঁর শ্রোতাদের বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন, তাই কিছু লেখক ইঙ্গিত করেছেন যে, এসেনিসদের সাথে তাঁর হয়তো যোগাযোগ ছিল। কিন্তু যোহনের এই বাপ্তিস্মের অনুষ্ঠান শুধু একবার পালন করা হত, যা কুমরানে বাসকারীদের বারবার ধৌতকরণের বিপরীত।

কুমরানে সন্যাসীদের মঠ ও এসেনিস সম্প্রদায়ের অবস্থান পাশাপাশি ছিল বলে রোমীয়রা ৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দুইটি অবস্থানকে একসাথে ধ্বংস করেছিল।

[মরুসাগরের তীরে এসেনিসদের বসতি। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে তুলে ধরা– একটি লেখার কক্ষ, জলাধার, প্রথাগত ধৌতকরণের স্নানাগার, একটি রান্নাঘর এবং আরও অন্যান্য কক্ষ।]

সদ্দূকী সম্প্রদায়

এই ধর্মীয় উপদলটির নাম সদ্দূকী দেয়া হয়েছে কারণ তারা নিজেদেরকে রাজা দায়ূদ ও শলোমনের সময়কার মহাযাজক সাদোকের বংশধর বলে দাবী করতো। এই দলটি খুবই ধনী অভিজাত পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত ছিল, যারা মহাযাজকের দপ্তর নিয়ন্ত্রণ করতো। তারা স্বর্গদূত ও পুনরুত্থান বিষয়ক বিশ্বাসকে প্রত্যাখান করেছিল। কিন্তু তারা উদারপন্থী যুক্তিবাদীও ছিল না। বরং, তারা গোঁড়া রক্ষণশীল হিসেবে মোশির পুস্তকের আইন-কানুন (পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি) পালন করতো এবং মোশির আইন-কানুনের পরবর্তী

[সদ্দুকীয় সম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিতগণ যারা মন্দির পরিচালনার ক্ষমতা উপভোগ করতো।]

ব্যাখ্যাসমূহ, যাকে 'মৌখিক আইন-কানুন' বলা হয়, তা প্রত্যাখান করেছিল।

যিরূশালেমে প্রভু যীশুর মন্দির পরিষ্কারকরণ এবং পুনরুত্থানের বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের জন্য সদ্দূকীরা প্রচন্ড রেগে গিয়েছিল। এরা ছিল সদ্দূকীদের সেই প্রধান পুরোহিত, যারা শত্রুদের হাতে প্রভু যীশুর ধরা পরার পরে তাঁর রাত্রিকালীন বিচারে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে পীলাতের হাতে তুলে দিয়েছিল। প্রভু যীশুর মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার পর যখন পিতর ও অন্যান শিষ্যরা প্রচার করেছিলেন, তখন এই সদ্দূকীরাই প্রথমে তাঁদেরকে বাধা দিয়েছিল। ৭০ খ্রীষ্টাব্দে মন্দির ধ্বংস তাদের অস্তিত্বের কারণও ধ্বংস করে দিয়েছিল, তাই এই সময়ে তারা আর টিকে থাকতে পারেনি।

সমাজ-ঘর

খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বাবিলে নির্বাসনের সময়, যিহূদীরা সমাজ-ঘরে সমবেতভাবে প্রার্থনা করতে ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে শুরু করেছিল। কমপক্ষে দশজন পুরুষ সদস্যকে নিয়ে একটি সমাজ-ঘর গঠিত হয়। স্ত্রীলোকেরা পৃথক একটি অংশে বসতো, তবে উপাসনার কার্যক্রমে তাদের অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল।

মুক্তিপ্রাপ্ত দাস অথবা প্রাক্তন দাসদের জন্য সমাজ-ঘর সহ যিরূশালেমে বহুসংখ্যক সমাজ-ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কফরনাহূমে তৃতীয় অথবা চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে ভালভাবে

[বর্তমান সময়ের আধুনিক সমাজ-ঘর।]

সংরক্ষিত সমাজ-ঘরটি নির্মাণ করা হয়েছিল, তবে এটি প্রায় নিশ্চিত যে এটি সেই ভবনটির উপর অবস্থিত যেখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কথা বলেছিলেন। প্রথম শতাব্দীর কেবল একটি সমাজ-ঘর দেখতে পাওয়া যায়, যা মাসাদার খনন কাজের ফলে উদ্ধার করা হয়েছে।

প্রেরিত পৌল যেখানেই প্রচার করেছিলেন না কেন, তিনি প্রথমে স্থানীয় সমাজ-ঘরে খ্রীষ্টের বার্তাকে যিহূদীদের কাছে তুলে ধরেছিলেন। খুবই যোগ্যতা সম্পন্ন রব্বি হিসবে তাঁকে সমাজ-ঘরে তৌরাহ্ (পঞ্চপুস্তক) ও ভাববাদীদের পুস্তকের নির্ধারিত অংশের উপর বিশদ ব্যাখ্যার জন্য আমন্ত্রণ জানাতো হতো। তাঁর প্রচার-যাত্রায় তিনি ফিলিপীতে 'প্রাথনার একটি জায়গা'তে গিয়েছিলেন। এটি ছিল একটি সমাজ-ঘরের সাধারণ বর্ণনা এবং ঐতিহ্যগতভাবে স্বীকৃত নদী তীরবর্তী একটি নিছক প্রার্থনার জায়গার বদলে সম্ভবত এটি একটি সমাজ-ঘরই ছিল।

কিছু কিছু সমাজ-ঘর আকারে অনেক বড় ছিল। তুরস্কের পশ্চিমাঞ্চলের সার্দির একটি

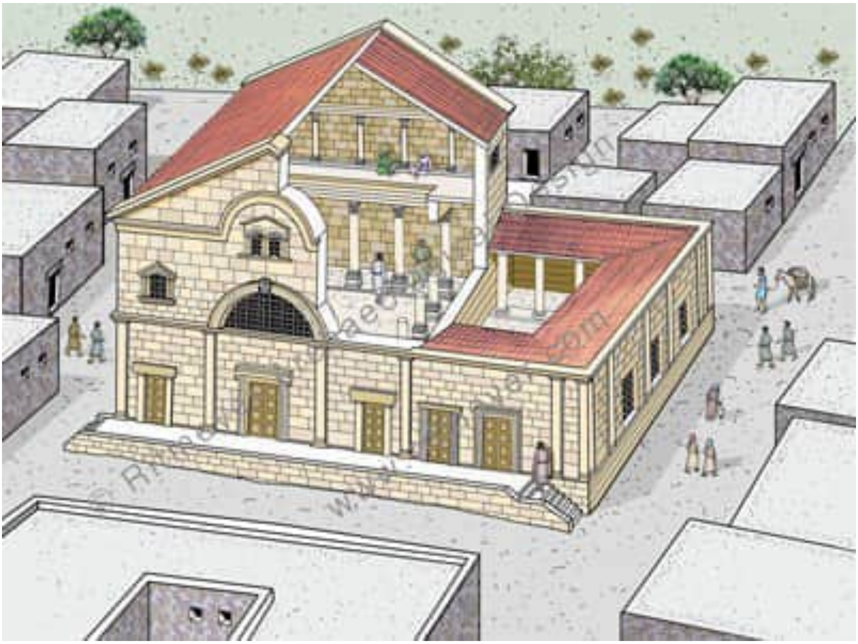

[দ্বিতীয় শতাব্দীতে একজন স্থপতির দ্বারা কফরনাহূমের সমাজ-ঘরের পুনঃনির্মাণের একটি ছবি। এটির প্রান্তে রয়েছে নিয়ম সিন্দুক ও মাঝে রয়েছে হেলানো ডেস্ক– যেখান থেকে মোশির আইন-কানুন ও শাস্ত্রাংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হতো। উপাসনাকারীদের মধ্যে পুরুষেরা নীচে বেঞ্চে ও স্ত্রীলোকেরা উপরে মঞ্চে বসতেন।]

যিহূদীদের ধর্মীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়

প্রত্নতাত্ত্বিক খননে একটি বিশাল সমাজ-ঘরের সন্ধান পাওয়া যায়– যেটি ২০০-৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যবহৃত হতো। এটির প্রধান সভাকক্ষটির দৈর্ঘ্য ৬০ মিটার/ ৬৫ গজ এবং সামনের আঙ্গিনা ও বারান্দা সহ এর বাড়তি দৈর্ঘ্য ৪০ মিটার/ ৪৩ গজ। আলেক্জান্দ্রিয়ার বিখ্যাত ডিপ্লোস্টোন সমাজ-ঘরটি এতই বিশাল যে উপাসনা চলাকালীন একজন লোককে ভবনটির মাঝখানে বসিয়ে রাখা হতো যেন সে একটি পতাকা নেড়ে পিছনের দিকে বসা লোকদেরকে ‘আমেন’ বলার সঠিক সময়টি নির্দেশ করতে পারেন।

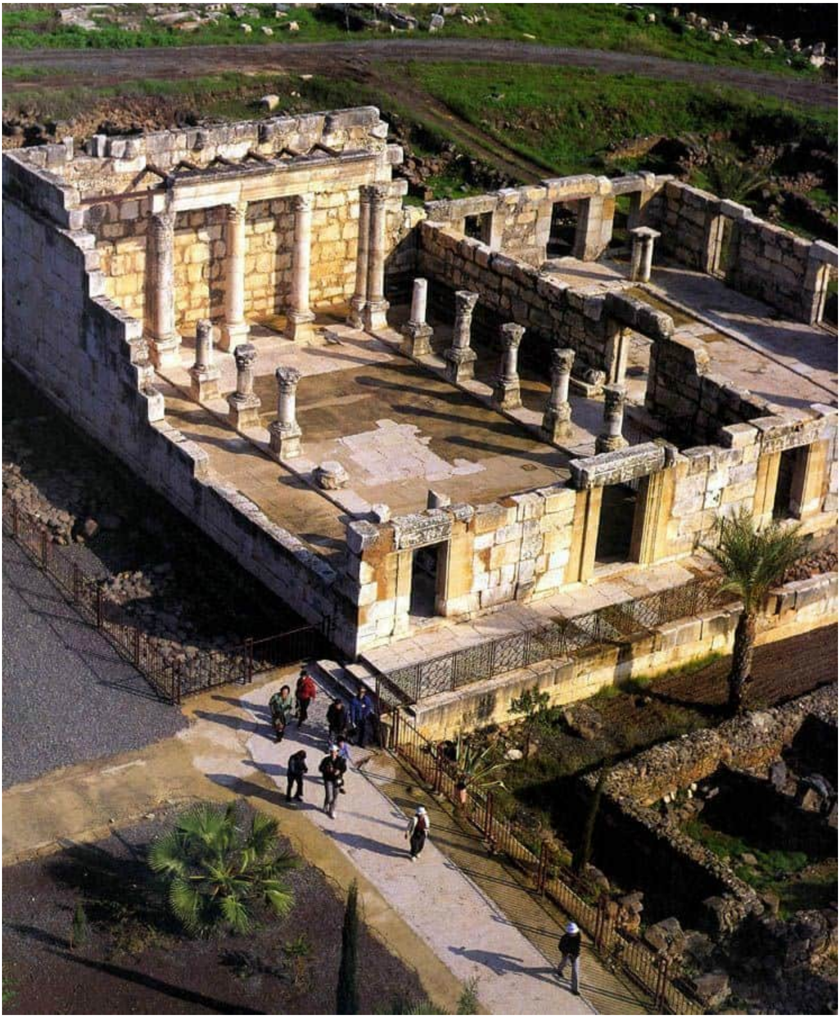

[প্রাচীনকালের একটি সমাজ-ঘরের ভগ্নাংশ।]

মিশনাহ্ ও তালমুদ

ফরীশী রব্বিরা তাদের অধিকাংশ সময়কে মোশির আইন-কানুনের উপর মৌখিক মন্তব্য করতে ব্যয় করতেন। আর প্রথম দুই খ্রীষ্টাব্দে তাদের এভাবে তৈরি মন্তব্যগুলোকে প্রায় ২০০ খ্রীষ্টাব্দে যিহূদা হানাসি সংগ্রহ করে গুরুত্বপূর্ণ সংকলন হিসেবে তুলে ধরেছিলেন, যা 'মিশনাহ্' নামে পরিচিত। এই রব্বিরা 'তান্নাইম' বা 'শিক্ষক' বলে পরিচিত ছিলেন এবং তারা প্রধানত নিয়ম-কানুন বিষয়ক সিদ্ধান্তের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতেন। আইন-কানুনের উপর ফরীশীদের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যকে 'তোসেফতা' বা 'পরিবর্ধন' বলা হয়।

মিশনাহ্‌র উপর পরবর্তী ব্যাখ্যাগুলো প্রদান করা হয়েছিল প্যালেষ্টাইনী ও বাবিলীয় ব্যাখ্যাকারীদের (আমোরাইম) দ্বারা। আর এদেরকে সম্মিলিতভাবে 'গেমারা' বা 'সম্পূর্ণতা' বলা হয়। 'মিশনাহ্' ও সংশ্লিষ্ট 'গেমারা' সমন্বয়ে তৈরি পুস্তকটিই 'তালমুদ' নামে পরিচিত। আর মোশির আইন-কানুনের উপর এই সব ফরীশীয় ঐতিহ্যগত মৌখিক মন্তব্যগুলোই বর্তমান সময়ের গোঁড়া যিহূদী ধর্মমতের ভিত্তি।

মিদরাশিম নামে পরিচিত শাস্ত্রের উপর ধর্মীয় মন্তব্য বিষয়ক বক্তব্যগুলোকেও সংগ্রহ করা হয়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ের তান্নীয় মিদরাশিম'গুলো মূলত আইন-কানুনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় ছিল। যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনা পুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণের উপর মন্তব্য সেগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

পরবর্তী আমোরীয় মিদরাশিমে লোকগাথা ও পৌরাণিক উপকরণ স্থান পায়। এই বিষয়ের উপর সবচেয়ে ব্যাপক সংকলন হলো মিদরাশ রাব্বাহ্– যা ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম শতাব্দীতে সংকলিত হয়েছিল। পাঁচটি আইন-কানুন বিষয়ক পুস্তক (পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি পুস্তক) এবং ক্যান্টিকলস, রূত, বিলাপ, উপদেশক ও ইষ্টেরের স্ক্রলের উপর মন্তব্য এর অংশীভূত।

[মিশনার একটি পৃষ্ঠার ছবি]

[তালমুদের একটি পৃষ্ঠার ছবি]

যিহূদীদের ধর্মীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়

[গরিষীম পাহাড়ে শমরীয় সম্প্রদায়ের উপস্থিত হওয়ার একটি দৃশ্য।]

রোম সাম্রাজ্য জুড়ে থাকা যিহূদীরা

যিহূদী ইতিহাসবিদ যোসিফাস যিরূশালেম নিস্তারপর্ব উদ্‌যাপন করতে আসা ৩০ লাখ তীর্থযাত্রীদের উপচে পড়া এবং প্রথম যিহূদী-রোমীয় যুদ্ধের সময় দশ লাখেরও বেশি লোককে হত্যা করার কথা লিখেছেন। উল্লেখিত এই সংখ্যাগুলো পুরোপুরি অতি-রঞ্জিত একটি হিসাব বলে অনেকের কাছে মনে হয়েছে। কারণ একজন আধুনিক পন্ডিত– তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা: ১২৫,০০০-১৫০,০০০; যিরূশামের স্থায়ী জনসংখ্যা: ২৫,০০০-৫৫,০০০; এবং দ্বিতীয় একজনের মতে, ১৫০,০০০ ও তৃতীয় একজনের মতে, তখনকার পুরো যিহূদী ও অযিহূদীদের অঞ্চলটিতে যিহূদীদের মোট জনসংখ্যা পাঁচ লাখ ছিল বলে মনে করেন। কারণ সবচেয়ে ঘন জনবসতিপূর্ণ পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরগুলো সহ পুরো রোমীয় সম্রাজ্যে সাড়ে পাঁচ কোটি থেকে আট কোটি জনসংখ্যা ছিল বলে অনুমান করা হয়।

স্পষ্টতই সেই সময় যিহূদিয়া, শমরীয়া ও পলেষ্টিয় অঞ্চলগুলোতে যত সংখ্যক যিহূদী

[রোম সাম্রাজ্য জুড়ে যেসব জায়গায় যিহূদীরা বসবাস করতো।]

রোম সাম্রাজ্য জুড়ে থাকা যিহূদীরা

থাকত, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক যিহূদী এর বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। পঞ্চাশত্তমীর দিনে (প্রেরিত ২:৫-১৩) পুরো সাম্রাজ্যের সব জায়গা থেকে আসা বিভিন্ন সংখ্যক যিহূদীরা ছিল তীর্থযাত্রী। এদেরকে বলা হত ডায়োস্পরা যিহূদী বা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা যিহূদী।

যিরূশালেম ও বেথ-শিরিমে যাদেরকে কবর দেয়া হয়েছিল, তাদের কবরের সমাধিলিপিগুলো সারা বিশ্বজুড়ে যিহূদীদের ছড়িয়ে পড়াকে নির্দেশ করে। আর এই সমাধিলিপিগুলো সিরিয়ার পালমিরা, লিবিয়ার কুরীণী, গ্রীসের লেসডেমন, আইজিয়ানের ডেলোস, ইতালির কাপুয়া এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে আসা যিহূদীদেরকে তুলে ধরে।

মিশরের যিহূদীরা

লেখক ফাইলোর মতে, সর্বমোট পচাশি লাখ মিশরীয় জনসংখ্যার দশ লাখই ছিল যিহূদী। যদিও অনেকে মনে করেন যে, এটি খুব বাড়িয়ে বলা হয়েছে। যাহোক, এটি নিশ্চিত যে, বিখ্যাত আলেক্জান্ড্রিয়ার পাঁচটি বড় জেলার দুইটিই ছিল যিহূদীদের। যেখানে রোমের পর কেবল আলেক্জান্ড্রিয়ারই লোকসংখ্যা ছিল তিন লাখেরও বেশি।

[খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ব্যাপক সংখ্যক যিহূদী মিশরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে– যখন মিশরের টলেমীয় রাজারা যিহূদিয়া শাসন করতেন। আর ঐ সময়েই সাক্কারায় এই পিরামিডটি ২০০০ বছর ধরে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।]

রোম সাম্রাজ্য জুড়ে থাকা যিহূদীরা

আর বিখ্যাত যিহূদী লেখক ফাইলো (২০-৫০ খ্রীষ্টাব্দ) গ্রীক সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত জগতের জ্ঞানালোকিত কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এই আলেক্‌জান্দ্রিয়া থেকেই এসেছিলেন। তিনি হিব্রু ভাষা জানতেন না, গ্রীক দার্শনিক মূলনীতির আলোকে রূপক ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ব্যাখ্যা করতেন। তিনি তার মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে একটি মধ্যস্থকারী আছে যা হচ্ছে 'বাক্য' (লগোস)। আর এই ধারণাটি সম্ভবত যোহনের সুসমাচারের লেখককে প্রভাবিত করেছিল এবং পরবর্তী খ্রীষ্টিয়ান লেখকদেরকেও নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করেছিল।

আলেক্‌জান্দ্রিয়ার যিহূদীদের একটি স্বায়ত্ত শাসিত সম্প্রদায় ছিল– তবে যোসিফাস এই মতের বিপক্ষে দাবী তুললেও সত্যিকার অর্থে তাদের নাগরিকত্বের পূর্ণ অধিকার ছিল না। আলেকজান্দ্রিয়ার যিহূদী ও গ্রীকদের মাঝে সব সময় বিরোধ লেগেই থাকতো। যখন রাজা ১ম আগ্রিপ্প ৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই শহর পরিদর্শনে গিয়েছিলেন, তখন পূর্ণ মাত্রায় দাঙ্গা বাঁধে ও যিহূদীদের ৪০০টি বাড়ি-ঘর ধ্বংস হয়ে যায়। আর ফাইলো সম্রাট গাইয়াস ক্যালিগুলার কাছে গিয়ে সেখানকার শাসনকর্তা ফ্লাক্কাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। কিন্তু সম্রাট ক্যালিগুলা তাদের এই আবেদনকে এই অবজ্ঞাসূচক উক্তি সহকারে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন: 'আমার কাছে মনে হয় সেই সকল লোকেরা বোকা যারা বিশ্বাস করে না যে, আমি একজন দেবতা। তাদেরকে নিন্দার চেয়ে করুণা করা উচিৎ।' পরবর্তীতে তার বন্ধু রাজা আগ্রিপ্পের অনুরোধে সম্রাট ক্যালিগুলা শাসনকর্তা ফ্লাক্কাসকে হত্যা করেছিলেন।

অবারও সম্রাট ক্লৌদিয়ের অধীনে যিহূদী ও অন্যান্য আলেক্‌জান্দ্রিয়দের মাঝে গোলমাল দেখা দেয় এবং একটি চিঠির মাধ্যমে তিনি তাদেরকে সতর্ক করে বলেছিলেন: 'আমি আলেক্‌জান্দ্রিয়দেরকে আদেশ দিচ্ছি যেন তারা অনেক বছর ধরে একই শহরে বসবাস করতে থাকা যিহূদীদের প্রতি সহনীয় ও দয়ালু হয় ... আমি সুস্পষ্টভাবে যিহূদীদেরকে নিষেধ করছি যেন তারা আরও সুযোগ-সুযোগ সুবিধার জন্য উত্তেজিত না করে ... এটিও বলছি যেন মল্লক্রীড়ার স্থানে খেলার মাঝে তারা জোর করে প্রবেশ না করে।'

[মিশরের বর্তমান রাজধানী কায়রোর একটি দৃশ্যপট।]

ফাইলোর ভাই আলেকজান্ডার দি এ্যালাবার্চ সরকারীভাবে কর সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী লোকদের একজন এবং সম্রাট ক্লৌদিয়ের বন্ধু ছিলেন। যিরূশালেমের যিহূদীদের মন্দিরের ফটকের জন্য তিনি সোনা ও রূপার পাতগুলো সরবরাহ করেছিলেন।

আলেক্জান্ডারের ছেলে তিবিরিয় যুলিয় আলেক্জান্ডার যিহূদী সংস্কৃতি ও ধর্ম ছেড়ে রোমীয়দের মধ্যকার সর্বোচ্চ অবস্থানের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ৪৬-৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যিহূদিয়ার শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আর ৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মিশরের শাসনকর্তা হন এবং এই সময়ে যিহূদী-রোমীয় যুদ্ধ শুরু হয়। তিনি স্বজাতি যিহূদীদের বিরুদ্ধে রোমীয়দের দাঁড় করানোর জন্য দায়ী ছিলেন এবং এতে ৫০,০০০ যিহূদীকে হত্যা করা হয়েছিল। আর তিনিই ছিলেন প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রোমীয় কর্মকর্তা যিনি ৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভেসপাসিয়ানকে সম্রাট হিসেবে অভিবাদন জানিয়েছিলেন এবং সম্রাট তীতের অধীনে যিরূশালেম অবরোধের সময়, তিনি সৈন্যবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

সিরিয়ার যিহূদীরা

খ্রীষ্টকে গ্রহণের পূর্বে খ্রীষ্টি-বিশ্বাসীদেরকে অত্যাচার করার জন্য বিভিন্ন সমাজ-ঘরকে

উদ্দেশ্য করে লেখা মহাযাজকের চিঠি নিয়ে প্রেরিত পৌল খুব উৎসাহ নিয়ে দামেস্কের পথে যাত্রা করেছিলেন (প্রেরিত ৯:১-৩)। যদিও পৌলের খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তাঁর হত্যাকাণ্ড চালাবার পরিকল্পনা প্রতিহত হয়েছিল, কিন্তু প্রথম যিহূদী-রোমীয় যুদ্ধে তার সময়ের যিহূদীদের মধ্যে ১০,৫০০ জনকে (যিহূদী ইতিহাসবিদ যোসিফাসের লেখার আরেকটি অনুচ্ছেদ অনুসারে, সংখ্যাটি ছিল ১৮,০০০ জন) হত্যা করা হয়েছিল।

[রোমীয়দের সময়ে যিহূদীদের একটি বড় দল এখানকার পালমিরায় বসবাস করতো, যা সিরিয় মরুভূমি জুড়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথে মরুদ্যান কেন্দ্রিক একটি শহর ছিল। সম্রাট হাড্রিয়ানের রাজত্বকালে নির্মাণ করা চমৎকার স্তম্ভসারিতে সজ্জিত রাস্তা ও বিজয়তোরনের খিলানের ধ্বংসাবশেষ।]

হিসাব করা হয় যে, ওরন্টিস নদীর তীরে অবস্থিত আন্তিয়খিয়া শহরটি, যা সাম্রাজ্যের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম শহর, তাতে ৩০০,০০০ লোকের মধ্যে ১২% ছিল যিহূদী। যাহোক, ১৯৩২ ও ১৯৩৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে যিহূদী সম্প্রদায়ের প্রমাণ হিসেবে কেবল একটি শিলালিপি ও একটি মার্বেল পাথরের খন্ডাংশ পাওয়া যায়। আন্তিয়খিয়ার ৫ মাইল দক্ষিণে দফনির একটি শহরতলীতে প্রত্নতত্ত্ববিদরা একটি রোমীয় নাট্যশালার সন্ধান পান, যা সম্রাট ভেসপাসিয়ান যিহূদী সমাজ-ঘরের জায়গার উপর নির্মাণ করেছিলেন।

তুরস্ক ও গ্রীসের যিহূদীরা

সেলুসিড শাসক ৩য় আন্তিয়খস যখন

রোম সাম্রাজ্য জুড়ে থাকা যিহূদীরা

[পর্গামে জেউস দেবতার বেদি। এটি আনাতোলিয়ার (তুরস্ক) শহরগুলোর একটি, যেখানে যিহূদীরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতো। অন্যান্য ধর্মের সাথে যোগাযোগ থাকলেও যিহূদীরা তাদের নিজেদের বিশ্বাসকে ধরে রেখেছিল।]

২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ২০০০ যিহূদী পরিবারকে মেসোপটেমিয়া থেকে সরিয়ে লূদিয়া ও ফরুগিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তখন আনাতোলিয়াতে (তুরস্ক) যিহূদীদের জন্য প্রথম বৃহত্তম বসতির ব্যবস্থা করেন। তিনি তাদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলেন এবং দশ বছরের জন্য ফসলের উপর করের অব্যাহতি সহ সেখানে জায়গা দিয়েছিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ৬২ শতাব্দীতে এশিয়ার (পশ্চিম তুরস্ক) রোমীয় শাসনকর্তা লুসিয়াস ভ্যালিরিয়াস ফ্লাক্কাস যিরূশালেমে পাঠানোর জন্য যিহূদীদের সংগৃহীত সোনা বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। যখন তাকে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯ শতাব্দীতে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আত্মসাতের দায়ে বিচারে আনা হয়েছিল তখন ঐ সময়কার খ্যাতিমান আইনজীবি হর্টেনসিয়াস ও সিসেরো শাসনকর্তাকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে

রোম সাম্রাজ্য জুড়ে থাকা যিহূদীরা

সিসেরো তার মন্তব্যে বলেছিলেন: ‘আপনারা জানেন যে, তারা কত বড় একটি দল, যারা কিভাবে সর্বসম্মতিক্রমে একত্রে সংঘবদ্ধ রয়েছে এবং তারা রাজনীতিতে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে।’

গ্রীসে প্রেরিত পৌল ম্যাসিডোনিয়ার তিনটি বৃহত্তম যিহূদী শহর– ফিলিপী, থিষলনীকী ও বিরয়াতে যিহূদীদেরকে এবং এথেন্সে একটি ছোট যিহূদী সম্প্রদায়কে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রচারের অধিকাংশ সময় পার করছিলেন করিন্থের সুকৌশলী যিহূদী সম্প্রদায়ের সাথে। ল্যাখিয়ামে করিন্থের একটি সমুদ্রবন্দর ছিল, যা স্থলভাগের পশ্চিম প্রান্তীয় উপকূলবর্তী অঞ্চল কিংক্রিয়াতে নির্মাণ করা হয়েছিল। জাহাজের নাবিকেরা তাদের জাহাজকে ভূখন্ডের উপকূলীয় প্রান্তবর্তী অঞ্চল দিয়ে আড়াআড়িভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করতো, কারণ তারা দক্ষিণ পেলোপনিসাসের পাশ দিয়ে জাহাজ চালিয়ে সমুদ্রযাত্রায় বিপদের ঝুঁকি নিতে চাইতো না।

১৮৯৮ সালে আগোরাতে একটি শিলালিপির খন্ডাংশ পাওয়া যায় (করিন্থীয় শহরের কেন্দ্রস্থলে), যা একটি ‘যিহূদী সমাজ-ঘর’কে নির্দেশ করে। এটি সম্ভবত পরবর্তীতে তৈরি করা ভবনেরই অংশ, যেটি সেই সমাজ-ঘরের উপর দাঁড়িয়ে আছে যেখানে প্রেরিত পৌল প্রচার করেছিলেন।

[মেসোপটেমিয়ায় প্রবাহমান ইউফ্রেটিস নদী।]

মেসোপটেমিয়ার যিহূদীরা

বাবিলের নির্বাসন শেষে অনেক যিহূদী সরুব্বাবিল অথবা ইষ্রার সাথে ইস্রায়েল দেশে ফিরে আসতে সক্ষম হয়নি। তাই মেসোপটেমিয়ার যিহূদী সম্প্রদায়ের শিকড় খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ফিরে যায়। দুর্ভাগ্যবশত প্রায় ২২০ খ্রীষ্টাব্দের আগ পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটিতে যিহূদী ধর্মমতের ক্রমবিকাশ বিষয়ক তথ্য-প্রমাণ খুবই কম পাওয়া যায়। কিন্তু জানা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০ শতাব্দীতে পার্থীয়রা ঐ অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল বলে মেসোপটেমিয়ার যিহূদী সম্প্রদায় তাদের অধীন হয়ে পড়ে। কিছু লেখক প্রস্তাব করেছিলেন যে, যিহূদী ধর্ম ঐ সময়কার পারসিক ধর্মমত, জোরোয়াস্ট্রিয়ান ধর্ম-বিশ্বাস দ্বারা অনেকভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল– তবে এই মতের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। মেসোপটেমিয়ার যিহূদীরা মন্দিরের জন্য তাদের বার্ষিক উপহার দক্ষিণে নিহারদিয়াতে ও উত্তরে নিসিবিসে একত্রে সংগ্রহ করে এবং সশস্ত্র নিরাপত্তা সহকারে যিরূশালেমে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

দুর্বল পার্থীয় রাজা, ১ম আর্তাবানুসের সময়, নিহারদিয়ায় অ্যাসিনিয়াস ও অ্যানিলায়েস বলে ডাকা হতো এমন দুই যিহূদী ভাই তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে একটি আংশিক-স্বাধীন যিহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছিলেন, যা প্রায় পনের বছর স্থায়ী হয়েছিল। আর এই রাষ্ট্রের পতন ঘটাতে গিয়ে ৫০,০০০ যিহূদীকে হত্যা করা হয়েছিল।

পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলবর্তী ক্যারেক্স-স্পেসিনুতে একজন যিহূদী ব্যবসায়ী আদিয়াবেনির রাজপুত্র ইজাটেসকে (প্রাচীন আসিরিয়া) যিহূদী ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিলেন এবং তার মা, হেলেনাও একই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন– তারা যিরূশালেমে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। ৪৬-৪৮ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময়, রাণী হেলেনা মিশর থেকে খাদ্য-শস্য এবং সাইপ্রাস থেকে ডুমুর কিনে যিরূশালেমের লোকদেরকে সরবরাহ করেছিলেন। যিরূশালেমের চমৎকার একটি কবরে তাকে সমাহিত করা হয়েছিল এবং এর মুখ গড়ানো পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, যা এখনো দৃশ্যমান।

পারস্যের আরও পূর্বদিকের অন্যান্য যিহূদীদের বিষয়ে খুব কমই জানা যায়।

ইতালির যিহূদীরা

খ্রীষ্টপূর্ব ১৬১ শতাব্দীতে যখন যিহূদা ম্যাক্কাবীয় রোমের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন, তখন যিহূদীদের সাথে রোমীয়দের প্রথম আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ঘটে। খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৯ শতাব্দীতে বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণকারীকে রোমের জ্যোতিষীদের দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল। এছাড়া, 'জুপিটার সাবাজিয়াসের উপাসনায় রোমীয়দের নৈতিকতাকে ধ্বংস করার চেষ্টা যেসব যিহূদীরা চালিয়েছিল', তাদেরও তাদের কাছ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। যেহেতু সাবাজিয়াস ছিল ফরুগিয় দেবতার নাম, তাই এটি যিহূদীদের 'যিহোবা সাবায়োথ' (বাহিনীগণের সদাপ্রভু) এর প্রতি একটি বিভ্রান্তিকর উদ্ধৃতি হতে পারে।

[রোমের কলোসিয়াম। প্রথম খ্রীষ্টাব্দে যখন এটি নির্মাণ করা হয়েছিল, তখন রোমের পুরো লোকসংখ্যার ৪% ছিল যিহূদী।]

রোম সাম্রাজ্য জুড়ে থাকা যিহূদীরা

খ্রীষ্টপূর্ব ৬১ শতাব্দীতে পম্পেকে যিহূদী বন্দিদেরকে তার সাথে রোমে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। ফাইলোর মতে, তাদেরকে পরবর্তীতে মুক্ত করে দেয়া হয় এবং তারা রোমের যিহূদী সম্প্রদায়ের মধ্যমণি হয়ে উঠেছিল। যাহোক, হয়তো ঘটনাটি একটি নয়, খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯ শতাব্দীতে সিসেরো লিখেছিলেন যে, যিহূদীরা ইতিমধ্যেই সংখ্যায় অগণিত ও প্রভাবশীল ছিল।

[পাগলাটে সম্রাট গাইয়াস ক্যালিগুলা, যিনি নিজেকে দেবতা বলে দাবী করেছিলেন।]

পম্পে ও জুলিয়াস সিজারের (যুলিয় কৈসর) মধ্যকার গৃহযুদ্ধের সময় যিহূদীরা সিজারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। আর ‘স্বীকৃত ধর্ম’ হিসেবে তিনি যিহূদীদের বিশেষ সুবিধা দিয়েছিলেন। সৈনিকদের কর্মকান্ডে অংশ-গ্রহণ থেকে তাদেরকে বিরত রাখা হয়েছিল। যিহূদীদের মধ্যকার বিবাদকে তাদের নিজস্ব আদালতে মিটানোর অনুমোদন দেয়া হয়েছিল, বিশ্রামবারে তাদের কাছে কোন শস্য বন্টন করা হতো না। তাদেরকে এক শেকেলের অর্ধেক (অথবা, দুই দিনারি) চাঁদা যিরূশালেমে পাঠানোর অনুমতি দেয়া হয়েছিল। যখন রোমীয়রা সম্রাটকে পূজা করার প্রথাকে প্রবর্তন করেছিলেন, তখন যিহূদীদেরকে এই রীতি থেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছিল বটে, তবে তাদেরকে সম্রাটের জন্য প্রার্থনা করতে হতো।

এটি হিসাব করা হয়ে থাকে যে, ১ম খ্রীষ্টাব্দে রোমের এক লাখ লোকের মধ্যে ৪০,০০০ - ৬০,০০০ জনই ছিল যিহূদী। খ্রীষ্টপূর্ব ৪ শতাব্দীতে রাজা হেরোদের মৃত্যুর পরে, প্রায় ৮,০০০ যিহূদী রোমে ছিল, যারা আর্খিলায়কে উত্তরাধিকার হিসেবে মনোনয়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

১৯ খ্রীষ্টাব্দে চার জন যিহূদী প্রবঞ্চক একজন ধর্মান্তরিত যিহূদী ধনী স্ত্রীলোককে বোকা বানিয়ে মন্দিরের জন্য দেওয়া তার অর্থ নিয়ে গিয়ে কেলেঙ্কারী সৃষ্টি করেছিল। আর

এর পরিণতি হিসেবে সম্রাট তিবিরিয় ৪,০০০ জন যিহূদী দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া লোককে খুবই জঘণ্য ও অস্বাস্থ্যকর দ্বীপ হিসেবে খ্যাত সার্দিনিয়াতে কষ্টকর কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন। পাগলাটে সম্রাট গাইয়াস ক্যালিগুলা (রাজত্বকাল: ৩৭-৪১ খ্রীষ্টাব্দ) তার বন্ধু রাজা ১ম আগ্রিপ্পের অনুরোধকে উপক্ষো করে যিরূশালেমের মন্দিরে তার মূর্তি স্থাপনের প্রস্তাব করার মাধ্যমে যিহূদীদেরকে শঙ্কিত করে দিয়েছিলেন। তবে এই পরিকল্পনা সিরিয় শাসনকর্তা পেট্রোনিয়াসের অনিচ্ছার কারণে কার্যকর করতে দেড়ি হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত সম্রাটের গুপ্ত হত্যা এই উদ্যোগকে পুরোপুরি ব্যর্থ করে দিয়েছিল।

যিহূদী ও খ্রীষ্টিয়ান

প্রথম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা ছিল যিহূদী কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল যে, যীশুই হলেন সেই মশীহ, যাঁর জন্য যিহূদী জাতি অপেক্ষা করে আছে। আর এই বিষয়ে পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে তারা এই বার্তাকে ইস্রায়েল দেশের যিহূদীদের কাছে এবং রোমীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে প্রচার করেছিল।

যখন নির্যাতনের মাধ্যমে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে যিরূশালেম থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল, তখন স্তিফান ঐ পরিস্থিতির শিকার হয়ে খ্রীষ্ট বিরোধীদের হাতে প্রাণ হারিয়ে ছিলেন। কিন্তু তারা তাদের সুখবরের বার্তাকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল। তাই যিহূদী হিসেবে যাদের কোন অতীত পরিচিতি ছিল না, এমন লোকেরা খুব দ্রুত মণ্ডলীর সদস্য হতে শুরু করে। প্রাথমিক যে জায়গাগুলোতে এমন ঘটনা ঘটেছিল সেগুলোর মধ্যে আন্তিয়খিয়া অন্যতম এবং এটি ছিল সাম্রাজ্যের তৃতীয় বৃহত্তম শহর।

[যিহূদীদের যিরূশালেমে ধীরে ধীরে যে সব চার্চ গড়ে উঠেছিল, এটি তেমনি একটি প্রাচীন চার্চ।]

প্রভু যীশুর শিষ্য পিতর যাফোতে

রোম সাম্রাজ্য জুড়ে থাকা যিহূদীরা

অযিহূদী রোমীয় শতপতি কর্ণীলিয়কে যখন বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সুখবরের এই বার্তা কেবল যিহূদীদের জন্য নয়, বরং সবার জন্য (প্রেরিত ১০ অধ্যায়)। আর এই কথা পিতর যখন যিরূশালেমে ফিরে মণ্ডলীকে জানিয়েছিলেন, তখন তারা যিহূদী ও অযিহূদী– উভয়কেই গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন।

ঐ সময় প্রেরিত পৌল ও তাঁর সঙ্গী বার্ণবা যখন বহুসংখ্যক অযিহূদী লোককে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসে দীক্ষিত করার পরে এশিয়া-মাইনর অঞ্চলে তাঁদের প্রচারযাত্রা শেষ করে যিরূশালেমে ফিরে এসেছিলেন, তখন যিহূদী ধর্ম থেকে আসা কিছু খ্রীষ্টিয়ান আতঙ্কিত হয়েছিল। কারণ তারা বিশ্বাস করতো যে, খ্রীষ্ট-ধর্মের শিকড় যিহূদী ধর্মের মধ্যে নিহিত থাকায় অযিহূদী থেকে আসা খ্রীষ্টিয়ানদেরকে যিহূদীদের জন্য নির্ধারিত আইন-কানুনকে পালন করতে হবে। প্রায় ৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য যিরূশালেমে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল (প্রেরিত ১৫:১-২১)। প্রেরিত পৌল খুব জোরালোভাবে তাঁর মতের স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বলেন যে, যা কিছু যিহূদীদের পক্ষে অসম্ভব তা অযিহূদীদের করা উচিত নয়, কারণ যিহূদী আইন-কানুন পালনের মাধ্যমে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, কেবল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। তাই এই আলোচনা সভায় অযিহূদী থেকে আসা খ্রীষ্টিয়ানদেরকে কেবল যিহূদীদের নিষিদ্ধ কিছু খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকার এবং নৈতিক নীতিমালা ও নিয়মাবলী পালনের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছিল। এরপর থেকে মণ্ডলীতে যিহূদী ও অযিহূদীদের মাঝে আর কোন জাতিগত বাধা দেখা যায়নি।

প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণের পর, কিছু বছর ধরে যিহূদী থেকে আসা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা বিশ্রামবারে (শনিবার) সমাজ-ঘরে উপাসনা করতেন এবং রবিবারে খ্রীষ্টের মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার দিন হিসেবে একত্রে সভায় বসতেন। প্রেরিত পৌল যখন কোন নতুন শহরে যেতেন, তখন তিনি প্রায়ই সমাজ-ঘরকে তাঁর প্রচারের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতেন। যিহূদীদের মত খ্রীষ্টিয়ানরাও পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোও পাঠ করা এবং সেখান থেকে উদ্ধৃত করা অব্যহত রেখেছিল।

তবে অনেক যিহূদীরাই খ্রীষ্টিয়ানদেরকে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী হিসেবে যিহূদী ধর্মের প্রতি একটি হুমকি বলে মনে করতো। রাজা ১ম হেরোদ আগ্রিপ্প যিহূদীদেরকে খুশী করতে চেয়েছিলেন বলে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে অত্যাচার করার উদাহরণ তুলে ধরতে শিষ্য যাকোবকে হত্যা করেছিলেন ও পিতরকে কারাগারে বন্দী করেছিলেন। প্রেরিত পৌলকে বিভিন্ন জায়গাতে আক্রমণ করা হয়েছিল– এর মধ্যে লুস্ত্রা ও

থিষলনীকী অন্যতম– সেখানে যিহূদীরা তাঁকে আক্রমণ করেছিল, কারণ তিনি কতজন লোককে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করছিলেন তা তারা জানত। রোমীয়রা খ্রীষ্টিয়ানদেরকে যিহূদীদের একটি উপদল হিসেবে মনে করতো এবং যিহূদী ও খ্রীষ্টিয়ানদের বিরোধে জনগণের শান্তি বিঘ্নিত হলেই কেবল তখন তারা মধ্যস্ততা করতো। ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আগুনে রোমের অনেক ক্ষয়-ক্ষতির জন্য যখন নিরো খ্রীষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন, তখনই কেবল তারা এটিকে নতুন ধর্ম হিসেবে উদ্ভূত হওয়ার কথা স্বীকার করেছিলেন।

৬৬-৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম যিহূদী যুদ্ধের সময় যিরূশালেমের খ্রীষ্টিয়ানরা শহরটির প্রায় ৬০ মাইল উত্তর-পশ্চিমের পেল্লায় পালিয়ে গিয়েছিল। কারণ তারা রোমীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল। ফলে তারা যিহূদীদের কাছে আরও বেশি ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠেছিল। প্রায় ৯০ খ্রীষ্টাব্দে যামনিয়াতে একটি নতুন যিহূদী শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয় এবং যিহূদী ধর্মবিষয়ক নতুন নিয়ম-কানুনকে এই শিক্ষাক্রমের অংশীভূত করা হয়। খ্রীষ্টিয়ানদেরকে সমাজ-ঘরে উপাসনা করতে নিষেধ করা হয় এবং প্রার্থনায় তাদেরকে অভিশাপও দেয়া হয়। আর এভাবে খ্রীষ্টধর্ম ও যিহূদী ধর্মমত পুরোপুরিভাবে পৃথক হয়ে যায়।

[জর্ডানের পেল্লা]

রোম সাম্রাজ্য জুড়ে থাকা যিহূদীরা

[রোমের যিহূদী এলাকা (যিহূদী ঘেটো), যেখানে তারা একটি সমাজ হিসাবে বাস করতো।]

পৌরাণিক কাহিনী ও কাল্ট জাতীয় ধর্ম-বিশ্বাস

গ্রীক সংস্কৃতির প্রচলন থাকাকালীন সময় (হেলেনিস্টিক পিরিয়ড), খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে ঐ সময়কার অধিকাংশ লোকদের মধ্যে মানব আকৃর্তিতে উপস্থাপিত গ্রীক দেব-দেবী জেউস ও হেরার প্রতি তেমন আর কোন সরল বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু প্রথম খ্রীষ্টিয় শতাব্দীর শেষের দিকে, লুস্ত্রার (আধুনিক তুরস্কে ভৌগলিক অঞ্চল) গ্রাম্য অঞ্চলের কৃষকেরা তখনও প্রেরিত পৌল ও বার্ণবাকে জেউস ও হার্মেসের মানবিক রূপ ভেবে ভুল করতে থাকে। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক দর্শনের উন্নয়নের সাথে সাথে গ্রীক মণীষীরা পৌরাণিক কাহিনীকে রূপক কাহিনী বলে মনে করতে শুরু করেন। এই বিষয়ে চিন্তাবিদ জেনোফেনস অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন যে, কেবল একজন মাত্র দেবতা রয়েছেন যিনি মানুষের মত নন।

আধুনিক মন যে যুক্তিবাদের প্রশংসা করে তার সাথে গ্রীকদের মধ্যে সব সময় অযুক্তিবাদেরও অনেক উপাদান ছিল। দর্শন ও যুক্তিবাদের পাশাপাশি অবস্থানের সমন্বয়ে অনেক অতীন্দ্রিবাদী ধর্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল যেগুলো অনিয়ন্ত্রিত আবেগ ডেকে নিয়ে এসেছিল।

[অলিম্পিয়ান জেউসের মন্দির]

গ্রীক ধর্ম-বিশ্বাস

প্রথম রহস্যময় ধর্মানুষ্ঠান

গ্রীকদের সবচেয়ে প্রাচীনতম ধর্মানুষ্ঠানটি এথেন্স শহর থেকে বারো মাইল পশ্চিমের ইলিউসিসে উদ্‌যাপন করা হয়েছিল। ফসল, শস্য ও জমির উর্বরতা বিষয়ক প্রাচীন অলিম্পিয়ান গ্রীক দেবী ডিমেতারের মেয়ে পার্সিফোনিকে কেন্দ্র করে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি আবর্তিত হয়েছিল, যাকে পাতালের রাজ-দেবতা হেডিস অপহরণ করে নিয়েছিল এবং তাকে প্রতি বছর চার মাস ধরে পাতালে কাটাতে হয়েছিল। আর এই ধর্মানুষ্ঠানে যারা দীক্ষা নিতে চায় তাদেরকে গ্রীক ভাষাভাষী হতে হত এবং তাদের কারও হত্যা করার দোষে দোষী হওয়া যেত না।

বৃহত্তম অনুষ্ঠানটি শুরু হয়েছিল সেপ্টেম্বর মাসে। দীক্ষিত হিসেবে এই ধর্মানুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা প্রথমে সমুদ্রে স্নান করে এবং এরপর একটি মেয়ে কুকুর উৎসর্গ করা হয়। তারপর তারা ভাজা যব থেকে তৈরি মত্তদায়ক ‘কাইকিয়োন’ নামের পানীয়

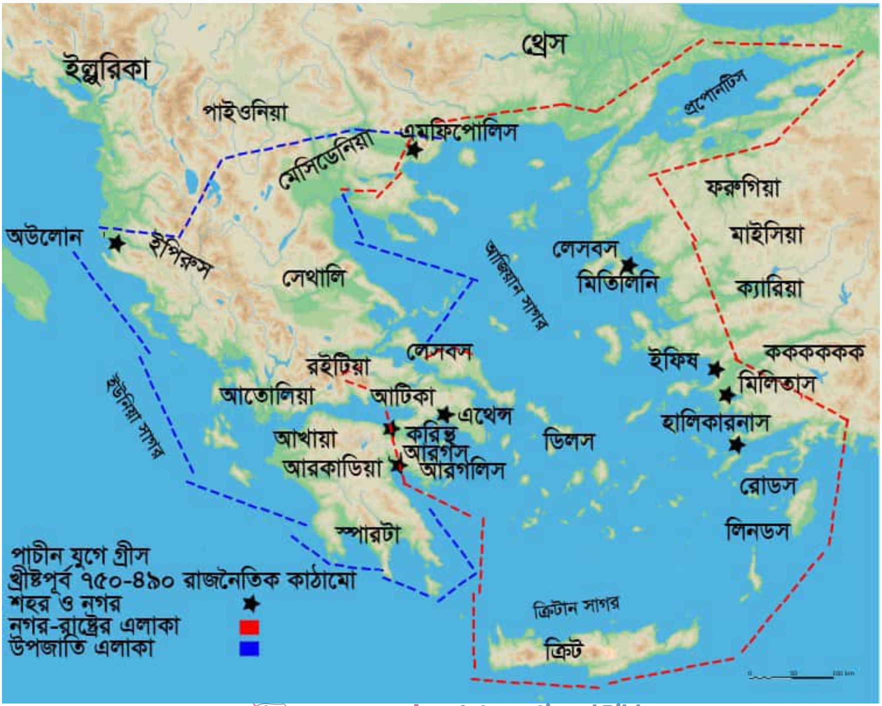

পান করে মিছিল সহকারে পবিত্র পথ ধরে ইউলিসিসে যেত। আর এভাবে এই উৎসবের চরম পরিণতিকে মিছিলের মধ্য দিয়ে ইলিউসিসে নিয়ে আসা হত। আর যখন অন্ধকার হয়ে আসত, তখন দীক্ষিত ব্যক্তিদেরকে ১৭০ ফুট বর্গাকার একটি ভবন দেখানো হত, যাকে 'টেলিস্টেরিয়ন' বলা হতো। যেখানে দীক্ষিতদের দলনেতা তাদেরকে এমন কিছু দেখিয়ে থাকত, যা সম্ভবত আলো ও ধোয়ার মধ্যে শস্যের শিষ হিসেবে প্রতিফলিত হত।

যেহেতু সম্রাট আগস্ত, হাড্রিয়ান, মার্কাস ও অরেলিয়াস সহ অন্যান্য সম্রাটেরা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ছিলেন, তাই ইলিউসিনীয় আচার-অনুষ্ঠানকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। ইলিউসিনীয় ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার বিভিন্ন দিকগুলো ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পালন করা অব্যাহত থাকে, যখন বার্বারিয়ান অ্যালারিকরা গ্রীস আক্রমণ করে।

ইলিউসিস ছাড়াও প্রাচীনতম গ্রীক রহস্যময় ধর্মমতটি হচ্ছে সামোথ্রেসের 'কাবেইরি'। এই সামোথ্রেস হচ্ছে তুরস্কের উত্তর-পশ্চিম উপকূলীয় একটি দ্বীপ। আর এই কাবেইরি ছিল আগ্নেয়গিরি বিষয়ক দেবতা। এখানকার দীক্ষিতেরা রাতে মিলিত হত। মাথায় মুকুট দিয়ে ও হাতে জ্বলন্ত প্রদীপ ধরে তারা কিছু রহস্যময় দৃশ্য দেখতে পেত। তাদেরকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া হত, বিশেষ করে জাহাজ ডুবি থেকে।

[গ্রীসের ইলিউসিসে নির্মাণ-ভূমি, পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে যেখানে হেডিস পার্সিফোনিকে বছরের চার মাস সময় পাতালে নিয়ে রাখা হত।]

খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে উদ্ভূত হওয়া এই কাবেইরীয় রহস্যময় ধর্মমতটি গ্রীক সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারের যুগে 'থ্রাসিয়ান ও ম্যাসিডোনীয়দের' মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এমনই একটি অনুষ্ঠানে গ্রীক সম্রাট আলেক্জান্ডারের বাবা ফিলিপ ও মা অলিম্পিয়াসের প্রথম দেখা হয়েছিল। রোমীয় শাসনকর্তা থেকে দাস পর্যন্ত সব শ্রেণীর লোকেরা এই ধর্মমতটিকে গ্রহণ করতে পারত। সামোথ্রেসে অবস্থিত কাবেইরীয় উপাসনালয়টি প্রায় ২০০ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যায় এবং এর পর এই ধর্মমতের পতন ঘটে।

ডায়োনাইসাসের গুপ্ত ধর্মানুষ্ঠান

রোমীয়রা ডায়োনাইসাস দেবতাকে ব্যাকাস (আসবদেবতা) বলতো। উদ্ভিদজগতের দেবতা বলা হলেও, তিনি দ্রাক্ষারসের দেবতা বলেই বেশি পরিচিত ছিলেন। গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, তিনি জেউস ও সেমিলিয়ের এক জন পুত্র সন্তান। কিন্তু তার জন্মের পরই তাকে টাইটান নামের দানব গোষ্ঠীর সদস্যরা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল, তাই তাকে দ্বিতীয়বার জন্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল। পরবর্তী ঐতিহ্যগত কাহিনী অনুসারে, তিনি অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে মিশর ও ভারত পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিলেন। যে লোকেরা তাকে বাধা দিত– তারা হয় পাগল হয়ে

[গ্রীক সাম্রাজ্য: লাল রেখাটি ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট আলেক্জান্ডারের মৃত্যুর পূর্বে গ্রীক সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিকে নির্দেশ করছে। মৃত্যুর পরে তার সামরিক কর্মকর্তারা সাম্রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য যুদ্ধ করেছিল। টলেমী ও তার উত্তরাধিকারীরা ১৯৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পর্যন্ত মিশর ও যিহূদিয়া, শমরীয়া ও পলেষ্টিয় অঞ্চল শাসন করেছিলেন। সেলুলিকাস বাবিলে একটি রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেট ছিল সম্রাট আলেক্জান্ডারের সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ এবং (২৮১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পরে) এশিয়া-মাইনর। আর ২৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ম্যাসিডোনিয়া অ্যান্ডিগোনিড রাজ-বংশের প্রথম রাজা অ্যান্টিগোনাস গোনাতাসের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।]

যেতো, অথবা তাদের আত্মীয়-স্বজনরা তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ফেলতো– এটি হলো সেই নিয়তি, যা ইউরিপিডিসের নাটক ‘দ্যা ব্যাকী’তে প্রাণবন্তভাবে বর্ণিত রয়েছে।

প্রাথমিকভাবে ডায়োনাইসাসের অনুসারীরা ছিল স্ত্রীলোক এবং এরা ‘মাইনাডস’ অথবা ‘পাগল’ বলে পরিচিত ছিল। দ্রাক্ষারস পান করার পরে উন্মত্ত হয়ে তারা পরম আনন্দে নাচতে শুরু করতো এবং সাপ নিয়ে খেলা করতো। আর উন্মত্ততার চরম পরিণতি হিসেবে তারা একটি জীবিত প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে একে একে টেনে ছিঁড়ে ফেলত। আরনোবিয়াস নামের একজন খ্রীষ্টিয়ান লেখক এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে লিখেছিলেন: ‘নিজেকে দেবতার ঐশ্বরিক ও মহিমায় পরিপূর্ণ দেখাতে তুমি রক্তাক্ত মুখে ঐসব ছাগলগুলোর নাড়ী-ভুড়ি ছিন্নভিন্ন করে থাক, যেগুলো করুণার জন্য চিৎকার করছিল!’

ডায়োনাইসাসের সম্মানে নাটকীয় উৎসবগুলো এথেন্সের এক্রোপলিসের পাথুরে ঢালগুলোয় প্রথম অনুষ্ঠিত (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪৬-৫২৭) হয়েছিল। বিয়োগান্ত নাটক (‘ট্রাগইডই’ অথবা ‘ছাগলের গান’) ও প্রহসনমূলক নাটক (‘কমইডই’ অথবা ‘পল্লী গান’)– উভয়ই ডায়োনাইসাসের ধর্মানুষ্ঠান পালন থেকে সৃষ্টি হয়েছিল।

ইতালিতে ব্যাকাসের পরিচয়ের (খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০-৪৫০) সবচেয়ে প্রাথমিক প্রমাণটি পাওয়া যায় কুমায়ের একটি সমাধিক্ষেত্রে, যেটি এই ধর্মমতে দীক্ষিতদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীর শুরুতে ব্যাকাস আন্দোলন খুবই তীব্র হয়ে ওঠে। ১৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সিনেট এই আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ৭,০০০ জনকে গ্রেফতার করেছিল এবং অধিকাংশকে কথিত অভিযোগের দায়ে হত্যা করা হয়েছিল। আর এই বিষয়ে একটি প্রত্যাদেশ জারী করা হয়েছিল, যার দ্বারা ধর্মগোষ্ঠীর সদস্যদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো এবং পাঁচ জনের বেশি লোককে একত্রে অবস্থান করাকে সীমাবদ্ধ রাখা হতো– তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সিনেটের অনুমতি সাপেক্ষে আরোপিত প্রত্যাদেশের লোকদেরকে বিষয়ে ছাড় দেয়া হতো।

এই ধরণের নির্যাতন সত্ত্বেও ব্যাকাসের উপাসনা টিকে ছিল। এই ধর্মগোষ্ঠীর উপর প্রাণবন্ত দেয়াল চিত্র অঙ্কিত রয়েছে পম্পের ‘রহস্যের উদ্যানবাটি’ (The Villa of Mysteries)। চিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে এই ধর্মমতে দীক্ষিত স্ত্রীলোকদের তুলে ধরা হয়েছে যারা রহস্যময় কোন বস্তুকে দেখছে– সম্ভবত একটি সমুত্তেজিত পুরুষ লিঙ্গের প্রতীক এবং তাতে প্রথাগত রীতি অনুযায়ী চাবুক মারা হচ্ছিল।

চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে ফার্মিকাস ম্যাটারনাস নামে একজন লেখক একটি বিবৃর্তি উপস্থাপন করে বলেন যে, ক্রীতীয়রা এখনো ‘তাদের দাঁত দিয়ে জীবিত ষাড়কে কামড়ে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে এবং আত্মিক উন্মত্ততার ভান করে বনের গোপন জায়গাতে অসঙ্গত কোলাহল সহকারে চিৎকার করে।’

অসাধারণ এই ধর্মগোষ্ঠী আমাদের ইংরেজী ভাষায় বেশ কিছু সংখ্যক শব্দ নিয়ে এসেছে এবং অন্তর্ভুক্ত শব্দগুলো হলোঃ ‘ecstasy’ (এসেছে *ekstasis* থেকে, যার অর্থ ‘নিজের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা’); ‘enthusiasm’ (এসেছে *entheos* থেকে, যার অর্থ ‘ভিতরে বসবাসকারী দেবতা’); ‘orgies’ (এসেছে *orgia* থেকে, যার অর্থ ‘আচার-অনুষ্ঠান/ আচার-ব্যবহার’) এবং ‘triumph’ (এসেছে গ্রীক *thriambos* থেকে, যার অর্থ ‘ব্যাকাসের প্রশংসা-গান’)।

অর্ফিয়াস ও তার ধর্মগোষ্ঠী

ডায়োনাইসাসের সম্প্রসারিত পৌরাণিক কাহিনীর সাথে পৌরাণিক সঙ্গীতজ্ঞ অর্ফিয়াসের উপর নির্ভর করে একটি পৃথক ধর্ম সৃষ্টি হয়েছিল, যাকে অর্ফিয়াসবাদ বলা হয়। অর্ফিক লেখা অনুসারে, টাইটানরা ডায়োনাইসাসকে হত্যা করে এক মাত্র হৃদপিন্ড বাদে তার দেহের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খেয়ে ফেলেছিল। আর তার এই

[অর্ফিয়াস এই পশু-পাখিদের উদ্দেশ্যে তার বীণা বাজাচ্ছেন। তার্ষ শহরে তৃতীয় শতাব্দীর রঙিন পাথরের উপর তৈরি এই শিল্পকর্মটিকে পাওয়া।]

হৃদপিন্ডকে নিয়ে গ্রীক দেবতাদের রাজা জেউস এক নতুন ডায়োনাইসাসকে তৈরি করেন এবং টাইটানদেরকে হত্যা করেন। মৃত টাইটান পুরুষদের ছাই থেকে দ্বৈত সত্ত্বার এক প্রাণী তৈরি হয়েছিল– কারণ টাইটানদের কাছ থেকে আসা তাদের শরীর ছিল মন্দ এবং ডায়োনাইসাসের কাছ থেকে আসা আত্মাগুলো ছিল ভাল। আর পুনর্জন্মের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য, অর্ফিকদেরকে শোধন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল– তাদেরকে মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকতে এবং আচার-ব্যবহারকে খুবই যত্ন সহকারে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ৭ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে অর্ফিয়াসবাদ গ্রীককরণের (Hellenistic) যুগে ও রোমীয়দের যুগে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ক্রীট দ্বীপ ও দক্ষিণ ইতালীর কবরে স্বর্ণের পাতা পাওয়া গিয়েছে, যেগুলো সম্ভবতঃ অর্ফিকদের। থুরি (Thurii) থেকে পাওয়া স্বর্ণের এই পাতাগুলোর একটিতে লেখা রয়েছেঃ ‘বিশুদ্ধ, আমি এখানে বিশুদ্ধদের কাছ থেকেই এসেছি। হে, হেডিসের স্বর্গীয় গৃহকর্ত্রী... সৌভাগ্যের কারণে আমি বোঝার মত যত্নের বেড়াজাল থেকে পালিয়ে এসেছি।’

অলিম্পিয়ান দেবতারা

অনেক গ্রীক দেবতাদের নাম খুবই সুপরিচিত। আর এই সব দেবতাদেরকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছিল অনেক পৌরাণিক ও লোক কাহিনী এবং দেবতা ও মানুষের মধ্যে

[এথেন্সের পার্থানন মন্দির– যেটি শহরের রক্ষাকারী দেবী অ্যাথিনা পার্থিনোসের সম্মানে নির্মাণ করা হয়েছিল।]

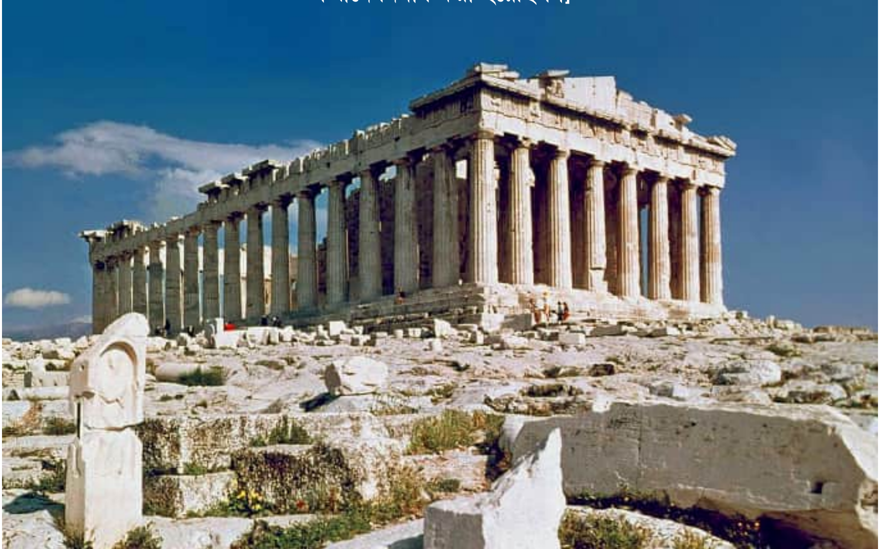

তাদের বীরত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের মাঝে সৃষ্ট ষড়যন্ত্রই এই কাহিনীগুলোর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এখানে কিছু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দেবতাদের বিষয় তুলে ধরা হলো:

অ্যাফ্রোডাইট

ইনি হলেন ভালবাসা ও সৌন্দর্যের দেবী। তিনি সম্ভবত এশীয় ভালবাসার দেবী– ইশতার ও অ্যাস্তার্তে'র সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি যখন হাঁটতেন তখন তাকে দেখে ফুলগুলো লাফিয়ে উঠতো এবং পাখিরা তার চারপাশে উড়ে বেড়াতো। তিনি এমনকি খুবই জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকেও বিভ্রান্ত করতে পারতেন। স্বামী অ্যারেসকে তিনি বেশ কিছু সন্তান উপহার দিয়েছিলেন– তাদের মধ্যে 'ভয়' ও 'আতঙ্ক' অন্যতম।

[অ্যাফ্রোডাইট]

আপল্লো

আপল্লো ছিলেন অলিম্পিয়ান গ্রীক দেবতাদের রাজা জেউসের ছেলে। তিনি ছিলেন আলো, সত্য, সঙ্গীত ও ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক দেবতা। তিনি অজগর সাপকে মেরে ফেলেছিলেন বলে প্যানের কাছ থেকে ভবিষ্যদ্বাণীর করার বর পেয়ে ডেলফিতে সেই দৈববাণীকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এখানে উপদেশের জন্য কেউ আসলে তাকে যে উপদেশ দেয়া হতো তা দুর্বোধ্য ছিল।

[আপল্লো]

আর্তেমিস

যেসব স্ত্রীলোকেরা নিরাপদ সন্তান প্রসবের জন্য প্রার্থনা করতো তাদের অনেকের কাছে আর্তেমিস খুবই জনপ্রিয় একজন দেবী ছিলেন। তিনি ছিলেন চাঁদের দেবী এবং আপল্লোর যমজ বোনদের একজন, যাকে হোমারের ইলিয়ড মহাকাব্যে আর্তেমিসকে উপস্থাপন করা হয়েছে একজন শিকারী হিসেবে। ইফিষে উর্বরতা বিষয়ক এশীয় দেবী আর্তেমিসকে পূজা করা হতো রোমীয় ডায়ানা হিসেবে।

[আর্তেমিস]

দিমেতার

ইনি ছিলেন খাদ্য-শস্য ও ফল-মূলের দেবী, যার উপর গ্রিসের অস্তিত্ব নির্ভর করতো। পার্সিফোনের মা হিসেবে তাকে হেডিস পাতালে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এই দুঃখের কারণে তিনি দুর্ভিক্ষ নিয়ে

[দিমেতার]

এসেছিলেন।

জেউস

তিনি ছিলেন দেবতাদের বসবাসের জায়গা মাউন্ট অম্পিয়াসের শাসনকর্তা। সাইক্লোপস, দানব ও টাইটানদের সহায়তায় তিনি তার বাবা ক্রোনাসকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসেন। তিনি ছিলেন পৃথিবীর জলবায়ুর দেবতা এবং তার দ্বারা মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হতো।

[দেবতা জেউস ও দেবী হেরা]

হেরা

হেরা ছিলেন অলিম্পিয়ান গ্রীক দেবতাদের রাজা জেউসের স্ত্রী এবং বিয়ে ও পারিবারিক বিষয়ের দেবী। তিনি ছিলেন ভয়ঙ্কর এক চরিত্র, যাকে আর্গনটদের পৌরাণিক কাহিনীতে যাসোনের বন্ধু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল।

হেফায়স্টোস

হেফায়স্টোস ছিলেন আগুন ও কারিগরী বিদ্যার দেবতা। তিনি দেবতা ও মানুষ উভয়ের জন্য যাদুর জিনিস তৈরি করতেন। সন্তান হিসবে বাবা-মা জেউস ও হেরা তাকে অবজ্ঞা করতেন। তবে তার তৈরি মনোরম গহণা দিয়ে তিনি তার মায়ের স্নেহ লাভে সক্ষম হতেন।

[হেফায়স্টোস]

পসেইডন

পসেইডন ছিলেন অলিম্পিয়ান গ্রীক দেবতাদের রাজা জেউসের ভাই। তিনি ছিলেন সমুদ্র ও ভূমিকম্পের দেবতা। তিনি মানবজাতিকে ঘোড়া উপহার দিয়েছিলেন, যা তাদেরকে খাবার, পোশাক ও সর্বপরি যানবাহন সুবিধা দিয়েছিল। সমুদ্রে নাবিকদের সুরক্ষার জন্য গ্রীকেরা তার কাছে প্রার্থনা করতেন।

[পসেইডন]

পৌরাণিক কাহিনী ও কাল্ট জাতীয় ধর্ম-বিশ্বাস

[গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর পুরুষ ও স্ত্রীলোক, যারা পুরোহিত হিসাবে কর্তব্য পালন করছেন।]

গ্রীক দর্শন

পিথাগোরাসের মতবাদ

বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রকৃতি নিয়ে চিন্তাবিদদের চিন্তা-ভাবনা থেকেই খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক দর্শন শুরু হয়, যারা বর্তমান সময়ে প্রাক-সক্রেটিস নামে পরিচিত। আর থেইলস, হেরাক্লিটাস ও এনাক্সাগোরাসের মত প্রাথমিক পর্যায়ের এই সব দার্শনিকগণ পশ্চিম তুরস্কের গ্রীক উপনিবেশ আয়োনিয়া থেকে এসেছিলেন।

এই দার্শনিকরা অনুমান করেছিলেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাকৃতিকভাবেই চিরন্তন কোন পদার্থ অথবা এই জাতীয় পদার্থের, উদাহরণস্বরূপ– জল, বাতাস ও আগুনের সংমিশ্রণের ফলে উদ্ভূত হয়েছিল। হেরাক্লিটাসের মত কিছু সংখ্যক দার্শনিকরা ভেবেছিলেন যে, মৌলিক বাস্তবতাটি ছিল পরিবর্তন। তিনি বলেছিলেন, ‘আপনি একই নদীতে দুই বার নামতে পারেন না।’ অন্যরা এই মত পোষণ করেছিলেন যে, পরিবর্তন কেবল একটি বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়, কারণ সব কিছু যেমন আছে, প্রকৃতপক্ষে তেমনিই থেকে যায়।

আয়োনিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ের এক জন দার্শনিক, সামঃ দ্বীপের পিথাগোরাস (৫৭৮–৪৯৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) আজ তার সমকোনী ত্রিভুজের সূত্রের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত এবং এটি হলো: কোন একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ঐ ত্রিভুজের অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান। পিথাগোরাস সংখ্যা ও বাদ্যযন্ত্রের স্কেলের মাঝে সম্পর্কও আবিস্কার করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আকাশের সুবিন্যস্ততাকে লক্ষ্য করে তিনি প্রকৃতির গোপন বিষয়কে জানতে পারবেন। পিথাগোরাসই সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেছিলেন যে, পৃথিবী গোলাকার।

[১২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের শারট্রাহ ক্যাথেড্রালে স্থাপিত দার্শনিক পিথাগোরাসের ছবি।]

তবে পিথাগোরাস এক জন দার্শনিক ও

গণিতবিদের চেয়ে আরও বেশি কিছু ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অতীন্দ্রিয়বাদী। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৮ শতাব্দীতে সামঃ দ্বীপ ছেড়ে তিনি ইতালির দক্ষিণের ক্রোটনে চলে যান এবং সেখানে তিনি পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের সমন্বয়ে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক হিন্দু ও বৌদ্ধদের মত তিনিও পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করতেন। দেহের কারাগারে বন্দী আত্মার মুক্তির জন্য তিনি মাংস ও শিম জাতীয় খাবার খাওয়া থেকে বিরত থেকেছিলেন এবং লোকাচারে অনুচ্চার্য হিসেবে তিনি অন্যান্য মিতাচারী নিয়ম-কানুন পালন করতেন, যেমন– তিনি লোমের পোশাক পরিহার করতেন।

তিয়ানার আপল্লোনিয়াস, যিনি ৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তিনিও পিথাগোরাসকে অনুসরণ করতেন। খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতাব্দীর শুরুতে রোমীয় সম্রাট হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেপ্টিমিয়াস সেভেরাসের স্ত্রী জুলিয়া ডোমনার পৃষ্ঠপোষকতায় ফিলোস্ট্রাটাস তার জীবন-বৃতান্ত লিখেছিলেন। যদিও এই বর্ণনায় উল্লেখিত আপল্লোনিয়াসের অলৌকিক কাজ ও তার বিচারের সাথে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জীবনের সাথে আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবুও ফিলোস্ট্রাটাস সম্ভবত এটিকে সুসমাচারের বিপক্ষে ইচ্ছাপূর্বক প্রতিবাদ হিসেবে লেখেননি। তবে বিষয়টি অনৈতিহাসিক হলেও, সম্ভবত সুসমাচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

যাহোক, আপল্লোনিয়াস বস্তুত একজন পরিবর্তিত পিথাগোরিয়ান ছিলেন, যিনি জাদুবিদ্যার চর্চা করতেন এবং সম্রাট কারাকাল্লা ও আলেক্জান্ডার সেভেরাস সহ অসংখ্য লোকদের প্রশংসা লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে আপল্লোনিয়াস, খ্রীষ্ট, অব্রাহাম ও অর্ফিয়াসের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল এবং প্রত্যেককে সমান ভাবে শ্রদ্ধা করা হত।

খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আপামিয়ার নিউমেনিয়াস নামের এক জন চিন্তাবিদ পিথাগোরাস, প্লেটো ও পুরাতন নিয়ম শাস্ত্রের উপর তার ধারণাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। আর খুবই উল্লেখযোগ্য একটি বিবৃতি উপস্থাপন করে তিনি বলেছিলেন যে, 'প্লেটো ছিলেন গ্রীক ভাষী মোশি।' এছাড়াও তিনি মিশরীয়দের, পূর্বদেশীয় পণ্ডিতদের (পারসিক পণ্ডিতগণ) এবং ভারতের ব্রাহ্মণদের লেখা থেকে উদ্ধৃত করেন।

নিউমেনিয়াসের শিক্ষার সাথে প্লোটিনাস নামের একজন বিখ্যাত নব-প্লেটোবাদীর শিক্ষার খুবই মিল রয়েছে। তিনি দাবী জানিয়ে বলেছিলেন যে, একজন পরম ঈশ্বর রয়েছেন এবং আরেক জন হলেন দ্বিমুখী দ্বিতীয় ঈশ্বর– যিনি প্রথম ঈশ্বরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন ও এই দৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকে শাসন করেন।

নিউমেনিয়াসের বিপরীতে প্লোটিনাস পদার্থ ও একটি মহাজাগতিক মন্দ আত্মার অনন্তকালীন অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। পিথাগোরাসের মত তিনি পুনর্জন্ম-চক্রে বিশ্বাসী ছিলেন। নিউমেনিয়াস তার বিশ্বাসে স্বতন্ত্র ছিলেন এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যে, প্রতিটি মানুষের দুইটি আত্মা রয়েছেঃ ভাল আত্মাটি পাওয়া যায় দ্বিতীয় ঈশ্বরের কাছ থেকে এবং বিচারশক্তিহীন আত্মাকে পাওয়া যায় মহাজাগতিক আত্মা থেকে।

দার্শনিকরা যেসব শব্দ ব্যবহার করতেন

রূপকঃ এটি হলো এমন একটি গল্প যার অর্থ আক্ষরিক তথ্যের মধ্যে নয়, বরং সেগুলো প্রতীকী হিসেবে যা প্রকাশ করছে তার মধ্যে নিহিত থাকে।

অনৈতিকতাঃ এটি জীবনের বিষয়ে একটি অভিমত, যা কোন্‌টি সঠিক এবং কোন্‌টি ভুল– এই প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

মহাবিশ্বঃ মহাবিশ্বকে একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা হিসেবে দেখা হয়, যা লক্ষ্যহীন ও বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে এর উৎপত্তির যে ধারণা রয়েছে তার বিপরীত।

ঈশ্বরত্বঃ ঈশ্বরের প্রকৃতি; ঈশ্বরের একটি নাম।

জগৎ-স্রষ্টাঃ জ্ঞানবাদ অনুসারে এটি হলো বস্তু জগতের সৃষ্টিকর্তার নাম, যাকে পরম ঈশ্বরের চেয়ে অনেক নীচু সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

দ্বৈতবাদঃ ধারণাটি এই যে, এই পৃথিবীতে দুটি শক্তি ক্রমাগত একে অপরের বিরুদ্ধেঃ আলো ও অন্ধকার, অথবা ভাল ও মন্দ।

নীতিশাস্ত্রঃ আচরণ ও নৈতিকতাকে নিয়ন্ত্রণকারী নীতিমালা বিষয়ক বিজ্ঞান।

প্রেয়োবাদঃ এই মত অনুসারে ধারণা করা হয় যে, আনন্দ উপভোগই হলো জীবনের সর্বোচ্চ কল্যাণ ও লক্ষ্য।

ম্যানিখিয়ানসঃ মানির (২১৬–২৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানবাদীদের একটি দল, যারা ঈশ্বরের শেষ দৈববাণী পেয়েছিল বলে দাবী করেন।

রহস্যময় কাল্টসমূহঃ এগুলো ঐ সব ধর্মকে নির্দেশ করে, যেগুলোর বিভিন্ন গোপন

আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে এবং এগুলোর সাথে কেবল তারাই পরিচিত, যারা এই ধর্মমতে দীক্ষিত।

অতীন্দ্রিয়বাদী: এই দলের লোকেরা ধ্যান ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে আত্মজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক প্রকাশকে খুঁজে বেড়ানোর চর্চা করতেন।

ঐশী বা দিব্য যুক্তি: বস্তুনিষ্ঠ চিন্তা-ভাবনা, আদেশ দেয়া ও বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ঐক্যের মূলনীতি; পরম ঈশ্বর, সমস্ত লক্ষ্যের উৎস।

সর্বেশ্বরবাদ: একটি ধর্মীয় অথবা দার্শনিক পদ্ধতি, যা এই বস্তু জগতকে ঈশ্বরের প্রকাশ বলে মনে করে। আর এই মতবাদ অনুসারে, ঈশ্বর কোন কিছু অথবা কারও কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন সত্তা নন।

দৈবযোগ: পৃথিবীকে সৃষ্ট নিয়মের অধীনে ধরে রাখতে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা।

যুক্তিবাদ: বিশ্বাসটি এই যে, ঈশ্বরের বাড়তি উন্মোচন ছাড়াই মানবিক কারণে মানুষ এই বিশ্বব্রহ্মান্ডকে বুঝতে সক্ষম।

পুনর্জন্মবাদ: বিশ্বাসটি এই যে, যখন কোন প্রাণী মারা যায়, তখন তার আত্মা আরেকটি প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে যেন কর্ম অনুযায়ী আগেকার জীবনে অর্জিত শাস্তি অথবা পুরস্কার সে ভোগ করতে পারে।

আত্মা: মানব প্রকৃতির একটি অবস্তুগত দিক– যার স্বর্গীয় উৎপত্তি রয়েছে এবং এটি মানুষের নিজের চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ের কোন সত্তা।

অনুমানবাক্য: যুক্তির একটি ধরন, যেখানে একটি উপসংহার দুটি প্রদত্ত বিবৃতি থেকে বিবেচ্য হয়; যার একটি সাধারণ পদ রয়েছে, যেটি উপসংহার গঠনে অংশগ্রহণ করে না।

দিব্যজ্ঞান: এটি দর্শনের একটি ধরণ, যা দাবী করে যে, ঈশ্বরের জ্ঞান কেবল সম্মোহন অথবা অন্তর্জ্ঞানের মধ্য দিয়ে লাভ করা সম্ভব।

সক্রেটিস ও প্লেটো

সক্রেটিস (৪৬৯–৩৯৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) লোকদেরকে প্রশ্ন করে অবিরাম এথেন্সের চারদিকে ঘুরে বেড়াতেন। গোঁড়া মতবাদ নিয়ে যারা থাকতেন, তিনি তাদের মত দার্শনিক ছিলেন না– বরং তিনি ছিলেন সেই দার্শনিক, যিনি দর্শনের বিষয়বস্তুর ধারাকে পরিবর্তন করে বিশ্বব্রহ্মান্ড থেকে মানুষ এবং মানুষ কিভাবে আচরণ করে– সেই পর্যায়ে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি এই অভিমত পোষণ করতেন যে, সন্তোষজনক জীবনের বিষয়ে কেবল তখনই শিক্ষা দেয়া যেতে পারে, যদি আমরা জানি প্রকৃতপক্ষে এটি কি। সক্রেটিসকে 'নিরীশ্বরবাদ' হিসেবে এবং এথেন্সের যুব সমাজকে কলুষিত করার দায়ে দোষীসাব্যস্ত করা হয়েছিল। তার কিছু শিষ্য, যেমন আলসিবিয়াডস ও ক্রিশাস, কুখ্যাত চরিত্রে পরিণত হয়েছিল। তাকে বিচারের জন্য রাজপ্রাসাদ রয়াল স্টোয়াতে (যা প্রত্নতত্ত্ববিদরা সাম্প্রতিকালে তাদের খননে আবিস্কার করেছেন) নিয়ে আসা হয়েছিল এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে হেমলক বিষ খাইয়ে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিল।

সক্রেটিস যা লিখেছিলেন তার কিছুই আর সংরক্ষিত নেই, তাই তথ্যের জন্য আমাদেরকে তার শিষ্যদের– বিশেষত জেনোফোন এবং সর্বপরি প্লেটোর লেখার উপর নির্ভর করতে হবে। কারণ প্লেটো তার লেখায় নিজের মতামতকে সক্রেটিসের সাথে কথোপকথনের আকারে উপস্থাপন করেছেন। তবে শিষ্য হিসেবে নিজের মতামতকে তার গুরুর কাছ থেকে পৃথক করা সব সময় সহজ কাজ নয়।

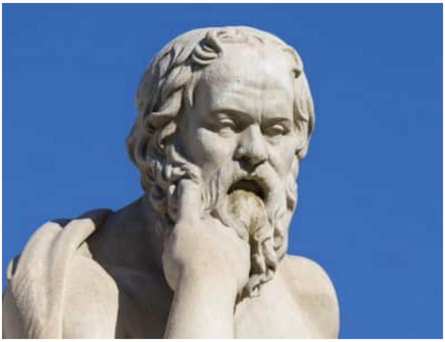

[সক্রেটিস, যার ধারণাগুলো প্লেটোর লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে।]

৩৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এথেন্সের উপকন্ঠে একটি শরীরচর্চা কেন্দ্রে প্লেটো (৪২৮–৩৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) একাডেমী পরিচিত সর্বপ্রথম 'বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্লেটো তার 'প্রজাতন্ত্র' নামক বিখ্যাত বইটিতে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি বোধগম্য প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে (যা সক্রেটিসের নিন্দা করেছিল) আদর্শনীয় একটি দেশের প্রস্তাব করেছিলেন– যা এথেন্সের চেয়ে স্পার্টার সমগ্রতাবাদের উপর ভিত্তি করে গঠন করা হয়েছিল। তিনি হোমারের মহাকাব্যের সেন্সরশীপ, পরিবারের বিলুপ্তি, পুরুষদের সাথে স্ত্রীলোকদের শিক্ষা এবং দার্শনিক-শাসক তৈরি করার জন্য প্রশিক্ষণের যে

[অনেক গ্রীক চিন্তাবিদরা সর্বেশ্বরবাদী ছিলেন: তারা সব কিছুকে ঈশ্বরের প্রকাশ বলে বিশ্বাস করতেন। পক্ষান্তরে, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর তাঁর তৈরি জগতের কাছ থেকে স্বতন্ত্র। হিয়েরাপোলিস, তুরস্কে উষ্ণ ঝর্ণার পাশে জমে থাকা চুনের ছবি। এই ঝর্ণাগুলো থেকে সব সময় রোমীয়দের স্নানের জল সরবরাহ করা হতো।]

নির্বাচনী প্রক্রিয়া ছিল তার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

আর যখন সুরাকুষে (সিসিলি) প্লেটোর কিছু রাজনৈতিক ধারণাকে কাজে লাগানোর সুযোগ আসে, তখন তিনি দুঃখজনকভাবে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন। যদিও বিষয়টি অনেক দুঃখজনক, কিন্তু অধিকতর বিজ্ঞতাপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন তিনি আরও রক্ষণশীল ধারণায় ফিরে আসেন, যার প্রতিফলন ঘটে 'আইন-কানুন' নামে তার শেষ বইটিতে, যাতে উদাহরণ হিসেবে তিনি পারিবারিক অবস্থানকে ফিরিয়ে আনেন।

দার্শনিক প্লেটো তার টিমেয়াস নামক বইয়ে মহাজগতের গঠন নিয়ে আলোচনা করেন, যা পরবর্তীতে খ্রীষ্টিয়ান ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তার মতে সৃষ্টিকর্তা (যাঁকে তিনি জগৎ-স্রষ্ট্রা বলেছেন) ভাল, তবে তিনি সব শক্তির

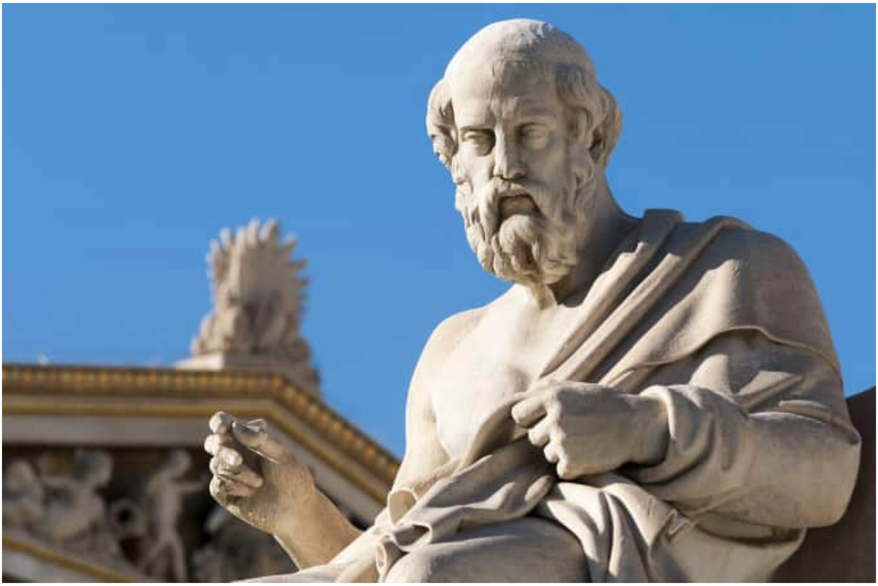

[প্লেটো যিনি ছিলেন গ্রীসের এথেন্সে স্থাপিত একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা।]

অধিকারী কোন দেবতা নন। তিনি শূন্য থেকে এই মহাজগতকে সৃষ্টি করেন নি। বরং, পূর্বে অস্তিত্ব ছিল এমন বিশৃঙ্খল অবস্থাকে ছাঁচে ফেলে সুশৃঙ্খল করার মধ্য দিয়ে এই মহাজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। আর যেহেতু এই মহাজগৎ একটি যৌক্তিক নিয়মের পরিচালিত হচ্ছে– তাই প্লেটো দার্শনিকদেরকে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার মত এই বিষয়গুলো নিয়ে অধ্যয়ন করার পরামর্শ দেন।

গ্রীক চিন্তাধারায় প্লেটোর সর্বোচ্চ অবদানটি ছিল এই যে, সত্যিকার বাস্তবতাকে এই দৃশ্যমান বস্তু জগতে দেখা যায় না, বরং এর পরিবর্তে অদৃশ্যমান, উৎকৃষ্ট ও চিরন্তন আকার অথবা চিন্তা-ধারণায় দেখতে পাওয়া যায়, যার অস্তিত্ব মহাকাশে নেই, সময়ের মধ্যেও নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– একটি ঘনকের ধারণা সকল প্রকৃত ঘনক থেকে স্বতন্ত্র। এর অর্থ এই যে, যা কিছু আমরা এই পৃথিবীতে দেখতে পাই, তা বাস্তবতার এক ধূসর প্রতিচ্ছবি, যেমনটি তিনি তার ‘প্রজাতন্ত্র’ বইটির বিখ্যাত রূপক- ‘গুহা’র দ্বারা ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই পৃথিবীর মানুষেরা গুহাতে বসবাসকারীদের মত, যারা এর ভিতরে তাকিয়ে বাইরের আলোর পরিবর্তে দেয়ালের গায়ে কেবল একটি মিট্‌মিটি ছায়া দেখতে পায়।

আমরা এই ধারণাগুলো আমাদের ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে পাই না। যাহোক, সুন্দর

বস্তুগুলো আমাদেরকে সৌন্দর্যের ধারণার দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং যৌনতাসুলভ ভালবাসা (ইরস), যা আমাদেরকে স্বর্গীয় ইরসের কাছে নিয়ে যেতে পারে। পিথাগোরাসের মত, তিনিও অনুমান করেছিলেন যে, আত্মা পুনর্জন্মলাভ করে। আর আমাদের বর্তমান অস্তিত্বের আগে আমরা কি দেখেছিলাম, তা স্মরণ করার মাধ্যমে আমরা ধারণাসমূহের জ্ঞান লাভের চেষ্টা করি।

প্লেটোর অনুসারীগণ

প্লেটোর শিক্ষাকে প্রণালীবদ্ধ করার জন্য একাডেমীতে তার ঠিক পরবর্তী উত্তরসূরিগণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, যাতে নীতিশাস্ত্রের উপর বিশেষভাবে মনোনিবেশ করা হয়েছিল।

কিন্তু আরচেসেলাউস যিনি ২৭০–২৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি সংশয়বাদী পিড়ন থেকে স্বাধীন এমন একটি সংশয়বাদের বিকাশ ঘটান। আর তিনি তার প্রবর্তিত মতবাদের পক্ষে যুক্তি তুলে বলেন যে, যদি আমরা সঠিকভাবে প্লেটোকে বুঝতে সক্ষম হই, তবে বিচার প্রক্রিয়াকে আমাদের স্থগিত রাখা উচিৎ। আর এই আরচেসেলাউস ইতিবাচক বিবৃর্তিকে এড়িয়ে গিয়ে দাবি করেন যে, তিনি কিছুই জানেন না, এমনকি তিনি তার অজ্ঞতাকেও জানেন না।

মধ্য প্লেটোবাদী: খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী থেকে ২য় শতাব্দী পর্যন্ত যারা দার্শনিক প্লেটোকে সমর্থন করতেন, তারাই মধ্য প্লেটোবাদী হিসেবে পরিচিত ছিলেন, উদাহরণস্বরূপ– আলবিনাস। এরা অ্যারিস্টটলের মতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, ঐশ্বরিক মন কেবল তার নিজের বিষয়েই চিন্তা করে কারণ অন্য কোন বিষয় এর উপযুক্ত নয়। মধ্য প্লেটোবাদীরা প্লেটোর ধারণাগুলোকে ঐশ্বরিক মনের চিন্তাধারার প্রতিফলন হিসেবে দেখতে পেয়েছিলেন। ঐশ্বরিক মনের অবস্থান এই মহাজগত থেকে অনেক দূরে, এটি দ্বিতীয় মন যা এই মহাজগতকে আকার দেয় ও শাসন করে।

এই ঐশ্বরিক মনকে কেবল তার মধ্য দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়, যা প্রকৃতপক্ষে সেটি নয়– যেহেতু আমরা সবাই এই বিষয়ে যা বলতে পারি তা অপর্যাপ্ত। মধ্য প্লেটোবাদীদের এইরূপ দর্শন, যথা– ঈশ্বর হচ্ছে কথা ও বর্ণনার অতীত, তা খ্রীষ্টিয় চিন্তাবিদদেরকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল, যেমন– আলেকজান্ড্রিয়ার ক্লীমেন্ত।

প্লেটোবাদের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টি ছিল **নবপ্লেটোবাদ**, এই দলটি অ্যারিস্টটল

ও স্টোয়িকবাদীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধারণাকে সংগ্রহ করে মধ্য প্লেটোবাদের সাথে সংযোজন করেন। আর এভাবে খ্রীষ্ট পরবর্তী ৩য় শতাব্দীতে নবপ্লেটোবাদের উৎপত্তি হয় এবং সম্রাট জাস্টিনিয়ান ৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষালয়গুলো বন্ধ করে দেন।

প্রখর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন গ্রীকভাষী মিশরীয় **'প্লোটিনাস'** (খ্রীষ্টপূর্ব ২০৫−২৭০ খ্রীষ্টাব্দ) নবপ্লেটোবাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অ্যারিস্টটল ও ডেসকার্তেসের মাঝে তাকে সব চেয়ে মহান স্বতন্ত্র এক জন চিন্তাবিদ বলা হয়। অন্যদিকে, কিছু লেখকরা পরমানন্দের উপর তার গুরুত্বারোপকে 'দর্শনের আত্মহত্যা' বলে উল্লেখ করেন।

এগার বছর আলেকজান্ড্রিয়াতে আম্মোনিয়াস সাকাসের অধীনে অধ্যয়ন করার পরে (যিনি অবশ্য ওরিজেন নামক খ্রীষ্টিয়ান পন্ডিতকেও শিক্ষা দিয়েছিলেন), প্লোটিনাস সম্রাট ৩য় গর্ডিয়ানকে সাথে নিয়ে পারসিকদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছিলেন। ২৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রোমে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু ইতালিতে তার প্লাটোনপোলিস নামে একটি শহর তৈরি করার ইচ্ছা কখনোই পূর্ণ হয়নি। তার সন্যাসী জীবন যাপনের জন্য তাকে খুবই গণ্যমাণ্য বলে বিবেচনা করা হয়। তিনি তার ভাগ্য পরিহার করেছিলেন এবং প্রতিদিন তিনি উপবাস করতেন।

যেহেতু প্লোটিনাস নিজে কিছুই লিখেননি, তাই তার চিন্তা-ভাবনা জানার জন্য 'এন্‌নিডস' নামে পরিচিত তার লেকচার নোটের সংগ্রহের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়, যা তার বিখ্যাত শিষ্য পোড়ফিরি তৈরি করেছিলেন। প্লোটিনাসের ধারাটি একটি একক সত্তার মাঝে বিজড়িত রয়েছে, যাকে প্রগতিশীল সর্বেশ্বরবাদ বলা হয়। আত্মমগ্ন হয়ে থাকা এক সর্বোচ্চ সত্তা, নামহীন ঈশ্বর, যার থেকে বাস্তবতার একটি ত্রিত্ব এককেন্দ্রিক বৃত্তের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে এমন এক কল্পনা তিনি করেছিলেন। আর সেই সত্তা থেকে মঙ্গল ঐশ্বরিক চিন্তাকে বিকিরণ করে, আর সেই চিন্তা/মন মহাজাগতিক আত্মাকে তৈরি করে।

আত্মার অপেক্ষাকৃত নিম্নতর দিকটি প্রাকৃতিক জগতকে সৃষ্টি করেছে যা নিঁখুত নয়, কারণ মঙ্গলের কাছ থেকে এর অবস্থান অনেক দূরে। মানুষের রয়েছে দুইটি ব্যক্তিত্ব− এদের একটি হচ্ছে 'অপর ব্যক্তি', যা পাপ ও দুর্ভোগের অধীন এবং অন্যটি অনন্তকালীন আত্মা, যে পাপ ও কষ্ট ভোগ করে না। মানুষের উচিৎ সন্যাসী জীবন-যাপন ও আত্মিক আনন্দের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা। প্লোটিনাস নিজে চার বার এমন বিশেষ অবস্থায় গিয়েছেন, যে অবস্থায় তিনি

আর জানতেনই না যে, তার একটি দেহ রয়েছে।

পোড়ফিরি (২৩৩–৩০৫ খ্রীষ্টাব্দ) মূলত সোর থেকে এসেছিলেন। প্লোটিনাসের লেখার কাজে সম্পাদনা ছাড়াও তিনি *খ্রীষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে* নামক একটি বইয়ের সংকলন লিখেছিলেন যা পনেরটি পুস্তক সম্বলিত। এটি ছিল বাইবেলের উপর একেবারে শুরুর দিকের আক্রমণগুলোর একটি। তিনি ভাববাদী দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বাইবেলের নতুন নিয়মের সুখবরে পাওয়া অসঙ্গতির সমালোচনা করেছিলেন। ইফিষীয় মণ্ডলীর সভা তার লেখা বইটির প্রতি নিন্দা জানিয়েছিল এবং ৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সেটিকে পুড়িয়ে ফেলা হলেও, এর কিছু খন্ডাংশ এখনো রয়ে গেছে।

খ্যালসিসের আইয়ামম্বলিকাস (২৫০–৩৩০ খ্রীষ্টাব্দ) পোড়ফিরির অধীনে অধ্যায়ন করেছিলেন এবং এর পর তিনি সিরিয়াতে তার নিজের বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তিনি ঐন্দ্রজালিক আচার-অনুষ্ঠান ও জ্যোতিষশ্রাস্ত্রের ব্যবহারের বিষয়ে প্রশংসা করেছিলেন। তিনি তার নিজের সময়ে খুবই খ্যাতিমান হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে সম্রাট জুলিয়ান দ্যা এপোস্টেট তাকে খুবই সম্মান জানিয়েছিলেন।

লুকিয়ার প্রোক্লাস (৪১১–৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন একাডেমীর প্রধান। তিনি দর্শনের সাথে যাদু বিদ্যা ও অতীন্দ্রিয়বাদকে সমন্বয় করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তিনি প্রাথমিক পর্যায়ের কোন নবপিথাগোরীয় হিসেবে পুনর্জন্মলাভকারী এক জন দার্শনিক। প্লেটো ও অন্যান্য লেখকদের উপর তার অসংখ্য মন্তব্য মধ্যযুগে সাড়া জাগিয়েছিল। যদিও কিছু নবপ্লেটোবাদীরা, যেমন পোড়ফিরি, খ্রীষ্টধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন, তবুও নবপ্লেটোবাদ খ্রীষ্টিয়ান চিন্তাবিদদেরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ওরিজেন, যিনি প্লোটিনাসের সাথে একত্রে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং খ্রীষ্টিয় ত্রিত্বের বিষয়ে তার ধারণার সাথে প্লোটিনিয়াসের ত্রিত্বের, অর্থাৎ এক সত্ত্বা, নুস (মন অথবা বুদ্ধি) ও আত্মার সাথে উল্লেখযোগ্য মিল ছিল। যখন ধর্মতত্ত্ববিদরা নাইসিয়ান বিশ্বাস-সূত্রকে তুলে ধরছিলেন, তখন তারা দেব-দেবতাদের ক্রমভিত্তিক পদমর্যাদা বিষয়ক নবপ্লেটোবাদী ধারণাকে প্রত্যাখান করেছিলেন।

ম্যানিখিয়ানসদের দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন বলে আগষ্টিন (৩৫৪–৪৩০ খ্রীষ্টাব্দ) প্লেটোবাদীদের লেখাকে কৃতিত্ব দিয়েছিলেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে অদৃশ্যমান জগতের উপর তাদের গুরুত্ব প্রদান ও দৃশ্যমান জগতের প্রতি তাদের অবজ্ঞা খ্রীষ্টিয়ান দৃষ্টিভঙ্গির নিকটবর্তী। তিনি দাবী করেছিলেন যে, ‘কথায় ও মতে

কিছুটা পরিবর্তন করে, তারা খ্রীষ্টিয়ান হতে পারেন, যেভাবে বর্তমানে অনেক প্লেটোবাদীরা হয়েছেন।' প্লোটিনাসের অতীন্দ্রিয়বাদী গুরুত্বারোপন মহান আলবার্ট ও বোনাভেনটিওর মত চিন্তাবিদদের মধ্যযুগীয় অতীন্দ্রিয়বাদ বিকাশে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

অ্যারিস্টটল (খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৩৮৪-৩২২)

অ্যারিস্টটল মূলত থিষলনীকীর পূর্বে অবস্থিত স্টাগিরা থেকে এসেছিলেন। অ্যারিস্টটলের বাবা সম্রাটের ম্যাসিডোনীয় বিচারসভার এক জন চিকিৎসক ছিলেন, তাই তাকে যুবক আলেক্জান্ডারের গৃহশিক্ষক হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে যে, এই আলেক্জান্ডারকে পরবর্তীতে 'মহান' বলা হতো। বলা হয়ে থাকে যে, অ্যারিস্টটল প্লেটোর ছাত্র ছিলেন, কিন্তু তার শিষ্য ছিলেন না। প্রায় প্রতিটি বিষয়ে তিনি তার শিক্ষকের সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন। ৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এথেন্সের লাইকাবেটাস পর্বতের কাছে লাইসিয়াম নামে তার নিজের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

অতৃপ্ত কৌতুহলী হিসেবে, অ্যারিস্টটল প্রতিটি বোধগম্য বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। প্লেটোর বিপরীত দিক হিসেবে, তিনি পর্যবেক্ষণের উপর এবং পর্যবেক্ষিত তথ্য থেকে সাধারণ আইন তৈরির উপর (আবেশন) জোড় দিয়েছিলেন। তিনি এমনকি প্রাণীদেহকে ব্যবচ্ছেদও করেছিলেন এবং বক্তৃতার উপর তার লেখায় প্রাণীবিদ্যা, অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও শরীর বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অদৃশ্য ধারণার চেয়ে, বরং দৃশ্যমান বিষয় নিয়েই বাস্তবতা গঠিত হয়।

[অ্যারিস্টটল]

তিনি যৌক্তিক বিতর্কের জন্য নিয়ম-

কানুনকে তুলে ধরেছিলেন, যেমন– অনুমানবাক্য। তিনি কবিতা, অলঙ্কারিক বিষয় ও রাজনীতির উপর লেখার প্রয়াস পেয়েছিলেন। নীতিশাস্ত্রের উপর তিনি একটি অভিমত পোষণ করতেন যে, পুরুষদের ‘মধ্যপন্থা’ কাম্য হওয়া উচিৎ– এটি হলো চরমপন্থাগুলোর মাঝে আদর্শনীয় আচরণের একটি। অ্যারিস্টটল বিশ্বাস করতেন না যে, মানুষ অমর, তবে কেবল অব্যক্তিক ‘সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি’ যা মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকে।

গতি বিষয়ক যুক্তি উপস্থাপন থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, অবশ্যই একটি ‘স্থিতিশীল প্রথম কারণ’ রয়েছে। এই প্রাথমিক চালক শক্তি, অথবা ঈশ্বর, আকাশমন্ডলের পরিধির উপর বসে আছেন। তিনি পুরোপুরিভাবে নিজের চিন্তায় আত্মমগ্ন হয়ে রয়েছেন, নীচের বিশ্বব্রহ্মান্ডের বিষয়ে তার কোন ধারণা নেই।

যে মুসলিম লেখকরা অ্যারিস্টটলের কাজগুলোকে মধ্যযুগ পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে ইব্‌নে সিনা অন্যতম এবং তিনি আভিসেন্না (৯৮০–১০৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) নামেও পরিচিত ছিলেন। যখন অ্যারিস্টটলের কাজগুলোকে দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দে আবার ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল, তখন ওগুলো ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে ছিল। সেগুলো দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছিল, বিশেষত থোমা আকুইনাসের (১২২৪-১২৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) মধ্য দিয়ে, যিনি ঐ অনুবাদগুলোকে খ্রীষ্টিয় ধারণার সাথে দক্ষতার সমন্বয় করে রোমান ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্বের উপর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

অ্যারিস্টটলের অনুসারীরা

থিওফ্রাস্টাস (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৭১–২৮৮) ছিলেন লেসবোস দ্বীপ থেকে আসা অ্যারিস্টটলের খুবই কাছাকাছি সময়ের উত্তরসূরী। তিনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয় এক জন বক্তা। তার ২০০০ জনের বেশি সংখ্যক ছাত্র ছিল। উদ্ভিদ বিদ্যায় তার বিশেষ অবদান ছিল। ২৭০টি কাজের মধ্যে যেগুলোর জন্য তাকে কৃতিত্ব দেয়া হয়, প্রকৃতপক্ষে ঐ বিষয়গুলো হলো বিভিন্ন খনিজ পদার্থ বিষয়ক একটি গবেষণা এবং এমন বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের হাস্যকর একটি বর্ণনা যেগুলোকে চরিত্র বলা হয়, যেটি বিভিন্ন ধরণের লোকদেরকে ইঙ্গিত করে, যেমন– ‘চাটুকার’, ‘বাচাল’ এবং ‘অসভ্য’।

ফালেরামের দীমীত্রিয় ছিলেন অ্যারিস্টটলের আরেক জন অনুসারী। যাকে রাজা ১ম টলেমি আলেকজান্ড্রিয়াতে গিয়ে একটি ‘যাদুঘর’ নির্মাণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন– আক্ষরিক অর্থে এটি ছিল ‘গ্রীক কলালক্ষ্মীগণের একটি প্রাসাদ’, যা

কালক্রমে গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল এবং প্রাচীন বৃহত্তম পাঠাগারটি এর অংশীভূত হয়েছিল। আর এই সময় থেকে টলেমির ধন-সম্পদ পাণ্ডিত্যের কেন্দ্র হিসেবে এথেন্সের পরিবর্তে আলেকজান্ড্রিয়াকেই নিশ্চিত করেছিল।

এখান থেকেই **সামঃ দ্বীপের আরিষ্টার্খ** (খ্রীষ্টপূর্ব ২৮০) দাবী করেছিলেন যে, পুরো মহাবিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য এবং **এরাটোসথিনিস** (খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৪–১৯২) পৃথিবীর পরিধিকে ২০০ মাইলের (৩২০ কিলোমিটার) মধ্যে নির্ভুলতার সাথে পরিমাপ করেছিলেন। রাজা ২য় টলেমির গৃহশিক্ষক ছিলেন **ইউক্লিড,** যিনি আদর্শনীয় জ্যামিতি পাঠপুস্তকের সংকলন করেছিলেন।

সংশয়বাদী

'সংশয়বাদী' শব্দটি এসেছে একটি গ্রীক শব্দ 'সর্তকতার সহিত পর্যবেক্ষণ করা'। কিন্তু সংশয়বাদের অর্থ হল কোন কিছু জানার সম্ভবনার বিষয়ে অবিশ্বাস অথবা অজ্ঞেয়বাদ।

পিরহোন (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৬৫–২৭৫)

সংশয়বাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এলিসের পিরহোন, যিনি মহান গ্রীক সম্রাট আলেক্জান্ডারের সাথে ভারতে এসেছিলেন। যদিও তার কোন লেখা নেই, তবে আমরা অন্যদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি যে, তিনি ইন্দ্রিয়

[লাইক্যাবেটাস পর্বত থেকে দেখা এথেন্স শহর। বামে রয়েছে– সুরক্ষিত পাহাড়, যার চারপাশ ঘিরে শহরটি গড়ে উঠেছিল।]

অনুভূতিকে অবিশ্বাস করতেন। তিনি তার অনুসারীদেরকে শান্ত জীবন কাটানোর অনুরোধ জানান এবং যা কিছু সম্ভাব্য, তার উপর তাদের জীবনের ভিত্তি তৈরি করতে বলেন। সংশয়বাদীরা খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় ও ২য় শতাব্দীতে প্লেটোবাদী একাডেমীর উপর কিছু সংখ্যক লোকদেরকে নিয়ে, যেমন– আরচেসেলাউস, প্রভাব বিস্তার করেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী প্রধান কুরীণীর কার্নিয়েডসও (খ্রীষ্টপূর্ব ২১৪–১২৯) এক জন ঘোর সংশয়বাদী ছিলেন। তিনি দেব-দেবীর অমরত্ব ও জ্ঞানের নিশ্চয়তাকে অস্বীকার করেছিলেন। তার বিষয়ে আমরা যা কিছু অনুমান করতে পারি, তা বাহ্যিক ধারণা থেকে। খ্রীষ্টপূর্ব ১৫৫ সালে কার্নিয়েডস তার অলঙ্কারবহুল ভাষার দ্বারা রোমীয়দের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু নীতিহীনতার দ্বারা তাদের বিক্ষুব্ধ করেছিলেন।

সর্বশেষ প্রধান সংশয়বাদী ছিলেন **সেক্সটাস এম্পেরিকাস** (২য় অথবা ৩য় শতাব্দী) এবং তিনি এক জন চিকিৎসকও ছিলেন। আমরা নিশ্চিত নই যে, তিনি কোথায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, অথবা কোথায় তিনি শিক্ষা দিতেন। তার কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে: ‘পিরহোনবাদের রূপরেখা’, ‘গোঁড়ামীবাদীদের বিরুদ্ধে’ ও ‘অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে’। শান্ত জীবন যাপন করাই ছিল তার লক্ষ্য এবং তার প্রিয় অভিব্যক্তি ছিল, ‘এতে কোন পার্থক্য নেই’।

হতাশাবাদী

হতাশাবাদীদেরকে এভাবে ডাকার কারণ তারা ‘কুকুরের মত জীবন কাটাতেন’ (হতাশাবাদীর গ্রীক শব্দের অর্থ ‘কুকুরের মত’)। হতাশাবাদীরা অ্যান্টিস্থিনসকে (খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৪৪৫-৩৬৫) হতাশাবাদের প্রতিষ্ঠাতা এবং অ্যারিস্টটলের এক জন অনুসারী বলে দাবী করতেন। অ্যান্টিস্থিনস প্লেটোর ধারণা ভিত্তিক মতবাদকে প্রত্যাখান করেন এবং জাগতিক সুখ-শান্তিহীন জীবনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অতীত ঐতিহ্য অনুসারে তিনি যে এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তা নিয়ে অধিকাংশ পন্ডিতেরা দ্বিমত পোষণ করেন।

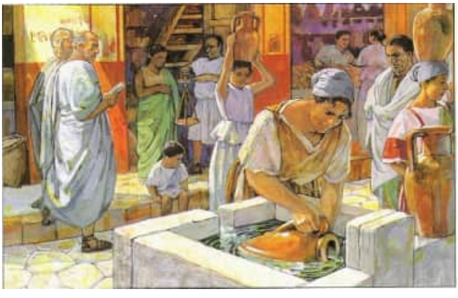

[একজন স্ত্রীলোককে রোমের অনেক ফোয়ার একটি থেকে জল তুলতে দেখা যাচ্ছে]

সবার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হতাশাবাদী ডায়োজিনিস (খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৪০৩-৩২৩) সর্বোচ্চ এই সম্মানের সর্বোচ্চ দাবীদার, যিনি অ্যান্টিস্থিনসের অধীনে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাকে সবচেয়ে বেশি মনে রাখার কারণ

গ্রীক দর্শন

প্রদীপ হাতে তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি দিনের উন্মুক্ত আলোয় এক সৎ লোকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ডায়োজিনিস তার সময়ের সব রীতিনীতিকে প্রকাশ্যে অবজ্ঞা করতেন। তিনি করিন্থ শহরে একটি বড় কলসির মধ্যে বসবাস করতেন এবং তার সম্বলের মধ্যে ছিল একটি ঢিলেঢালা লম্বা পোশাক, একটি লাঠি ও একটি টাকা রাখার থলে। প্রকাশ্যে বর্জ্য ত্যাগ ও সঙ্গম করে তিনি তার সমসাময়িকদের সুনামকে হানি করতেন।

ক্রীড়া, সঙ্গীত, গণিতের প্রতি যদি কেউ মনযোগ দিতেন, তবে ডায়োজিনিস

[মূর্তি পূজা করা সব গ্রীকদের জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক ছিল এবং ধর্মীয় উৎসবগুলো ছিল খুবই জনপ্রিয়। বছরে এক বার পুরোহিত ও সঙ্গীতজ্ঞদের সমন্বয়ে এথেন্স থেকে এক্রোপলিসের উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হতো। উৎসব উদ্‌যাপনের মাঝামাঝি সময়ে অ্যাথিনার মূর্তিকে নতুন পোশাক পরানো হতো এবং বামদিকে সম্ভবত ইরেকথিয়ন মন্দিরের বারান্দার সেই ছবিই প্রদর্শিত হচ্ছে।]

[করিন্থে ডায়োজিনিসের বাড়ি– খুবই উন্নয়নশীল এই শহরটি ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানার জন্য বিখ্যাত ছিল। পিছনে রয়েছে এক্রো-করিন্থ নামের শৈল, যার উপর এক সময় দেবী এফ্রোডাইটের মন্দির ছিল।]

তাদেরকে নিয়ে হাসি-তামাশা করতেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'অর্থের প্রতি ভালবাসাই হলো সব মন্দতার কেন্দ্রস্থল'; তার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, 'কোন কিছুকে ভয় করো না, কোন কিছুকে কামনা করো না, কোন কিছু সঞ্চয় করো না'। কিছু সংখ্যক লোক তার এই ভয়ানক স্বাধীনতার প্রশংসা করতেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৬ সালে মহান সম্রাট আলেকজান্ডার তার সাথে সাক্ষাত করে তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি তার জন্য কি করতে পারেন। সম্রাটের ঐ প্রশ্নের জবাবে তিনি কেবল বলেছিলেন, 'সরে দাঁড়ান, আপনি সূর্যকে আড়াল করছেন'। এই প্রসঙ্গে তিনি তার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছিলেন, 'যদি আমি সম্রাট আলেক্জান্ডার না হতাম, তবে আমি ডায়োজিনিস হতাম'।

ডায়োজিনিসের ছাত্রদের মধ্যে সব চেয়ে লক্ষ্য করার মত ছাত্রটি ছিলেন থিব্সের ক্রেটস (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৬৫–৩২৪)। তাকে বলা হতো 'দরজা-উন্মুক্তকারী' কারণ তিনি বিনা আমন্ত্রণে লোকদের ঘরে প্রবেশ করে তার হতাশাবাদী দার্শনিকতার বাগাড়ম্বরপূর্ণ উক্তি লোকজনকে শোনাতেন। তিনি তার বোন হিপ্পারচিয়াকে

হতাশাবাদে দীক্ষিত করেন এবং তারপর তাকে বিয়ে করেন।

হতাশাবাদী প্রচারকরা খুব সাহসীকতার সাথে বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথাবার্তা বলতেন, যা ডায়াট্রাইব বা ‘প্রচন্ড নিন্দাপূর্ণ বক্তৃতা’ হিসেবে পরিচিত। আর এই ধরণের নৈতিকতা বিষয়ক বক্তৃতা ও উপদেশ পরবর্তী সময়ে সম্ভবত খ্রীষ্টিয়ান প্রচারকরা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

বৈরাগ্যবাদী (স্টোয়িক)

সাইপ্রাস দ্বীপের কিশোন অঞ্চলের জেনো (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০−২৬০) ছিলেন বৈরাগ্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৩১৪ শতাব্দীতে জাহাজডুবিতে সব কিছু হারিয়ে, খুবই নিঃস্ব অবস্থায় এথেন্সে এসেছিলেন। জেনোফোনের লেখা *সক্রেটিসের জীবনী* নামের বইটি দেখতে পেয়ে তিনি দর্শনের প্রতি কৌতুহলী হয়ে উঠেছিলেন। আর যখন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিভাবে তিনি দর্শন অধ্যয়ন করতে পারেন, তখন তাকে হতাশাবাদী ক্রেটসকে অনুসরণের জন্য বলা হয়, আর ঐ সময় ক্রেটস তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৪ সালে জেনো অলঙ্কৃত বারান্দাতে (স্টোয়া পোইকিলে) বসে শিক্ষা দিতে শুরু করেন। এই বারান্দাটি এই নামে ডাকার কারণ হচ্ছে এতে পারসিকদের পরাজয়ের উপর পলিগনোটাসের চিত্রকর্ম রয়েছে। স্টোয়িক (বৈরাগ্যবাদী) নামটি এসেছে স্টোয়া, অথবা কলোনেডেড পোর্টিকো (অর্থাৎ, স্তম্ভ সারিতে সজ্জিত বারান্দা) থেকে। ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এথেন্সের এগোরা ভবনগুলোর অন্যতম এই ভবনটির দেয়াল বিভিন্ন বিখ্যাত চিত্রকর্ম ও যুদ্ধ থেকে সংগৃহীত লুণ্ঠিত দ্রব্যে সুশোভিত ছিল বলে এর অনুরূপ নাম-করণ করা হয়েছিল।

গ্রীক ভাষা

মহান সম্রাট আলেক্জান্ডারের ম্যাসিডোনিয়ার রাজসভায় প্রাচীন অ্যাটিক অথবা এথেনীয় গ্রীক ভাষা ব্যবহার করা হতো। সম্রাট আলেক্জান্ডারের ধারাবাহিক রাজ্য জয় এবং গ্রীক সৈনিকদের সর্বব্যাপি উপস্থিতির কারণে, বিশেষত পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে তাদের নিজেদের অঞ্চল

[স্থানীয় নাকলেবোনস খেলায় মেতে থাকা গ্রীক মেয়েরা। মাটির এই ভাস্কর্যটি খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে তৈরি করা হয়েছিল এবং ইতালির কাপুয়াতে পাওয়া গিয়েছিল।]

হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করায় গ্রীক ভাষা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই গ্রীক ভাষা উচ্চারণ, ব্যকরণ ও শব্দকোষের দিক থেকে খুবই সহজ হয়ে উঠে এবং সাধারণ গ্রীক (কইনে গ্রীক) নামে পরিচিতি লাভ করে। খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০ সালে প্রায় সত্তর জন পন্ডিত মিলে মিশরে পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মকে কইন গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদই বর্তমানে 'সেপ্টুয়াজিন্ট' নামে পরিচত যা সত্তর-এর গ্রীক শব্দ। এই সেপ্টুয়াজিন্ট অনুবাদে কেবল পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোকেই অনুবাদ করা হয়নি, বরং ডজনেরও বেশি পুস্তক অনুবাদ করা হয়েছে এবং এগুলোর সমন্বয়ে 'অ্যাপোক্রিফা' তৈরি করা হয়েছে।

শাস্ত্রীয় বিষয়ের পূর্ণতা ও খ্রীষ্ট কিংবা মশীহ হিসেবে প্রভু যীশুকে ইঙ্গিত করতে প্রাথমিক পর্যায়ের খ্রীষ্টিয়ানরা সচরাচর বাইবেলের সেপ্টুয়াজিন্ট অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত করতেন। যিহূদী রব্বিরা প্রায় ১৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আকিলাকে গ্রীক ভাষায় পুরাতন নিয়মের আরেকটি অনুবাদের তৈরির ভার প্রদান করেছিলেন। কিন্তু আকিলা অনুবাদ কাঠখোট্টা ধরণের আক্ষরিক হওয়াতে, থিওডোশন ও সিম্মাকাস পুরাতন নিয়মকে আবারও গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

প্রজাতন্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়ের বছরগুলো থেকেই, রোমীয়রা ইতালি ও সিসিলির গ্রীক উপনিবেশের মধ্য দিয়ে গ্রীকদের সান্নিধ্যে আসে। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে বিশেষত ম্যাসিডোনিয়া ও আখায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়, রোম গ্রীক যুদ্ধবন্দী ও শিল্পকর্মে ভরে যায়। যেভাবে প্রাচীন কবি হোরেসের কবিতায় ধ্বনিত হয়েছিল, 'বন্দি গ্রীকরা রোমকে বন্দি করেছিল'।

গ্রীক সংস্কৃতির জোয়ারকে যেসব রোমীয়রা বাধা দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ক্যাটো দ্যা সেনসর (খ্রীষ্টপূর্ব ২৩৪–১৪৯) অন্যতম। স্কিপিও অ্যামিলিয়ানাস সহ প্রভাবশালী রোমীয়দের একটি দল যারা গ্রীক সংস্কৃতিকে ভালবাসতেন, তারা গ্রীক সংস্কৃতিকে লালন করেন এবং পলিবিয়াস ও টেরেন্সের মত লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। উৎকৃষ্টতর গ্রীক সংস্কৃতির সান্নিধ্যে থেকেই রোমীয়রা নিজেদের সাহিত্য, দর্শন ও চিত্রকর্ম সৃষ্টি করতে শুরু করে। বলা হয়ে থাকে যে, জীবনের শেষ পর্যায়ে এসেও ক্যাটো দ্যা সেনসর গ্রীক ভাষা শেখার প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন।

এথেন্স ও রোডসে অধ্যায়নের পরে, রোমীয় লেখক ও বক্তা সিসেরো (খ্রীষ্টপূর্ব

১০৬–৪৩) গ্রীক ভাষাতে যেমন, তেমনি ল্যাটিন ভাষাতেও পারদর্শী হয়েছিলেন। রোমীয় শিক্ষার উপর বিশেষ ক্ষমতা ছিল যার, সেই কুইন্তিলিয়ান (৪০–১১৮ খ্রীষ্টাব্দ) এই মত পোষণ করতেন যে, ল্যাটিন ভাষা শেখার আগে রোমীয় ছেলে-মেয়েদের গ্রীক ভাষা শেখা উচিৎ। ২য় খ্রীষ্টাব্দে বেঁচে থাকা প্লুটার্ক ল্যাটিন খুবই কম জানতেন। তা সত্ত্বেও গ্রীক ঐতিহাসিক পলিবিয়াসের কাজকে ব্যবহার করে তিনি *গ্রীক ও রোমীয়দের সমান্তরাল জীবন* নামে গ্রীক ভাষায় একটি বই লিখেছিলেন। সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস ১৮০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীক ভাষায় তার 'বৈরাগ্যবাদী ধ্যান' বইটি লিখেছিলেন। ২য় শতাব্দীর ব্যঙ্গরচয়িতা মার্শাল ও জুভেনাল অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে, এমনকি রোমীয় স্ত্রীলোকেরা প্রেম করেছিল গ্রীক ভাষায়!

গ্রীক ও রোমীয় ভাষাকে পুরো রোমীয় সাম্রাজ্যের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হতো। *রেস জেস্তে* নামে সম্রাট আগস্তের আত্মজীবনী তুরস্কের আঙ্কারাতে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় লেখা হয়েছিল। সম্রাট ভ্যাসপাসিয়ান গ্রীক ও রোমীয় উভয় ভাষায় অধ্যাপকত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইতালীয়দের ছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে পুরো রোমীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে ল্যাটিনের চেয়ে গ্রীক ভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। প্রায় ৫০০ জন যিহূদীর ভূ-গর্ভস্থ সমাধিক্ষেত্রের লিপির বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, পুরো সাম্রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৭৪% গ্রীক, ২৪% ল্যাটিন এবং বাকী ২% হিব্রু অথবা অরামিক ভাষী ছিল।

গ্রীক ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের খ্রীষ্টিয়ানদের একটি প্রিয় ভাষা। এমনকি রোমের খ্রীষ্টিয়ানরা ৪র্থ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রীক রীতিতে তাদের উপাসনা আয়োজন করতেন। আলেকজান্ড্রিয়ার ক্লীমেন্ত, ওরিজেন, রোমের ক্লীমেন্ত এবং লিওন্সের (ফ্রান্স) আইরেনিয়াসের মত সব প্রাথমিক খ্রীষ্টিয়ান লেখকরা গ্রীক ভাষায় লিখতেন। 'ল্যাটিন মণ্ডলী' ক্রমবিকাশের সাথে সাথে খ্রীষ্টিয় জগৎ পরবর্তীতে দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল– পশ্চিমের ল্যাটিনীয়রা ও পূর্বের গ্রীকরা। বিভক্তকারী সীমারেখা চলে গিয়েছিল পূর্বের ডালমাটিয়া (যুগোশ্লাভিয়া), ইতালি এবং ত্রিপলিতানিয়া (পশ্চিম লিবিয়া) পর্যন্ত।

গ্রীকদের শিক্ষা

গ্রীকদের শিক্ষা প্রাথমিকভাবে মূলত অভিজাতমূলক ও ক্রীড়া বিষয় কেন্দ্রিক ছিল এবং অধিকাংশই তা ছেলেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০ (প্রায়) তার্কিকরা, যারা জীবিকা হিসাবে অলঙ্কারশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন, তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপ্লব নিয়ে আসেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে এথেন্সে দর্শনের বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপন

[ফুলদানিতে আঁকা একটি গ্রীক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দৃশ্য– একটি ছেলে বীণা বাজাতে শিখছে এবং অন্য দিকে আরেক জন তার পড়া শিখছে।]

করা হয়েছিল।

গ্রীক সংস্কৃতি হেলেনিস্টিক যুগে মধ্যপ্রাচ্যে থাকা গ্রীকরা প্রতিটি শহরে শরীরচর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। আর এই উদ্যোগ প্রধানত হেলেনীয় সংস্কৃতিকে সংরক্ষিত করার এবং যারা হেলেনীয় নয় তাদেরকে হেলেনীয় সম্প্রদায়ের অধীনে সংরক্ষিত করার সবচেয়ে মোক্ষম উপায় হিসেবে কাজ করেছিল।

অধিকাংশ পরিবারের এক জন গোঁড়া পান্ডিত্যসুলভ ব্যক্তি ছিলেন– সচরাচর বয়স্ক দাস হিসেবে তিনি ছেলেদের সরঞ্জামগুলো বহন করতেন, তাদেরকে বিদ্যালয় পর্যন্ত সঙ্গ দিতেন এবং প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠের উপর তাদের পরীক্ষা নিতেন। তিনি ছিলেন 'সেবক, পদচারী, সহচারী এবং গৃহশিক্ষকে'র এক সমন্বয়।

গ্রীক শিক্ষা সংস্কারকগণ নগ্ন শরীরে ক্রীড়া বিষয়ক চর্চা (*জিমনেসিয়া*) ও কলাবিদ্যার পৃষ্টপোষকীয় দেবী হিসেবে কলালক্ষীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত চারুকলার উপর সমান গুরুত্ব দিতেন। ক্রীড়া বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হতো ব্যক্তিগত 'কুস্তির আখড়ায়'। বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত শরীরচর্চা কেন্দ্রগুলোয় দৌড় ও বর্শা নিক্ষেপের আয়োজন থাকতো।

প্রতিটি যুবক ছেলেকে গান গাইতে ও বীণা বাজাতে শিক্ষা দেয়া হতো। শিক্ষকের কাছ থেকে পাওয়া বর্ণমালার নমুনা অনুকরণ করে মোমের ফলকে বর্ণমালা লিখতে

[গ্রীক বাঁশি– গ্রীকদের জীবনে সঙ্গীত একটি বিশেষ অংশ জুড়ে থাকতো।]

শুরু করতো। প্রাচীনকালে যেভাবে চিৎকার করে সব সময় পড়ার নিয়ম ছিল, সেভাবে তাদেরকে পড়তে হতো। হোমারের লেখা, ছান্দিক কবিতা ও নাটক পড়াই ছিল তাদের পড়ার উদ্দেশ্য, বিশেষত ইউরিপিডিসের নাটকগুলো।

যখন এক জন ছেলের বয়স আঠের বছর হতো, তখন সে তার দেখাশোনাকারী ঐ পন্ডিতের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে পারতো। আর আঠার থেকে বিশ বছরের মাঝামাঝি বয়সের এথেনীয় যুবকদেরকে 'এফিব্স' বলা হতো এবং এই সময় তাদেরকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে বাধ্যতামূলকভাবে সেনা ও ক্রীড়া বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিতে হতো। হেলেনীয় যুগে এই প্রশিক্ষণের স্নাতকধারীদের সমন্বয়ে সমাজের উচুঁ শ্রেণী গঠিত হতো। আর রোমীয়দের যুগে এথেন্সের এফিব্সের প্রতিষ্ঠানটি সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে।

ক্লিন্থেস (খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০–২৩২)

অ্যাসোসের ক্লিন্থেস গরিব পরিবার থেকে এসেছিলেন এবং তাকে বাহক হিসাবে কাজ করতে হয়েছিল যেন তিনি মনযোগ সহকারে জেনোর বক্তৃতা শুনতে পারেন। খ্রীষ্টপূর্ব

[এথেন্সের আগ্রালুসে অবস্থিত স্টোয়া– যেটিকে খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এখন এটিকে আবারও পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে।]

২৬২ সালে তিনি স্টোয়ার প্রধান হয়েছিলেন। ক্লিন্থেস এই বিশ্বব্রহ্মান্ডকে দেখতে পেয়েছিলেন একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবে যার কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য। তিনি চল্লিশটির মত কবিতা রচনা করেছিলেন– যেগুলোর মধ্যে *জেউসের প্রশংসাগীত* খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিল।

ক্রিসিপাস (খ্রীষ্টপূর্ব ২৮১–২০৭)

স্টোয়ার প্রধান হিসেবে খ্রীষ্টপূর্ব ২৩২ সালে ক্লিন্থেসের পরে ক্রিসিপাস এসেছিলেন এবং তার জন্ম হয়েছিল কিলিকিয়ার তার্ষের পশ্চিমে অবস্থিত সোলিতে। তিনি ছিলেন ফলপ্রসূ এক জন লেখক এবং যার ৭০০টি বই লেখার কৃতিত্ব থাকলেও, এগুলোর কিছু খন্ডাংশ বেঁচে রয়েছে মাত্র। স্টোয়িক মতবাদকে (বৈরাগ্যবাদ) প্রণালীবদ্ধ করাই ছিল, তার সবচেয়ে বড় সাফল্য।

প্যানেশাস (খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৫–১০৯)

রোডসের প্যানেশাস রোমে ভ্রমণ করেছিলেন, গ্রীক সংস্কৃতিকে ভালবাসতেন এমন

এক রোমীয় সেনাধ্যক্ষ স্কিপিও অ্যামিলিয়ানসকে তার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নিশ্চিত করেছিলেন। আর তিনি বৈরাগ্যবাদকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যাতে রোমীয়দেরকে তাদের সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরক্ষা প্রদান করা যায়। তিনি এই মত পোষণ করতেন যে, প্রজাদের চেয়েও রাষ্ট্রের গুরুত্ব বেশি এবং রোমীয় রাজ্যের ছিল সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সম্ভাবনাময় সংবিধান। খ্রীষ্টপূর্ব ১২৯ শতাব্দীতে প্যানেশাস স্টোয়ার প্রধান হয়েছিলেন।

পসিডোনিয়াস (খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৫–৫১)

প্যানেশাসের ছাত্র আপামিয়ার পসিডোনিয়াস রোডসে একটি বিখ্যাত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং সেখানেই সিসেরো অধ্যায়ন করেছিলেন। সম্রাট পম্পে তার প্রশংসা করেছিলেন ও পালাক্রমে তিনিও পম্পের প্রশংসা করেন এবং আইন-কানুন ও শৃঙ্খলার অভিভাবক হয়ে রোমকে ধরে রাখেন। পসিডোনিয়াস ব্যাপক পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিষয়ে তিনি বর্ণনা লিখেছিলেন, তিনি কেল্ট সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আদর্শবাদীতার আলোকে 'অভিজাত বর্বর মানুষ' হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। সর্ববিষয়ে আগ্রহান্বিত ব্যক্তি হিসেবে পোসিডোনিয়াস অ্যারিস্টটলের মত গণিত, জ্যামিতি, আবহবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার পথে বিচরণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, তিনি চাঁদ ও স্রোতের বিভিন্ন অবস্থা লক্ষ্য করেছিলেন।

রোমীয় বৈরাগ্যবাদীরা

সেনেকা (৪ খ্রীষ্টপূর্ব – ৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) অলঙ্কারশাস্ত্রের এক জন অধ্যাপকের ছেলে ছিলেন। তিনি সম্রাট নিরো এবং রোমীয় সম্রাটের বিশেষ সুরক্ষা দলের সর্বাধিনায়ক, বুরুসের গৃহশিক্ষক হিসেবে কাজ করতেন। সম্রাট নিরোর স্বর্ণময় প্রথম পাঁচটি বছরের জন্য তার বিশেষ অবদান ছিল। এক জন বৈরাগ্যবাদী হিসেবে সেনেকার উচুঁ অবস্থান অসহনীয় ছিল। এটি ছিল তার কাছে আপোষের আহ্বান এবং যা তার উচুঁ নৈতিক আদর্শ নিয়ে বেঁচে থাকাকে অসম্ভব করে তুলেছিল। যদিও তিনি কোটিপতি ছিলেন, কিন্তু তিনি দারিদ্রের আদর্শের বিষয়ে কথা বলতেন। সেনেকা ক্ষমা চেয়েছিলেন যে মন্তব্যের দ্বারা: 'আমি নিখুঁত নই, কখনো হতেও পারবো না, কারণ আমি সব ধরণের মন্দতার মাঝে ডুবে রয়েছি। আমি কেবল দুষ্টদের চেয়ে ভাল হওয়ার ও প্রতিদিন উৎকর্ষতা লাভ করার আশা করি।' তার বিষয়ে থমাস কার্লাইল লিখেছিলেন: 'খ্যাতিমান সেনেকা, যিনি নিরোর বিপক্ষে না গিয়েও সত্যের পক্ষ্যে দাঁড়াতে ব্যাকুলভাবে আকাঙ্খিত ছিলেন, সম্ভবত নথি অনুযায়ী তিনিই শুধুমাত্র এমন ব্যক্তি হিসেবে রয়ে গেছেন যার মধ্যে অতি সুন্দরভাবে সবকিছু সমানুপাতিকভাবে

রয়েছে, আর যিনি যুক্তি উপস্থাপনে নিখুঁত-তর।’ সেনেকা নৈতিকতা বিষয়ক অনেক কিছু লিখেছিলেন ও চিঠি লিখেছিলেন। গ্রীকদের অনুকরণে তিনি নয়টি বিয়োগান্তক নাটক লিখলেও, ওগুলো কেবল পড়াই হতো, কখনো অভিনয় করা হয়নি। ১ম রাণী এলিজাবেত, ১৪তম লুইস, নেপোলিয়ন, শেক্সপিয়ার এবং মিল্টনের মত খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বরা তার লেখার প্রশংসা করেছিলেন। ফরুগিয়ার হাইরাপলিসের প্রাক্তন খোঁড়া দাস এপিকটেটাস (৫০-১৩৮ খ্রীষ্টাব্দ), তার জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে আরও বেশি প্রশংসিত হয়েছিলেন। তিনি সম্রাট নিরোর দেহরক্ষী, ইপাফ্রোডিটাসের অধীনে কাজ করতেন। দাসত্ব থেকে মুক্তির পর তিনি বৈরাগ্যবাদী দার্শনিক হয়ে উঠেছিলেন। যখন সম্রাট ডমিশিয়ান দার্শনিকদেরকে রোম থেকে বিতাড়িত করেছিলেন, তখন প্রায় ৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এপিরাসের (আলবেনিয়া) নীকপলিতে দর্শনের একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তার দর্শনের শ্রোতা ছিলেন ভবিষ্যত সম্রাট হাড্রিয়ান। এপিকটেটাস তার লেখায় তেমন কোন কিছু না রেখে গেলেও, তার ছাত্র আরিয়ান তার লেখাগুলোকে “Diatribai” (বক্তৃতা) এবং “Encheiridion” (সারগ্রন্থ) নামক বইতে সংরক্ষণ করেছিলেন।

[সম্রাট ও দার্শনিক মার্কাস অরেলিয়াসের মূর্তি– ধ্যানের উপর তার লেখাগুলোকে এখনো অনেক সম্মান করা হয়।]

এপিকটেটাস সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসকে (১২১–১৮০ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভাবিত করেছিলেন এবং অষ্ট্রিয়ার মার্কোমানির লোকদেরকে আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রচারণা চলাকালীন, তিনি সম্রাটের বিখ্যাত বৈরাগ্যবাদী ধ্যান বিষয়ক মতবাদকে সংরক্ষণ করেছিলেন। তিনি নিজেকে লিখেছিলেন: ‘নিজের কাছে এটি বলার মাধ্যমে সকাল শুরু কর– আমি অন-ধিকারচর্চাকারী, অকৃতজ্ঞ, অহঙ্কারী, প্রতারক, পরশ্রীকাতর, অসামাজিক লোকদের সাথে দেখা করব .....। আমি তাদের করো দ্বারা আহত

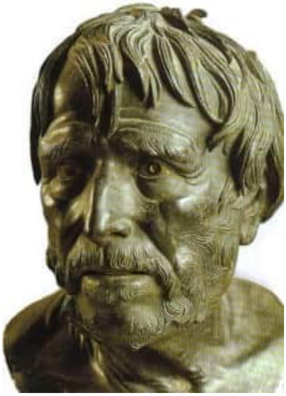

[সেনেকা, সম্রাট নিরোর গৃহশিক্ষক]

[রিথিমনোন সমুদ্রবন্দর, ক্রীট দ্বীপের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। ক্রীটীয়েরা গ্রীক কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।]

হতে পারি না কারণ যা কুৎসিত তা কেউ আমার উপর প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, না আমি পারি আত্মীয়-স্বজনের সাথে রাগ করতে, না পারি ঘৃণা করতে।' এই ধরণের প্রচন্ড আবেগ, যেমন– 'আমাদের একে অপরকে হৃদয় থেকে ভালবাসা উচিৎ' এবং 'আঘাত পাওয়ার চেয়ে আঘাত করা আরও দুঃখজনক' সত্ত্বেও– এই বৈরাগ্যবাদী সম্রাটের মনে ঐ সব খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য কোন মায়া-মমতা ছিল না, যাদেরকে তার রাজত্বকালে নির্যাতন করা হতো।

প্রেরিত পৌল ও বৈরাগ্যবাদ

কিলিকিয়ার তার্ষ শহর ছিল প্রেরিত পৌলের জন্মস্থান, জায়গাটি আন্তিপাতের ও জেনোর মত বৈরাগ্যবাদী দার্শনিকদের জন্য খুবই বিখ্যাত ছিল। প্রেরিত পৌল তার্ষের কোন 'বিশ্ববিদ্যালয়ে' অধ্যায়ন করেন নি। সম্ভবত জীবনের প্রাথমিক বছরগুলোতে, সম্ভত বারো বছর বয়সে, পৌলকে যিরূশালেমে রব্বি গমলিয়েলের কাছে শাস্ত্রীয় বিষয়ে অধ্যায়নের জন্য রেখে আসা হয়েছিল।

প্রেরিত পৌল গ্রীক ভাষায় কেবল প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তার বক্তৃতা ও

লেখাগুলোতে প্রাচীন লেখকদের শুধুমাত্র কিছু উদ্ধৃতি রয়েছে। সেই তুলনায় উন্নত গ্রীক শিক্ষায় শিক্ষিত আলেকজান্ড্রিয়ার খ্রীষ্টিয়ান লেখক ক্লীমেন্ত তার 'Exhortation to the Greeks' (গ্রীকদের জন্য উপদেশ) নামক বইয়ে হোমারের লেখা থেকে ৩৩ বার ও ইউরিপাইডের লেখা থেকে ৯ বার উদ্ধৃত করেছিলেন। প্রাচীন গ্রীক লেখাগুলো থেকে পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে, কেবল তিনটি সুনিদিষ্ট উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যায়। করিন্থীয়দের কাছে চিঠি লিখতে গিয়ে প্রেরিত পৌল মিনান্দারের (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪২–২৯২) 'থেইস' থেকে উদ্ধৃতি করেছিলেন, 'মন্দ সঙ্গীরা সৎ চরিত্রকে নষ্ট করে' (১ করিন্থীয় ১৫:৩৩)। এই প্রাচীন লেখক মিনান্দার প্রায় একশতটির মত তথাকথিত মিলনান্তক নাটক লিখেছিলেন, যেগুলোর রোমাঞ্চকর রূপরেখাগুলো ছিল বাঁধাধরা। প্রেরিত পৌলকে নাট্যমঞ্চে গিয়ে এই সব অভিনয় দেখতে হয়নি, কারণ এই উদ্ধৃতিগুলো শেক্সপিয়ারের 'To be or not to be' (হবে কি হবে না) উক্তির মতই সাধারণ জ্ঞান হিসেবে প্রচলিত ছিল।

তীতের কাছে প্রেরিত পৌলের চিঠিতে, দুষ্ট ক্রীটীয়েদের মোকাবিলা করার জন্য তিনি তার সাহায্যকারীকে প্রস্তুত করেছিলেন তাদের স্থানীয় কবি এপিমেনিড্‌সের 'De Oraculis' কবিতার একটি বিখ্যাত ধাঁধাকে উদ্ধৃত করার মাধ্যমে: 'ক্রীটীয়েরা সব সময়ই মিথ্যাবাদী, হিংস্র জানোয়ার এবং অলস পেটুক হয়ে থাকে।' এই উদ্ধৃতিটির মূল প্রসঙ্গটি হলো: 'হে আমার মহৎ ও সবোৎকৃষ্ট সন্তান, তারাই তাদের কবর প্রস্তুত করেছে কারণ ক্রীটীয়েরা সব সময়ই মিথ্যাবাদী, হিংস্র জানোয়ার এবং অলস পেটুক। কিন্তু তুমি তাদের মত মরে যাও নি, বেঁচে আছো এবং অনন্তকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত।' ক্রীটীয়েরা এই মত পোষণ করতো যে, তাদের ডিক্টায়েন গুহায় জেউসের জন্ম ও মৃত্যু হয়েছিল। উল্লেখিত কবিতার মধ্যে নিহিত ধাঁধার অর্থ এই যে, যে লেখক বলছেন, ক্রীতিয়েরা মিথ্যাবাদী, তিনি নিজেই এক জন ক্রীটীয়। তাই তিনি অবশ্যই এক জন মিথ্যাবাদী: তিনি যা কিছু বলেছেন, তা মিথ্যা এবং ফলশ্রুতি হিসেবে প্রমাণিত হয় যে, ক্রীটীয়েরা মিথ্যাবাদী ছিল না!

যখন প্রেরিত পৌল এথেন্সে যান, তিনি তখন আরেয়পাগের রাজসভায় প্রচার করেন। আর এই আরেয়পাগ (মার্স হিল) ছিল অ্যাক্রোপলিসের নীচে অবস্থিত একটি অনুচ্চ পাহাড়, যেটিকে প্রাচীন এথেন্সের সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু প্রেরিত পৌলের সময়ে, আরেয়পাগের আদালত বসতো রাজকীয় স্টোয়াতে– যেখানে সক্রেটিসের বিচার করা হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকারীরা এথেন্স-পাইরেইয়াস রেল লাইনের সামান্য উত্তরে সম্প্রতি এই জায়গাটির সন্ধান পেয়েছেন।

তাই প্রেরিত পৌল যখন প্রচার করতেন, তখন শ্রোতাদের দলে বৈরাগ্যবাদী ও

ইপিকুরেয় উভয় থাকতেন। তিনি তার বক্তৃতায় একটি বাক্যাংশ উদ্ধৃত করেছিলেন, ‘আমরাও তাঁর সন্তান,’ যেটিকে সম্ভবত নেয়া হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ২৭০ সালে কিলিকিয়াতে বসবাসকারী কবি আরাতুসের ‘ফেনোমিনা’ কবিতা থেকে (এই বাক্যাংশটি জিউসের প্রশংসাগীতে ক্লিন্থেসের দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছিল)। প্রেরিত পৌল এই পঙক্তির প্রথম অংশের মন্তব্যে বলেছিলেন, ‘কারণ আমরা তাঁর মাঝে বেঁচে থাকি, এগিয়ে চলি এবং আমাদের অস্তিত্ব টিকে থাকে।’ এই একই লাইনটি প্রতিধ্বণিত হয় ক্লিন্থেসের লেখায় এবং এপিমেনিডেসের একই কবিতা থেকে তীতের কাছে উদ্ধৃত করা হয় এভাবে, ‘আমরাও তাঁর মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকি, এগিয়ে চলি এবং আমাদের অস্তিত্ব টিকে থাকে।’

প্রেরিত পৌল স্টোয়িক (গ্রীক বৈরাগ্যবাদী) শব্দ ‘অটারকিয়া’ দুই বার ব্যবহার করেছিলেন (২ করিন্থীয় ৯:৮; ১ তীমথিয় ৬:৬), কিন্তু তা স্টোয়িক অর্থ অনুযায়ী স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীলতার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নয়। বরং, তিনি আবারও শব্দটির অর্থ প্রকাশে বাধা দিয়ে ঈশ্বরের পর্যাপ্ততা সহকারে যে আত্মতৃপ্তি, তাকে ইঙ্গিত করেছেন।

প্রেরিত পৌলকে যখন করিন্থে গ্রেফতার করা হয়, তখন সেনেকার ভাই শাসনকর্তা গাল্লিয়োর সামনে তাকে নিয়ে আসা হয়। দেলফিতে পাওয়া একটি শিলালিপি শাসনকর্তা গাল্লিয়ো ও তার সময়কাল ৫২ খ্রীষ্টাব্দকে নির্দেশ করে, যার দ্বারা প্রেরিত পৌলের করিন্থে অবস্থানকাল সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। মতবাদের দিক থেকে প্রেরিত পৌলের সাথে সেনেকার সাক্ষাতের কথা শোনা গেলেও, তাঁদের এই ধরণের সাক্ষাতের কোন প্রমাণ নেই। যাহোক, ৩য় শতাব্দীতে অসংখ্য ধারাবাহিক চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলো সেনেকা ও প্রেরিত পৌলের মধ্যকার চিঠি– পত্রের পারস্পরিক আদান-প্রদান চক্রকে ইঙ্গিত করে। খ্রীষ্টিয়ান নেতা জেরোম (৩৪৮–৪২০ খ্রীষ্টাব্দ) চিঠি-পত্রের এই বিষয়কে সত্য বলে মনে করেছিলেন এবং যার ভাষায় স্টোয়িক দার্শনিক সেনেকা ছিলেন, ‘আমাদের নিজের সেনেকা’।

বৈরাগ্যবাদী (স্টোয়িক) শিক্ষা

বৈরাগ্যবাদীরা সর্বেশ্বরবাদী ছিলেন। তারা শিক্ষা দিতেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মান্ড এক জন দেবতার দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। তিনি তার সত্তা ‘বুদ্ধিসম্পন্ন জ্বলন্ত প্রশ্বাস’ থেকে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। অথবা, এক জন আধুনিক লেখক যেভাবে এর বর্ণনা দিয়েছেন, ‘একটি উৎকৃষ্ট ও বুদ্ধিবৃত্তিক গ্যাস’। যদিও স্টোয়িক দেবতা ছিল নৈর্ব্যক্তিক। তবে ক্লিন্থেস ও এপিকটেটাসের মত দার্শনিকরা তাকে ‘জেউস’ বলে সম্বোধন করেছিলেন। বৈরাগ্যবাদ সব জনপ্রিয় ধর্মীয় ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক ধারণাগুলোকে তার নিজের মধ্যে ধারণ করে এবং এগুলোকে রূপক হিসেবে ব্যাখ্যা

করতে সক্ষম হয়েছিল।

বৈরাগ্যবাদীরা বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ নিজে ও বিশেষত তার মন হলো স্বর্গীয়। নিজের বুকের মধ্যে থাকা আত্মার উপাসনার মাধ্যমে সুখ লাভের বিষয়ে মার্কাস অরেলিয়াস দৃঢ়বদ্ধ ছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুরূপ হয়ে তাঁর যত্নবান ও নিয়ন্ত্রণকারী হাতে তুলে দেয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে তাল মিলিয়ে বেঁচে থাকাই ছিল বৈরাগ্যবাদীদের লক্ষ্য। তিনি তার নিজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য প্রাণপণ করেছিলেন, যা হতাশাবাদীদের একটি প্রিয় ধারণা, এবং কামনা-বাসনাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

এপিকটেটাসের মতে, দুশ্চিন্তা নিয়ে অনেক প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন কাটানোর চেয়ে, ক্ষুধায় মারা যাওয়া এবং কষ্ট ও ভয় থেকে মুক্তি পাওয়া অনেক ভাল– নিজে অসুখী হওয়ার চেয়ে সন্তানের আনন্দিত হওয়া অনেক ভাল। ‘যদি তুমি তোমার সন্তান বা স্ত্রীকে চুমু দেও, তবে তাদেরকে বল যে, এটি এক জন মানুষ, যাকে তুমি চুমু দিচ্ছো; যদি তোমার স্ত্রী বা সন্তান মারা যায়, তবে তুমি দুশ্চিন্তিত হয়ো না।’

বৈরাগ্যবাদীরা আত্মহত্যাকে মানব স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বলে মনে করতেন। মানুষের অমরত্বের বিষয়ে হয় তারা অজ্ঞেয়বাদী অথবা উদাসীন ছিল। তারা বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবী শেষ হয়ে গেলে, আত্মা সেই আত্মার জগতে আবারও গৃহীত হয়।

ভোগবাদীরা

যখন প্রেরিত পৌল এথেন্সে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তখন যারা সেখানে প্রধান হেলেনীয় দর্শনের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তারাই ছিলেন ইপিকুরেয় বা ভোগবাদী দলের সদস্য। সামোসের ইপিকুরাস (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪১–২৭০) মিতুলীনীর লিসবসের দ্বীপে খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০ সালে যারা স্নায়োবিক সমস্যা ও হতাশা জনিত কারণে ভুগছিলেন, তাদের জন্য একটি স্বাস্থ্যনিবাস নির্মাণ করেছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৬ শতাব্দীতে এথেন্সে এসে, সেখানে একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন, যাতে বাগান সুবিন্যস্ত করার জন্য মেয়েদের ও দাসদেরকে নিয়ে আসা হয়।

আর ইপিকিউরাস অ্যবডেরার ডেমোক্রিটাসের (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬০–৩৭০) ধারণাকে বেছে নিয়েছিলেন, যিনি এই মত পোষণ করতেন যে, পৃথিবী ও এর মাঝের সব কিছু অদৃশ্য ক্ষুদ্রতম পরমাণুর আকস্মিক সমন্বয়ের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল। যদি দেবতাদের অস্তিত্ব থাকে, তবে তারা অনেক দূরে রয়েছেন এবং মানুষের বিষয়ে তাদের তেমন

কোন আগ্রহ নেই। তাই আমাদেরকে সব ধরণের কুসংস্কার ও মৃত্যু বিষয়ক ধারণা থেকে মুক্ত থাকা উচিৎ।
পাকস্থলী ও মূত্রগ্রন্থির সমস্যাজনিত রোগে ভুগতে থাকা ইপিকুরাস এই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, মানুষের উচিৎ নম্রতা ও শান্তির অনুসন্ধান করা। মানুষের জীবনের শান্তি– কষ্ট থেকে মুক্ত থাকা, নিরব দুর্বোধ্যতা ও বন্ধু-বান্ধবদের দ্বারা বেষ্টিত থাকার উপর নির্ভর করে। ইপিকুরাসের লক্ষ্য মাংসিক সুখভোগ হলেও তিনি প্রেয়োবাদী হওয়া থেকে দূরে থাকতেন। তিনি তার মন্তব্যে বলেছিলেন, 'যৌন সুখভোগের আনন্দের দ্বারা মানুষের কোন উপকার হয় না এবং এক্ষেত্রে তার যদি কোন ক্ষতি না হয়, তবে সে ভাগ্যবান।'

আর যখন তার প্রবর্তিত শিক্ষা রোমে পোঁছায়, তখন রোমের উচ্চতম রাষ্ট্রীয় পরিষদের লোকদেরকে 'আনন্দ' উপভোগ বিষয়ক শিক্ষা দেয়ার জন্য খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৩ সালে দুই জন ইপিকুরীয় দার্শনিককে নিষিদ্ধ করেন। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ইপিকুরীয় ধারণাগুলোর প্রতিফলন ঘটেছিল 'জিনিসের প্রকৃতির উপর' নামে লিউক্রিটাসের (খ্রীষ্টপূর্ব ৯৮–৫৫) অসাধারণ কবিতায়। তিনি লিখেছিলেন:

'অপেক্ষাকৃত ছোট নয় যে আত্মা, তা চারদিকে ঝরে পড়ে
ও খুব দ্রুত অদৃশ্য হয়ে হারিয়ে যায় অনেক দূরে,
খুব দ্রুত মিশে যায় সে প্রকৃতির মাঝে;
আর সে ফিরে আসে তার আদিম শরীরে,
যখন মানুষের সদস্য পদ থেকে তাকে
সরিয়ে নেয়া হয়, তখন সে চলে যায়।'

ইপিকিউরীয়রা বা ভোগাদীরা কখনো অমরত্বে বিশ্বাস করে না। তাদের কাছে পুনরুত্থান বিষয়ক ধারণা খুবই হাস্যকর। মৃত্যুর বিষয়ে তারা বিশ্বাস করতেন যে, যে পরমাণু সমন্বয়ে মানবদেহ তৈরি হয়েছিল, মৃত্যুর পরে তারা আবার তাদের আগের অবস্থায় ফিরে যায়। আবিস্কৃত একটি ইপিকুরীয় সমাধির শিলালিপিতে দেখতে পাওয়া যায়: 'আমি ছিলাম না, আমি ছিলাম, আমি নেই– তাতে আমার কিছু আসে যায় না।' ক্রুদ্ধ ইপিকুরীয়রা তাদের যৌক্তিক সিদ্ধান্তকে আরেকটি সমাধি-লিপিতে তুলে ধরেছিলেন: 'খাও, দাও, ফূর্তি করো, এখানে এসো।' আর এই উক্তি প্রেরিত পৌলের উদ্ধৃতির খুব কাছাকাছি: "এসো, আমরা ভোজন পান করি, কেননা আগামীকাল মারা যাব" (১ করিন্থীয় ১৫:৩২)।

ইপিকুরীয় বা ভোগবাদী শিক্ষা খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য। যেরোমি দাবী করেছিলেন যে, অতিরিক্ত নেশা জাতীয় পানীয় পান করে লিউক্রিটিয়াস ভারসাম্যহীনতায় ভুগছিলেন। এভাবে ভোগবাদীরা তাদের চিন্তাধারা

গ্রীক দর্শন

[ইতালীয় রেনেসাঁ শিল্পী রাফায়েলের চিত্রকর্মে গ্রীক দার্শনিকদের স্কুল 'দ্য স্কুল অফ এথেন্স' ।]

ধীরে ধীরে ২য় ও ৪র্থ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়কালকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল।

মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মসমূহ

‘নিকটপ্রাচ্য’ একটি ভৌগলিক শব্দ, যা মোটামুটিভাবে– পশ্চিম এশিয়া, তুরস্ক (আনাতোলিয়া ও পূর্ব থ্রেস) এবং মিশর (এশিয়ার সিনাই উপদ্বীপ সহ যার বেশিরভাগ অংশ উত্তর আফ্রিকাতে অবস্থিত) একটি আন্তঃমহাদেশীয় অঞ্চলকে চিহ্নিত করে। এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের যথাযথ তথ্যনির্ভর বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও শব্দটি মূলত খুবই প্রাচীন অটোম্যান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিকে নির্দেশ করতে ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে ইংরেজী ভাষায় শব্দটির অপব্যবহারে ‘নিকটপ্রাচ্য’ কথাটি ‘মধ্যপ্রাচ্যের’ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, যা মিশর, পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ ককেশাস পর্বতকে এর অংশীভূত করে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির মতে, নিকটপ্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্য শব্দটির দ্বারা একই অঞ্চল সমূহকে বোঝানো হয়েছে এবং এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো হলো– আরব উপদ্বীপ, সাইপ্রাস, মিশর, ইরাক, ইরান, ইস্রায়েল, জর্ডান, লেবানন, ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও আফগানিস্তান।

[মধ্যপ্রাচ্য বা প্রাচীন নিকট প্রাচ্য]

মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মসমূহ

রোমীয় লেখক জুভেনাল বলেছিলেন, 'টাইবার নদীতে পড়া লেবাননের ওরন্টস নদীর পলি ও কাদা মাটির সাথে বাড়তি মাত্রা হিসেবে আসা স্রোতময় কলধ্বনি যেন বীণা ও খঞ্জনির এক বেসুরো ঐকতান'। উল্লেখিত উক্তির আলোকে বলতে হয় যে, পলি ও কাদা মাটির মত নিকটপ্রাচ্য থেকে আসা সব ধরণের উপনদী রোমীয় জীবনের প্রধান ধারার সন্তুষ্টির জন্য ঢালা হতো। আনন্দময় রীতিনীতির উদ্‌যাপন ও ব্যক্তিগত অমরত্বের প্রতিশ্রুতি সহ মধ্যপ্রাচ্যের রহস্যময় ধর্মগুলো রোমীয়দের কাছে এক বিশেষ আবেদন রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

সিবিলস

রোমীয় পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে জানা যায় যে, নেপলসের কাছাকাছি কামায়তে বসবাসকারী মহিলা ভাববাদী সিবিলস রোমীয় পূর্বপুরুষদের এক জন বীর, এনিয়াসের ভবিষ্যৎ জীবনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আর 'লিব্রি ফাটালেসে' সংরক্ষিত তার এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা (খ্রীষ্টপূর্ব ৫০৯ শতাব্দীতে রোমীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে) গর্বিত ও সর্বশেষ এট্রাসস্কান রাজা তার্কুইন জানতে পেরেছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

আপল্লো ও হেকেটের আসল ধর্মযাজিকা পশ্চিম তুরস্কের মার্পেসোস অথবা এরিথ্রে থেকে এসেছিলেন। তাকে কামায়তে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং এটি ছিল ইতালিতে গ্রীকদের সর্বপ্রাথমিক পর্যায়ের উপনিবেসগুলোর একটি, যা খ্রীষ্টপূর্ব ৭২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তার উত্তরসূরীরা পাহাড়ের গুহাতে বাস করতো, যেটি পাথরের পাহাড় কেটে সেটির সম্মুখভাগ থেকে ৪০০ ফুট (১২২ মিটার) পর্যন্ত ভিতরের দিকে প্রশস্ত করা হয়েছিল। এক সময় সিবিল গভীরভাবে সম্মোহিত হয়ে পড়েন এবং দ্রুত ও অস্পষ্টভাবে তার দৈববাণী উচ্চারণ করতে থাকেন, যা পরবর্তীতে ছন্দবদ্ধভাবে কবিতার আকারে অনুবাদ করা হয়। অন্যদিকে ঐ দৈববাণীগুলোকে লিখে, তা রোমে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং সেখানকার মহাবিদ্যালয়ের পুরোহিতরা ওগুলো দেখাশোনা করেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ঐ দৈববাণীগুলোর অনুলিপিগুলো ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল।

এই দৈববাণীর মধ্য দিয়ে গ্রীক দেবতাদের ও তাদের ইতালীয় প্রতিমূর্তিগুলোর একীকরণ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেবতাদের প্রবর্তনের উপর অনুমোদন দেয়া হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯৬ সালে, গ্রীক দেবী ডিমেতার ও তার মেয়ে পার্সিফোনীকে ইতালীয় সেরেস ও লিবেরা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ২৯৩ সালে মহামারির সময়, এক দৈববাণীর মাধ্যমে গ্রীক রোগ-আরোগ্যকারী দেবতা আসক্লিপিয়সকে (রোমীয়

এয়িসক্লুপিয়াস) রোমে নিয়ে আসার পরামর্শ দেয়া হয়।

‘মহান মাতা’

যখন হ্যানিবাল ইতালি আক্রমণ করেন, তখন রোমীয়রা নিজেদেরকে এক খুবই হতাশাব্যঞ্জক অবস্থায় আবিস্কার করে কারণ তাদের নিজেদের সৈন্যরা কার্থাজিনীয়দের সমকক্ষ ছিল না। আর ঐ সময় সিবিলীয় দৈববাণী এশিয়া মাইনর অঞ্চল থেকে ‘মহান মাতা’ সাইবেলের প্রতিমূর্তিকে নিয়ে আসার পরামর্শ দেয়। তার-পর খ্রীষ্টপূর্ব ২০৪ সালে এই মহান মাতাকে উপাসনার বস্তুগত চিহ্ন হিসেবে রোমের প্যালাটাইন পাহাড়ের পবিত্র বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত মন্দিরে মহাকাশ থেকে পতিত একটি কাল পাথর দেয়া হয়। তবে বৈদেশিক দেবতাদের মূর্তিগুলোকে মন্দিরের ঐ বেষ্টনীর বাইরে রাখা হয়।

সাইবেলেকে সচরাচর দুই পাশে সিংহ শোভিত সিংহাসনে বসা অবস্থায় চিত্রিত করা হয়– ইনি ছিলেন খুবই প্রাচীন এক দেবী এবং তার একটি মূর্তি (সময়কাল: খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০০) কাতাল হুয়ুতে আবিস্কৃত হয়েছে। ল্যাটিন কবি ওভিডের মতে, সাইবেলে যুবক রাখাল আট্টিসের প্রেমে পড়েছিলেন। কিন্তু যখন আট্টিস তার কাছে অবিশ্বস্ত প্রমাণিত হয়ে এক পরীর প্রেমের মোহে পড়েন, তখন সাইবেলে ঐ পরীকে হত্যা করেন। আর আট্টিস নতুন প্রেমিকাকে হারিয়ে উন্মত্তপ্রায় হয়ে, নিজেকে খোজা করে ফেলেন। এই কারণে, সাইবেলে ও আট্টিস (গাল্লি) অনুরাগীদেরকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ধর্মগোষ্ঠীর পুরোহিতরা নিজেরা নিজেদেরকে খোজা করে রাখতেন। খ্রীষ্টপূর্ব ১০২ সাল পর্যন্ত রোমীয়দের এই ধর্মগোষ্ঠী ভুক্ত হওয়া নিষিদ্ধ ছিল– কিন্তু সম্রাট ক্লৌদিয় এই নিষেধাজ্ঞাকে উঠিয়ে দেয়ার পরে, এক জন রোমীয় এই ধর্মগোষ্ঠীর প্রধান পুরোহিত হয়েছিলেন।

সাইবেলে, দেবতাদের ‘মহান মাতা’

এই কাল্ট ধর্মগোষ্ঠী ও মিথ্রাইজম ধর্মে একটি রক্তাক্ত প্রথাগত আনুষ্ঠানিকতা ব্যবহার করা হতো। এই ধর্মমতে

দীক্ষিত হওয়ার প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে আগ্রহী ব্যক্তিকে একটি গর্তের মধ্যে দাঁড় করিয়ে তার উপর একটি ষাঁড়কে হত্যা করে তাকে উষ্ণ পশুর রক্তে সিক্ত করা হতো। এক্ষেত্রে আবার কখনো কখনো ষাঁড়ের পরিবর্তে ভেড়া ব্যবহার করা হতো।

'মেগালেনসিয়া' নামে এই ধর্মগোষ্ঠীর একটি উৎসব ছিল, যা বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হতো। উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল অনুসারীদের গাল্লি শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ। আর শোভাযাত্রা চলাকালীন অংশগ্রহণকারীরা ঢোল ও করতাল বাজিয়ে, চাবুক দিয়ে নিজেদের দেহে আঘাত করতো কারণ আট্টিসের মৃত্যুকে স্মরণ করে তারা বিলাপ করতো। ২য় খ্রীষ্টাব্দে পুনরুত্থিত হওয়ার ধারণাকে আট্টিসের ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবর্তন করা হয়।

ইফিষের দেবী আর্তেমিস/ দীয়ানা

ইফিষের দেবী আর্তেমিসের (দীয়ানা) মন্দিরকে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য হিসেবে মনে করা হতো। ইফিষের আর্তেমিস ছিলেন এশিয়া মাইনর অঞ্চলের জমির উর্বরতা বিষয়ক দেবী, যাঁর সাথে গ্রীক শিকারের দেবী আর্তেমিসের কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়। ইফিষের দেবী আর্তেমিসের মূর্তির গলায় কন্দাকার উপকরণের সারি শোভা পেতো, যেগুলোকে প্রায়ই অসংখ্য নারী স্তনের সমারোহ বলে মনে করা হতো। তবে জমির উর্বরতার চিহ্ন হিসেবে, এগুলো উট পাখির ডিম হওয়ার সম্ভবনাই বেশি।

[দেবী দীয়ানা।]

ইফিষীয় স্বর্ণকাররা দেবী আর্তেমিসের মূর্তি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতো বলে, সেখানে প্রেরিত পৌলের উপস্থিতি তাদের জীবিকায় বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল বলে, তারা হতাশ হয়ে পড়েছিল (প্রেরিত ১৯:২১-৪১)। তাই ২৫,০০০ বিক্ষুব্ধ ইফিষীয়দের বিশাল একটি দল ঐ সময় 'ইফিষীয়দের দেবী আর্তেমিসই মহান' এই

ধ্বণি তুলে জনসভা-মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিল। আরেক বার দেবী আর্তেমিসের জন্য পোশাক নিয়ে এসেছিল এমন দূতদের সাথে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে পয়তাল্লিশ জন সার্দীয় অধিবাসীকে দোষীসাব্যস্ত করে এই অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।

আইসিস ও সেরাপিস

রোমীয় ঐতিহাসিক প্লুটার্খ বলেন যে, প্রাচীন মিশরীয় পৌরাণিক কাহিনীতে উল্লেখিত দেবতা ওসিরিসকে তার ভাই শেথ হত্যা করেন। তিনি তাকে বাক্সের ফাঁদে আটকিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেন। ওসিরিসের স্ত্রী তার মৃতদেহ বিব্লোসে (লেবানন) খুঁজে পেয়ে, জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। কিন্তু তারপর শেথ ওসিরিসকে কেটে চৌদ্দটি টুকরো করেন। আইসিস আরও একটি বার ওসিরিসকে পুনর্জ্জীবিত করেন এবং এরপর তিনি মৃতদের রাজা হন।

রোমীয় রাজা ১ম টলেমী (খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩-২৮৫) প্রজাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে, আইসিসের নতুন সঙ্গী হিসেবে সেরাপিস নামে এক মিশরীয়-গ্রীক মিশ্র দেবতা তৈরি করেন। তাকে গ্রীক দেবতাদের রাজা জেউসের অনুরূপ মুখমন্ডল দিয়ে চিত্রিত করা হয়। যাহোক, আইসিস গ্রীক ও রোমীয় জগতে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০ সালে এথেন্সে টিকে থাকা ধর্মগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আইসিসের ধর্মগোষ্ঠী ছিল অন্যতম জনপ্রিয় এবং এই জনপ্রিয়তার প্রতিফলন হিসেবে লোকেরা তাকে ‘ইসিডোর’ (আইসিসের উপহার) নামে ডাকত।

[আইসিস ও সেরাপিস এবং তাদের মাঝে পাতালের অভিভাবক হিসেবে রয়েছে তিন মাথাওয়ালা কুকুর, সারবেরাস।]

মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মসমূহ

খ্রীষ্টপূর্ব ১০৫ সাল পর্যন্ত ইতালির পুটেওলি ও পম্পেতে আইসিসের ধর্মমতের প্রবর্তন করা হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮ ও ৪৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে রোমের উচ্চতম রাষ্ট্রীয় পরিষদ মিশরীয় ধর্মগোষ্ঠীকে বিতাড়িত করার চেষ্টা চালান। সম্রাট আগস্তও পরবর্তীতে একই প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। ১৯ খ্রীষ্টাব্দে এক জন রোমীয় আনুবিস দেবতার ছদ্মবেশ ধারণ করে আইসিসের মন্দিরে এক জন স্ত্রীলোককে ধর্ষণ করে। আর শাস্তি হিসেবে, সম্রাট টাইবেরিয়াস আইসিসের মূর্তিকে টাইবার নদীতে নিক্ষেপ করেন এবং তার পুরোহিতদেরকে ক্রুশারোপিত করে হত্যা করেন।

রোমীয় সম্রাট ক্যালিগুলা (১২-৪১ খ্রীষ্টাব্দ) আইসিসের ধর্মমতকে সমর্থন করেন। তার রাজত্বকালে রোমের মার্টিয়াস এলাকায় আইসিস ও সেরাপিসের সুবিশাল মন্দির নির্মাণ করা হয়। সম্রাট ডমিশিয়ান ও কমোডাস উভয়েই ঐ দেবীকে একইভাবে সম্মান করতেন।

আইসিসকে প্যান্থিয়া বলে ডাকা হতো এবং তার উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রশংসা-গানে তাকে অন্য দেব-দেবীদের সব গুণাবলীর কৃতিত্ব দেয়া হতো: ‘আমি নদী, বাতাস ও সমুদ্রের রাণী। আমি যুদ্ধের রাণী; আমি বজ্রের রাণী।’ সমুদ্রের রাণী হিসেবে, তিনি প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানের উপর পৌরহিত্য করতেন, যা ৫ই মার্চে সমুদ্রযাত্রার মৌসুমের সূচনার ইঙ্গিত দিতো।

আপুলিয়াসের (১৫০ খ্রীষ্টাব্দ) গল্পে উল্লেখিত– ‘মেটামর্ফোসিস’ অথবা ‘স্বর্ণের গাধা’ দেবী আইসিসকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া ধর্মমতের গুরুত্বকে তুলে ধরে। এই গল্পের বীর লুসিয়াস যাদুর দ্বারা একটি গাধায় পরিণত হয়েছিলেন এবং যিনি আইসিসের দয়ায় আবার মানব জীবন লাভ করেন।

মিশরীয় ধর্মানুষ্ঠানগুলো ছিল খুবই অদ্ভুত ও রঙিন– যেখানে আয়োজিত শোভাযাত্রায় সাদা মসীনার পোশাক পরা, মুন্ডিত মাথার পুরুষ পুরোহিতদের ও ঝুমঝুম শব্দ সহকারে মহিলা পুরোহিতদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেতো। এই প্রসঙ্গে রোমীয় লেখক জুভেনাল মিশরীয় প্রাণী-দেবতাদেরকে নিয়ে বিদ্রুপ করে বলেছিলেন: ‘সর্বোচ্চ প্রশংসা কেবল কুকুর মাথাওয়ালা দেবতা আনুবিসেরই প্রাপ্য; যিনি মসীনার পোশাক পরা, মুন্ডিত মাথার সহচরদের দল নিয়ে দৌঁড়ে বেড়ান ও দুঃখ-কষ্ট পীড়িত লোকদেরকে দেখে উপহাস করেন।’

ফৈনীকিয়া ও সিরিয়ার দেবতা

গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, দেবী আফ্রোদীতি সুদর্শন যুবক এডোনিসকে ভালবাসেন এবং যুবকটি বন্য পুরুষ শূকরের আক্রমণে মারা যান। এটি বিশ্বাস করা হতো যে, প্রতি বছর তার দেহ থেকে নির্গত রক্ত বিব্লোসের (লেবানন) কাছ দিয়ে প্রবাহিত নদী 'আফকা'কে রঞ্জিত করতো। আর স্ত্রীলোকেরা আফ্রোদীতির তৈরি 'এডোনিসের বাগান' থেকে সংগৃহীত তরুগুল্মে তৈরি পোশাক পরতো। আর এডোনিসের ক্ষণস্থায়ী জীবনকে স্মরণীয় করে রাখতে এই তরুগুল্ম খুব দ্রুত পল্লবিত হয়ে মারা যেতো। রোমীয় সম্রাট হাড্রিয়ান এডোনিস-তাম্মুজকে ভিত্তি করে সৃষ্ট এই ধর্মমতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে বৈৎলেহমের একটি গুহাতে সংরক্ষিত করেন এবং ঐতিহ্য অনুসারে, এখানেই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তবে এডোনিস যে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন– এই ধারণা ২য় খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

[আফ্রোদীতি ছিলেন ভালবাসা, সৌন্দর্য ও জর্মির উর্বরতার দেবী। তার মূর্তিটি সাইপ্রাস দ্বীপে পাওয়া যায়, যার সময়কাল ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী।]

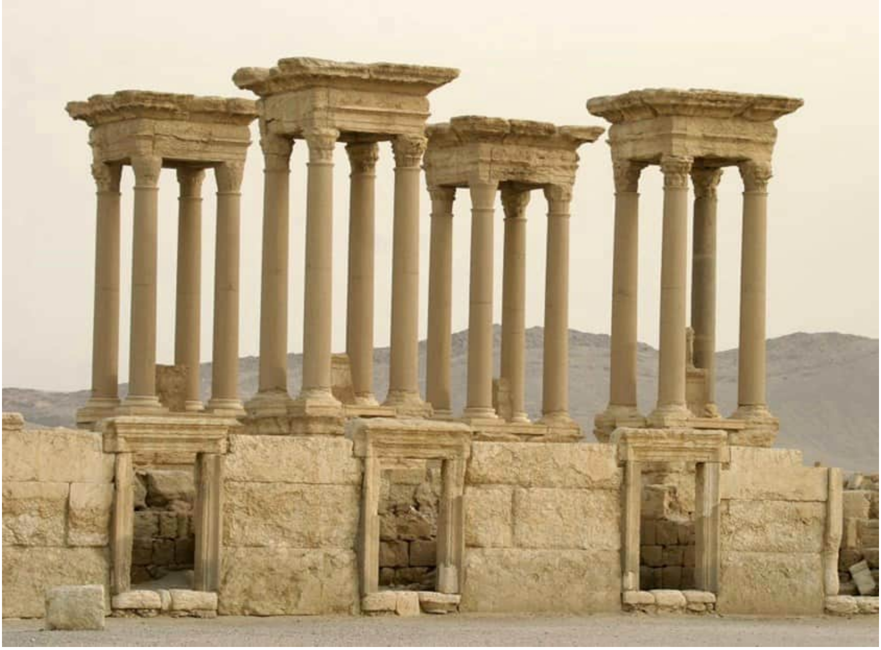

[৩য় শতাব্দীতে পালমিরা শহরকে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করা স্তম্ভসারি সজ্জিত রাস্তা।]

ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী হেরাপলিস (ব্যামবিসি) শহরের আটারগাটিস ছিলেন সিরিয় প্রধানতম দেবী। তাকে কখনো কখনো মাছের শরীরের অধিকারী মৎস-কন্যা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। আর তার সঙ্গীটি ছিলেন সিরিয় ঝড়-দেবতা হাদাদ।

আট্টিসের পুরোহিতদের মত তার পুরোহিতরাও খোজা ছিলেন। তবে দেবী আটারগাটিসের পুরোহিতেরা ছিলেন কুখ্যাত ভিখারী কারণ তারা চাবুক দিয়ে নিজেদের শরীরে আঘাত করে ভিক্ষার জন্য লোকদের মনযোগ আকর্ষণ করতো। হেলেনীয় যুগে (খ্রীষ্টপূর্ব ২য় ও ৩য় শতাব্দী) দেবী আটারগাটিস ভিত্তিক ধর্মমত দাস, ব্যবসায়ী ও সৈনিকদের দ্বারা গ্রীসে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিহাসবিদ সুয়েটোনিয়াস তার বর্ণনায় তুলে ধরেন যে, সম্রাট নিরো সব ধরণের আচার-আনুষ্ঠানিকতাকে অবজ্ঞা করতেন, কেবল দেবী আটারগাটিসের আচার-অনুষ্ঠান ছাড়া। সম্রাট আলেক্জান্ডার সেভেরাস (২২২-২৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) রোমে তার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করেন।

সিরিয় দেবতাদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় ছিলেন জুপিটার ডলিকেনাস– ইনি ছিলেন কোম্মাজিনের ডলিক শহরের (উত্তর সিরিয় উপকূল ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী

অঞ্চল) দেবতা। বজ্র ও বিদ্যুতের প্রতীক হাতে ধরে, একটি ষাড়ের উপরে দাঁড়ানো অবস্থায় তাকে চিত্রিত করা হয়েছে। ২য় ও ৩য় খ্রীষ্টাব্দে তার ধর্মমতটি বিশেষত সৈনিকদের দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে। রোমের অ্যাভেন্টাইন পাহাড়ের খুবই বড় একটি মন্দিরে তার পূজা করা হতো।

লেবাননের বাকা উপত্যকায় অবস্থিত 'বালবেক'-এর জুপিটার হেলিওপলিটেনাস ছিলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ অপর এক দেবতা। আন্তঃসংযুক্ত কাঠামোয় গড়া বিশাল আকৃর্তির ভবনটি এখনো সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে– যা রোমীয় স্থাপত্য শিল্পের বিশেষ প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। সম্রাট এন্টোনিয়াস পিয়াস, সেপ্টেমিয়াস সেভেরাস এবং কারাকাল্লা এগুলো নির্মাণ করেন। ১০৬ মিটার দীর্ঘ, করিন্থীয় স্তম্ভবিশিষ্ট জুপিটার হেলিওপলিটেনাস দেবতার জন্য নির্মিত এমন সুবিশাল মন্দির খুব কমই দেখা যায়। সঠিক ২০ মিটার উচ্চতার ছয়টি স্তম্ভ এখনো সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। বালবেকের অপেক্ষাকৃত ছোট বাক্কাসের মন্দির রোমীয়দের সংরক্ষিত সর্বোকৃষ্ট মন্দিরগুলোর মধ্যে অন্যতম।

ম্যাকাবেল, অ্যাগলিবোল ও ইয়ার্হিবোল– নামের তিন দেবতা যারা পশ্চিমে অপেক্ষা-কৃত কম পরিচিত– তাদের আবির্ভাব ঘটেছিল মরুদ্যান শহর, পালমিরা (বাইবেলে এটি 'তামর' নামে পরিচিত)। রাণী জেনোবিয়ার অধীনে এই পালমিরা ক্ষমতার দিক থেকে এতোটাই উপরে উঠেছিলেন যে, ২৭১ খ্রীষ্টাব্দে সে রোমীয় সম্রাট অরেলিয়ানের ক্ষমতা নিয়ে অভিযোগ তোলার মত দুঃসাহস দেখিয়েছিল এবং মধ্য প্রাচ্যের খুবই ব্যাপক ও হৃদয়গ্রাহী কিছু রোমীয় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তার কিছু নমুনা লক্ষ্য করা যায়। ২২৫ মিটার দীর্ঘ সুবিশাল স্তম্ভসারি বেষ্টিত অঙ্গন সহ তিন দেবতার চমৎকার মন্দিরটি এখনো পালমিরাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সম্রাট সেপ্টিমিয়াস সেভেরাসের স্ত্রী জুলিয়া ডোমনা ছিলেন সিরিয়ার সূর্য দেবতা এমিসার (হোমস) পুরোহিতের মেয়ে। তার ভাই এলাগাবালুস (২১৮-২২২ খ্রীষ্টাব্দ) মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে সম্রাট হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মেয়েলী স্বভাবের প্রেয়োবাদী– যিনি মেয়েদের পোশাক পরতেন, গোলাপের উপর দিয়ে হাঁটতেন এবং উট পাখির মস্তিস্ক খেতে পছন্দ করতেন। অল্প বয়সী সম্রাট এলাগাবালাস তার শহরের সূর্য দেবতা, এমিসাকে সাম্রাজ্যের প্রধান দেবতা হিসেবে উন্নীত করেছিলেন। তবে তার এই পরিকল্পনা খুব কমই জনপ্রিয় হয়েছিল।

অরেলিয়ান (২৭০-২৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)

সম্রাট অরেলিয়ান রাণী জেনোবিয়াকে পরাজিত করেন এবং এমেসীয় দেবতাকে ‘অপরাজেয় সূর্য’ হিসেবে আবারও তার সাম্রাজ্যে উপস্থাপন করেন ও তার জন্য রোমে এক চমৎকার মন্দির নির্মাণ করেন। শীতের সবচেয়ে স্বল্পতম দিবাভাগ (যখন নিরক্ষরেখা থেকে সূর্যের অবস্থান সবচেয়ে দূরবর্তী হয়) যে দিনটির, তার কাছাকাছি সময় হিসেবে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে মিথ্রাস নামেও পরিচিত এই দেবতার জন্মদিন পালন করা হতো। প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু মণ্ডলী ৬ই জানুয়ারী তারিখে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন পালন করলেও, ৪র্থ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্যের মণ্ডলীগুলো এই জন্ম-তারিখ ৬ই জানুয়ারী থেকে সরিয়ে ২৫শে ডিসেম্বরে নিয়ে আসেন। সম্রাট অগাস্তিন তার খ্রীষ্টিয়ান প্রজাদেরকে ২৫শে ডিসেম্বরকে সূর্য দেবতার জন্মদিন হিসেবে নয়, বরং যিনি এই সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর জন্মদিন হিসেবে পালনের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান।

[এমেসীয় দেবতা যাকে ‘অপরাজেয় সূর্য’ দেবতা বলা হতো]

মিথ্রাস

জোরাস্ট্রিয়ান ধর্ম বিষয়ক লেখাগুলোতে ও ভারতীয় বৈদিক লেখাতে পারসিক দেবতা মিথ্রাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান লাভ করেছে। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪৬ সালে পারসিকদের সাইপ্রাস বিজয়ের পর, মিথ্রাস দেবতার উপাসনা এশিয়া-মাইনর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। হেলেনীয় যুগে পন্টাস ও কমাজেনের (বর্তমান তুরস্কে অবস্থিত) রাজারা ‘মিথ্রাডেটস’ অর্থাৎ ‘মিথ্রাসের উপহার’ উপাধি ধারণ করে এই দুইটি রাজ্যকে শাসন করতেন। এটি ধারণা করা হয় যে, প্রাচীন পারসিক পুরোহিতদের সামান্য সহযোগীতার মধ্য দিয়ে এই পারসিক ধর্মমতটি সরাসরি রোমীয় রহস্যময় মিথ্রাসে পরিবর্তিত হয়েছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ৬৭-৬৫ সালে সম্রাট পম্পের কাছে কিলিকীয় জলদস্যুদের পরাজয়ের পর রোমীয় ও মিথ্রাস দেবতার উপাসকদের মধ্যে সর্বপ্রথম যোগাযোগ ঘটে। বিষয়টির

[পশু বলিদানরত দেবতা মিথ্রাস।]

আলোকে অনেক পন্ডিতরা ধারণা করেন যে, এই যোগাযোগের মধ্য দিয়ে রোমে মিথ্রাসবাদের পরিচয় ঘটে। তবে হার্কুলেনিয়াম অথবা পম্পেতে কোন মিথ্রীয় ভাস্কর্য আবিস্কৃত হয় নি। লেখক স্টাটিয়াস (৮০ খ্রীষ্টাব্দে) বিশেষভাবে ষাঁড় হত্যার বিষয়টিকে মিথ্রাসের মূল রহস্য হিসেবে ইঙ্গিত করেন।

১৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মিথ্রাস ধর্মমত দ্রুত ও ব্যাপকভাবে বিশেষত সৈন্যদের মাধ্যমে দানিয়ুব প্রদেশ এবং জার্মানি ও বিট্রেনে (বর্তমান ইংল্যান্ড) ছড়িয়ে পড়ে। গুহার মত দেখতে এই পবিত্র মন্দিরগুলোকে মিথ্রাম বলা হতো, যেগুলোতে মিথ্রাসের দ্বারা ষাঁড় হত্যার একটি মূর্তি চিত্রিত থাকতো। আর মিথ্রাসের উপাসকরা বিশ্বাস করতো যে, মিথ্রাসের এই ষাঁড় হত্যার তৎপরতা যে কোন ভাবেই হোক কেন জীবনীদায়ক শক্তিকে মুক্ত করে দেয়ার বিষয়কে প্রতিফলিত করে। নয়তো, যেভাবে এই রহস্যময় ধর্মটির লিখিত প্রমাণাদি খুব কমই পাওয়া যায়, সেভাবে এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আজও আমরা অন্ধকারেই পড়ে থাকতাম। মিথ্রামে প্রদর্শিত অন্যান্য দৃশ্যের মধ্যে

দেবতা মিথ্রাসকে একটি পাথরের মধ্য থেকে জন্ম নিতে দেখা যায়। মিথ্রাসের এই মূর্তির সাথে সব সময় 'কৌটিস ও কৌটোপেটস' নামে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দুইটি প্রতিমূর্তি থাকতো। মিথ্রাস দেবতাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া ধর্মমতে দীক্ষিতরা সচরাচর পুরুষ হত এবং তারা সাতটি পর্যায় পর্যন্ত– তখনকার সময়ে জানতে পারা সাতটি গ্রহের (সূর্য ও চাঁদ সহ) মিল রেখে উৎকর্ষতা লাভ করতে পারতো।

৩য় শতাব্দী পর্যন্ত মিথ্রাসবাদ খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দী ছিল। যদিও এটি দাবী করা খুবই অতিরঞ্জিত একটি বিষয়, তা সত্ত্বেও বলা হয় যে, সাম্রাজ্যটি যদি খ্রীষ্টিয়ানদের না হতো, তবে এটি মিথ্রাসবাদী সাম্রাজ্য হতো। কিছু কিছু জায়গাতে, যেমন– রোমের স্যান ক্লেমেন্ট ও সান্টা প্রিস্কা খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী ও মিথ্রামগুলোকে পাশাপাশি দেখা যেতো। প্রত্নতাত্ত্বিকরা সম্প্রতি ইস্রায়েল দেশের কৈসরিয়াতে একটি মিথ্রাম আবিস্কার করেন এবং এটিকে সম্রাট জুলিয়ানের রাজত্বকালের (৩৬১-৩৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) বলে মনে করা হয় কারণ তিনি এই ধর্মমতকে সমর্থন করতেন।

মিশরীয় জ্যোতিষশাস্ত্র

হার্মেটিকা হলো মিশরীয় দর্শন তথা জ্যোতিষশাস্ত্র ও দিব্যজ্ঞান বিষয়ক লেখাগুলোর খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক সঙ্কলন– আর এগুলোকে দেবতা হার্মিস ম্যাজিসটোসের দান বলে মনে করা হয়। এটি ছিল ট্রথের গ্রীক উপাধি, যাঁকে মিশরীয় জ্ঞানের দেবতা বলা হতো। 'গতানুগতিক ভাবে লিখিত' হার্মেটিকাগুলো ছিল জ্যোর্তিবিদ্যা, যাদুবিদ্যা ও মধ্যযুগীয় রসায়ন শাস্ত্র বিষয়ক এবং এদের কিছু কিছু লেখা খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীর প্রথম দিকে লেখা হয়েছিল।

আরও 'জ্ঞানসম্পন্ন' ও তাৎপর্যপূর্ণ হার্মেটিকাগুলো লেখা হয়েছিল ২য় ও ৩য় খ্রীষ্টাব্দে– ওগুলো ছিল ধর্মীয় ও দর্শন বিষয়ক এবং প্লেটোবাদ ও বৈরাগ্যবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। এই লেখাগুলো গ্রীক, ল্যাটিন ও কপটিক পান্ডুলিপিতে আজও রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে 'কোরি কসমৌ' নামের একটি পৌরাণিক কাহিনীর কথা বলা যায়– যেখানে বলা হয়েছে, মানুষের আত্মা কিভাবে শরীরের মধ্যে বন্দি থাকে এবং

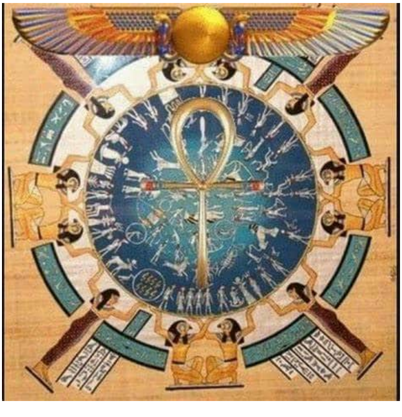

[মিশরীয় জ্যোতিবিদ্যা]

আইসিস ও ওসিরিস দেবতাদের দ্বারা মুক্ত হয়।

এর মধ্যে কিছু সংখ্যক লেখার মধ্য দিয়ে এই মত তুলে ধরা হতো যে, এক অদৃশ্য ঈশ্বরকে বোধশক্তির দ্বারা কেবল এই মহাজাগতিক সুশৃঙ্খলতার মাঝেই নির্ণয় করা সম্ভব। অন্যরা বলেন যে, ঈশ্বর 'ডেমিয়ার্গাস' নামে দ্বিতীয় মনের জন্ম দেন, এই গ্রহগুলো তৈরি করেন এবং তিনি 'সেই মানুষ'টিও তৈরি করেন, যিনি প্রকৃতির সাথে মিশে এই মানব জাতিকে তৈরি করেছেন। তাই বলা যায় যে, মানুষ এক দ্বৈত সত্তা– যার শরীর তার আত্মাকে বন্দি করে সেটিকে জ্যোতিবিদ্যা বিষয়ক ভাগ্যের অধীন করে। কিন্তু বোধশক্তি (নুস) লাভ করার মাধ্যমে মানুষ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে এবং দৈহিক ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর এভাবে এই ভাবধারায় দীক্ষিত ব্যক্তি তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় দেবতাদের সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হয়।

সম্প্রতি মিশরের নাগ হাম্মাদিতে আবিস্কৃত কপটিক লেখাগুলো ভাগ্যের বন্ধনকে ছিন্ন করা হার্মেটিক পুরোহিতদের সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃত্বকে ইঙ্গিত করে, তাদের চুমু দেয়া এবং পবিত্র ও 'রক্তশূন্য' খাবার খাওয়ার বিষয়গুলোকে তুলে ধরে।

যদিও কিছু হার্মেটিক লেখা কিছুটা জ্ঞানবাদী– তবে হার্মেটিকবাদের সৃষ্টি মন্দ বলে বিবেচনা করা হয় না এবং তথাকথিত ডেমিয়ার্গাস বা জগৎ-স্রষ্টা কোন বিদ্রোহী নন; বরং, পরম ঈশ্বরের পুত্র।

জ্ঞানবাদীরা

জ্ঞানবাদীরা ছিলেন প্রাথমিক খ্রীষ্টিয় শতাব্দীগুলোর বিভিন্ন ধরণের ধর্মীয় আন্দোলনের অনুসরণকারী, যারা এই মতের উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন যে, মানুষ এক গোপন জ্ঞান অথবা 'নোসিস' (জ্ঞানের গ্রীক প্রতিশব্দ) এর মধ্য দিয়ে মুক্তি পেতে পারে। এই আন্দোলনের সবচেয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণগুলো জ্ঞানবাদ নামে পরিচিত, যেগুলো দ্বিতীয় শতাব্দীর খ্রীষ্টিয় লেখাগুলোতে অনুপ্রবেশ করে। আর এই লেখাগুলোতে খ্রীষ্টধর্মের মতবিরোধী বিপথগামীতা লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক পন্ডিতরা জ্ঞানবাদকে ধর্মীয় আন্দোলন বলে মনে করেন, যা খ্রীষ্টধর্মের চেয়ে আরও অনেক স্বাধীন– কিন্তু কিভাবে এটি সৃষ্টি হয়েছিল, সেই বিষয়ে তারা এক মত নন। জার্মান পন্ডিতরা জ্ঞানবাদকে অপেক্ষাকৃত শিথিলভাবে সংজ্ঞায়িত করেন এবং মুক্তির জন্য যে 'জ্ঞান'-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সেখানে তারা এর আলামতের সন্ধান পান, যেভাবে মরুসাগর খ্যাত স্ক্রলের মধ্যেও পেয়েছেন। অন্য

পন্ডিতরা বিষয়টিকে আরও কঠোরভাবে সংজ্ঞায়িত করে বলেন যে, কোন লেখা জ্ঞানবাদী কিনা, সেই বিষয়ে এক মত হওয়ার জন্য– বিশুদ্ধ আত্মিক জগৎ ও বৈষয়িক মন্দ জগতের (জ্ঞানবাদের মূল নীতি) মাঝে একটি বিরোধী বিষয়কে সন্ধান করতে বলেন, যার উপর গুরুত্ব আরোপ করা যায়। তারা বিশ্বাস করেন যে, বিশ্বব্রহ্মান্ড বিষয়ক 'দ্বৈতবাদী' দৃষ্টিভঙ্গীই হলো জ্ঞানবাদের ভিত্তি।

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত, জ্ঞানবাদীদের জ্ঞান পুরোপুরিভাবে জাস্টিন মার্টার, আইরেনিয়াস, হিপ্পোলিটাস, ওরিজেন, তার্তুলিয়ান ও এপিফানিয়াসের মত খ্রীষ্টিয়ান নেতাদের উপর নির্ভর করতো। এদের কেউ কেউ আবার জ্ঞানবাদী মূল লেখার কিছু কিছু খন্ডাংশ সংরক্ষণ করেছিলেন। তবে তাদের অধিকাংশ বর্ণনাই পাল্টা যুক্তিভিত্তিক আকারে রয়েছে। তাই এই বর্ণনাগুলো কতটা সঠিক ছিল, সেই বিষয়ে পন্ডিতরা নিশ্চিত নন। সাম্প্রতিক আবিস্কারগুলো, যেমন– নাগ হাম্মাদিতে পাওয়া লেখাগুলো– প্রাথমিক পর্যায়ের খ্রীষ্টিয়ান লেখকদের যা বলা উচিৎ ছিল, সেগুলোর কিছুটা সুনিশ্চিত করে। প্রাথমিক পর্যায়ের খ্রীষ্টিয়ান লেখকরা শিমোন জাদুকরকে সকল ধর্মবিরোধীতার উৎস বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, যিনি পিতর ও যোহনের কাছ থেকে পবিত্র আত্মার অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা ক্রয় করতে চেয়েছিলেন (প্রেরিত ৮:৯-২৪)। কিন্তু প্রেরিতের কার্যবিবরণীতে তাকে এক জ্ঞানবাদী হিসেবে বর্ণনা করা হয় নি; বরং, এক জন 'ম্যাগস' অথবা যাদুকর হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। জ্ঞানবাদীদের মত না হয়ে, শিমোন নিজেকে মহাপুরুষ হিসেবে দাবী করে, এই বলে শিক্ষা দেন যে, নিজেকে জানার পরিবর্তে তাকে জানার মধ্যেই পরিত্রাণ নিহিত রয়েছে। তিনি এমনকি ঔদ্ধত্য দেখিয়ে, ট্রয়ের হেলেনের পুনর্জন্মকে এক জন পতিতা হিসেবে প্রচারের প্রয়াস পেয়েছিলেন।

মেনন্ডার নামে শিমোনের এক জন শমরীয় সঙ্গী ছিলেন, যিনি খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে, সিরিয়ার আন্তিয়খিয়াতে শিক্ষা দিতেন। তিনি তার অনুসারীদেরকে শিক্ষা দিতেন যে, যারা তার উপর বিশ্বাস করবে, তারা মারা যাবেন না। আর এটি বলার আর প্রয়োজন নেই যে, তার নিজের মৃত্যুর দ্বারা প্রমাণিত হয়, তিনি এক জন ভন্ড ভাববাদী ছিলেন।

খ্রীষ্টিয় ২য় শতাব্দীর প্রথম দিকে, আন্তিয়খিয়াতে সাতুর্নিনাস নামে এক ব্যক্তি শিক্ষা দিতেন, যিনি বিশ্বাস করতেন যে, খ্রীষ্টই পাপের উদ্ধারকর্তা। কিন্তু অন্য জ্ঞানবাদীদের মত তিনিও এই মত পোষণ করতেন যে, খ্রীষ্ট কোন বস্তুগত সত্তা নন এবং তিনি কেবল মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন।

মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মসমূহ

এশিয়া-মাইনর অঞ্চলে সেরিনথাস নামের এক জ্ঞানবাদী ব্যক্তি খ্রীষ্টিয় প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিতেন। আর এমন কি এই প্রসঙ্গে খ্রীষ্টিয়ান নেতা আইরি-নাস এক বার একটি গল্প বলেন– 'প্রেরিত যোহন ইফিষের একটি স্নানাগারে স্নান করছিলেন। আর যখনই তিনি শুনতে পান যে, সেরিনথাস সেখানে এসেছেন, তখনই তিনি ঐ জায়গা থেকে দৌঁড়ে পালিয়ে যান।' সেরিনথাস তার শিক্ষায় বলেন যে, যীশু কেবল এক জন মানুষ ছিলেন, তাঁর উপর খ্রীষ্ট কবুতরের মত নেমে এসেছিলেন। যেহেতু খ্রীষ্টের পক্ষে কষ্টভোগ অসম্ভব ছিল, তাই ক্রুশবিদ্ধ করার আগেই মানব যীশুকে ছেড়ে খ্রীষ্ট চলে গিয়েছিলেন (আর এই ধারণাটিই ইসলামিক কোরানেও দেখতে পাওয়া যায়: তারা তাঁকে হত্যা করতে পারেন নি, ক্রুশবিদ্ধও করতে পারেন নি। কিন্তু যেভাবে তাঁকে দেখা গিয়েছিল, সেভাবে তাঁকে উপস্থাপন করা হয়েছিল।)

পন্টাসের মার্সিয়োন ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ এক জন জ্ঞানবাদী, যদিও তিনি জ্ঞানবাদী মতবাদের প্রতিনিধিত্বকারীদের কেউ ছিলেন না– ১৩৭-১৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রোমে শিক্ষা দেন। তিনি খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসের গুরুত্ব আরোপ করলেও, কিন্তু তাঁর অপমান ও দৈহিক পুনরুত্থানের ধারণাকে প্রত্যাখান করেন।

অন্য জ্ঞানবাদী শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন– বাসিলাইডস ও তার ছেলে ইসিডোর এবং কার্পোক্রেটস ও তার ছেলে এপিফেনস– এরা সবাই মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াতে শিক্ষা দিতেন। সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্ন জ্ঞানবাদী শিক্ষক ছিলেন ভ্যালেন্টিনাস। তিনি আলেকজান্দ্রিয়াতে তার জ্ঞানবাদ বিষয়ক শিক্ষা দিতে শুরু করেন এবং ১৪০ খ্রীষ্টাব্দে রোমে চলে যান। তার বেশ কিছু সংখ্যক নির্ভরযোগ্য অনুসারী ছিলেন– আর এদের মধ্যে প্রাচ্যের থিওডোটাস এবং পাশ্চাত্যের টলেমী ও হেরাক্লিয়নের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যোহনের লেখা সুখবরের উপর হেরাক্লিয়নের মন্তব্যই, পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের উপর সবচেয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের মন্তব্য হিসেবে পরিচিত।

জ্ঞানবাদীদের শিক্ষা

আধ্যাত্মিক জ্ঞানবাদী বিশ্বাসের মধ্যে সুস্পষ্ট দ্বৈতবাদ রয়েছে মনে করা হয়। তারা সর্বোৎকৃষ্ট ঈশ্বরকে এক অজ্ঞাত জগৎ-স্রষ্টা অথবা সৃষ্টিকর্তার (যাঁকে প্রায়ই পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের যিহোবার ব্যঙ্গাত্মক প্রতিমূর্তি হিসেবে মনে করা হয়) সাথে তুলনা করেন। কিছু জ্ঞানবাদীরা তাদের শিক্ষায় বলেন যে, 'সোফিয়া'র ('জ্ঞান' এর গ্রীক প্রতিশব্দ) পতনের ফলে এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। সব জ্ঞানবাদীরাই বস্তুগত সৃষ্টিকে মন্দ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেন। কিছু সংখ্যক 'আধ্যাত্মিকতা' সম্পন্ন লোকদের দেহে ঈশ্বরত্বের স্ফুলিঙ্গ প্রবেশ করে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং

তাদের পরিত্রাণকে নিশ্চিত করে।

নিজেদের স্বর্গীয় উৎপত্তির বিষয়ে এই 'আধ্যাত্মিকতা'র কোন ধারণা নেই। ঈশ্বর তাদের কাছে এক জন মুক্তিদাতাকে পাঠান, যিনি তাদের কাছে গোপন জ্ঞানের (নোসিস) উপহার হিসেবে পরিত্রাণ নিয়ে আসেন। আর এভাবে একজনের 'আধ্যাত্মিকতা' জেগে উঠে এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দৈহিক বন্দিত্ব থেকে সে মুক্তি লাভ করে। এর পর সে শত্রুভাবাপন্ন দানবদের গ্রহমন্ডল অতিক্রম করে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হয়।

যেহেতু তারা বিশ্বাস করতো যে, নিজেদের 'আধ্যাত্মিকতা'র প্রকৃতি জানার উপর পরিত্রাণ নির্ভর করে; তাই কিছু জ্ঞানবাদীরা খুবই অসংযমী ব্যবহারের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারা নিজেদেরকে 'মুক্তা' বলে দাবী করতো, কারণ মুক্তার উপর কাদা থাকলে তাতে কোন দাগ পড়ে না। তাই উদাহরণ হিসেবে কার্পোক্রেটস তার অনুসারীদেরকে পাপ করার জন্য অনুরোধ করতেন এবং তার ছেলে এপিফেইন্স শিক্ষা দিয়ে বলতেন যে, বিমিশ্রতাই ছিল ঈশ্বরের আইন-কানুন। 'ক্যানাইটস' নামে জ্ঞানবাদীদের ধর্মীয় উপদলটি পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে উল্লেখিত কয়িন এবং অন্যান্য দুষ্ট চরিত্রগুলো অনিচ্ছাকৃতভাবে সম্মান জানিয়েছিলেন। আবার, 'ওফাইটস' নামে খ্রীষ্টিয়ান জ্ঞানবাদী ধর্মীয় উপদলটি আদম ও হবার কাছে 'সৎ ও অসৎ জ্ঞান'কে নিয়ে আসার জন্য সাপের পূজা করেছিলেন।

যাহোক, যৌনতা ও বিয়ের বিষয়ে অধিকাংশ জ্ঞানবাদীদেরই তীব্র নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। স্ত্রীলোক সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সব মন্দতার উৎপত্তি ঘটে এবং সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে আত্মা পুরোপুরিভাবে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে অন্ধকারের শক্তির কাছে দাসত্ব বরণ করে।

সুস্পষ্ট ও প্রাথমিক প্রমাণের অভাব থাকা সত্ত্বেও কিছু পন্ডিতরা অনুমান করেন যে, খ্রীষ্টের জন্মের আগে জ্ঞানবাদের উদ্ভব ঘটে। তারা বিশ্বাস করেন যে, তারা জ্ঞানবাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার উদ্ধৃতি পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়ম, বিশেষত যোহন ও প্রেরিত পৌলের লেখা থেকে উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু এই অনুচ্ছেদগুলোর অসংখ্য লেখাকে অজ্ঞানবাদী হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই বিষয়ে সবচেয়ে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত হলো এই যে, জ্ঞানবাদের প্রাথমিক পর্যায়ের ধরণটি ১ম খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে বিদ্যমান ছিল। তবে দ্বিতীয় শতাব্দীর পুরোপুরি সমৃদ্ধ জ্ঞানবাদকে প্রারম্ভিক মূল লেখা হিসেবে পাঠ করা সম্পূর্ণরূপে বিপজ্জনক।

রোম সাম্রাজ্য

প্লিবস, সিসেরো, পম্পে, সিজার, অগাস্তাস, মার্কাস ও কনস্টেনটাইন: রোমান প্রজাতন্ত্র ও তার পরবর্তী সাম্রাজ্য– উভয়ই অসংখ্য বিখ্যাত নামে পরিপূর্ণ। কারণ খ্রীষ্টপূর্ব ৫০৯ সালে রোমীয় প্রজাতন্ত্রের জন্ম থেকে ৪১০ খ্রীষ্টব্দে ভিসিগোথদের দ্বারা রোম লুট করা পর্যন্ত প্রায় ১০০০ বছর ধরে রোমীয় সংস্কৃতি ইউরোপ ও মধ্য প্রাচ্যের (নিকট প্রাচ্যের) উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফরাসী, স্পেনীয় ও ইতালীয় সহ ইউরোপের বেশ কিছু ভাষার জনক ল্যাটিন ভাষা খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কূটনীতির আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে টিকে ছিল এবং বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিণ্যাসের ক্ষেত্রে এখনও এটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কিন্তু তিক্ততা ও রক্তপাত ছাড়া সংস্কৃতির এই বিজয় অর্জিত হয় নি। রোমের ইতিহাস কখনই এর সুবৃহৎ অট্টালিকা ও এর দর্শন শাস্ত্রের মত মহৎ ছিল না।

[রোমান ফোরাম বিল্ডিং এর ধ্বংসাবসেস]

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

রোমের সূচনা

রোমীয় ঐতিহাসিক লেভীর পুনরায় বলা পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, রোমের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রোমুলাস ও রেমাস নামের দুই যমজ ভাই। 'শহরটির প্রতিষ্ঠার সময় থেকে' (ল্যাটিন শব্দসংক্ষেপ 'AUC' দিয়ে ল্যাটিন বাক্যাংশ 'ab urbi condita'কে নির্দেশ করা হয়েছে, যার অর্থ– নগর প্রতিষ্ঠার পর থেকে) রোমীয়রা তাদের বছর গণনা করা শুরু করে, যা খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫৩ শতাব্দীর অনুরূপ। সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিকরা যে সব প্রমাণ আবিস্কার করেছেন, তা রোম প্রতিষ্ঠার এই ঐতিহ্যবাহী সময়কে সুনিশ্চিত করে। রোমের প্যালেটাইন পাহাড়ে পাওয়া অপরিবর্তিত কুঁড়েঘর ও সমাধি এবং রোমীয় সম্মেলন চত্বরে পাওয়া ঐ সময়কার শবদাহ আবিস্কার করা হয়েছে।

রোমীয় কবি ভার্জিলের 'আনিয়েড' মহাকাব্যে রোমুলাস ও রেমাসের পূর্বপুরুষ ট্রয়ের বীর অ্যানিয়াসের সন্ধান পাওয়া যায়। এই পৌরাণিক কাহিনী অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীরও আগে ইতালীতে প্রচলিত ছিল। পঙ্গু পিতা অ্যাঙ্কাইজেসকে বহনরত

[জনশ্রুতি অনুসারে রোমের স্থপতি রোমুলাস এবং রিমাস তাদের নেকড়ে পালিত মায়ের দুধ খাচ্ছে, (ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য)]

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

পোড়ামাটিতে তৈরি অ্যানিয়াসের ঐ সময়কার মূর্তি আবিস্কৃত হয়েছে। যাহোক পৌরাণিক কাহিনীর চেয়ে ইতিহাসে রোমের সাথে এশিয়া-মাইনর অঞ্চলের পূর্বেকার যোগাযোগের কথা সম্ভবত এট্রাস্কানদের উৎপত্তির মধ্যে নিহিত রয়েছে। আর রোমের উত্তরাঞ্চলে সমৃদ্ধি লাভ করা এই জনগোষ্ঠী খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর সর্বশেষ রোমীয় রাজাদেরকে প্রতিপালন করে।

[এট্রাস্কানরা ছিল খুবই দক্ষ ধাতব কারিগর। এটি খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ৬৫০ সালে এট্রাস্কান স্বর্ণকারদের তৈরি একটি স্বর্ণের হুড়কা।]

রোম প্রজাতন্ত্র

খ্রীষ্টপূর্ব ৫০৯ শতাব্দীতে সর্বশেষ এট্রাস্কান রাজাকে রোম থেকে বিতাড়িত করা হয়। আর সেখানে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সরকার খ্রীষ্টপূর্ব ২৭ শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল। এই রোমান প্রজাতন্ত্রে নাগরিকদের বিভিন্ন ধরণের সমাবেশের প্রতিনিধি নিম্ন আদালতের বিচারকের পক্ষে ভোট দেয়। কিন্তু রোমে গণতন্ত্র না থাকায় নাগরিক হিসেবে তাদের আয়োজিত জনসমাবেশে সেখানকার প্রত্যেকের আইন বিষয়ক খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করা ও তা নিয়ে বিতর্ক করার স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল কনসালসদের দ্বারা পরিচালিত কতিপয় ব্যক্তির হাতে। আর এই কনসালসরা ছিলেন নিম্ন আদালতের দুই জন প্রধান বিচারক, যারা প্রতি বছরে লোকদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন।

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

প্রজাতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক পর্যায়ের শতাব্দীগুলোতে, ক্ষমতাসীন অভিজাত প্যাট্রিশিয়ান শ্রেণী এবং মিশ্র প্লিবিয়ান জনগণ সব সময় একে অপরের সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। প্লিবিয়ানরা দলচ্যুত হওয়ার হুশিয়ারী দিয়ে বিশেষ অধিকার আদায় ও রাজ্যের মধ্যে আর একটি রাজ্য গঠনের চেষ্টা চালাত। এই অবস্থা চলার পর, খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯৪ সালে প্লিবিয়ানদেরকে ট্রিবুনেস নামে তাদের নিজস্ব কর্মকর্তা দেয়া হয়। এই কর্মকর্তাদের গ্রেফতার করা যেতো না (কারণ 'পূতপবিত্র' বলে, সব ধরণের ক্ষয়ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত থাকতেন) এবং তাদের উচ্চতর রাষ্ট্রীয় পরিষদের কর্মকান্ডে ভেটো দেয়া বা বিরোধিতা করার ক্ষমতা (ল্যাটিন ভেটো শব্দের অর্থ 'আমি নিষেধ করছি') ছিল। কনসালসদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে দুই থেকে দশে পৌঁছেছিল– তবে তারা সক্রিয় ছিলেন না, কারণ ভেটোকে বহাল রাখতে সর্বসম্মতিক্রমে তাদেরকে যে কোন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত নিষিদ্ধ করতে হতো।

রোমীয় আইন-কানুনের ভিত্তি হিসেবে 'বারো টেবিল আইন' নামে খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪৯ শতাব্দীতে ব্রোঞ্জের বারটি ফলকে লিখে রোমীয় নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ক আইন প্রণয়ন করা হয়, যা প্রতিটি রোমীয় ছেলেকে মুখস্ত করতে হতো। যাহোক এই আইন-কানুনগুলো তৈরির পরে, সেগুলো রোমীয় জন-সাধারণের কাছে তুলে ধরা হয়েছিল। যদিও ঐ ফলকগুলোতে কেবল সাধারণ আইনগুলোকেই বর্ণনা করা হয়েছিল, তা সত্ত্বেও এটি রোমীয়দের গুরুত্বপূর্ণ আইনি ঐতিহ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল, পরবর্তীতে নজির এবং সংবিধি হিসেবে সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪৫ সালে একটি আইন প্রবর্তন করা হয়, যা পার্টিশিয়ান ও প্লিবিয়ান শ্রেণীর মধ্যে আন্তঃবিবাহের অনুমতি প্রদান করে; যা পরবর্তীতে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যে কোন বৈষম্য দূর করতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

[রোমের বারো টেবিল আইন]

রোমের ইতালি জয় করার নির্ঘন্ট

খ্রীষ্টপূর্ব ৫০৯ সালে– এট্রাস্কানদেরকে রোম থেকে বিতাড়িত করা হয় এবং রোমীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯৩ সালে– রোম ও ক্যাম্পেনিয়ার ল্যাটিন শহরগুলোর মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩৯৬ সালে– দক্ষিণ ইটরুরিয়ার নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্য রোম ভেই দখল করে।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৯ সালে– একুই ও ভলসকির পরাজয় ঘটে এবং টারাসিনার দক্ষিণের নিম্নাঞ্চল রোমের অধীনে আসে।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫৩ সালে– দক্ষিণ ইটরুরিয়াকে পুরোপুরিভাবে দমন করা হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪৩ সালে– কাপুয়ার স্যামনাইটরা ও ক্যাম্পানিয়ার অন্যান অঞ্চল রোমের কাছে পরাজয় বরণ করে।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩১১ সালে– উত্তর ইটরুরিয়াকে জয় করা হয়।

[রোমের সুশৃঙ্খল সৈন্য বাহিনী]

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৮ সালে– উত্তর আম্ব্রিয়ার পিকেনেটসদের সাথে রোমের মিত্রতা স্থাপিত হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ২৯৫ সালে– আম্ব্রিয়ার সেন্টিনামে সেল্ট, ইট্রাস্ক্যান এবং আম্ব্রিয়ানদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে।

খ্রীষ্টপূর্ব ২৯০ সালে– স্যামনাইটদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে এবং মধ্য ইতালির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রোমীয়দের হাতে চলে আসে।

খ্রীষ্টপূর্ব ২৮৩ সালে– আম্ব্রিয়াতে কেল্টদের পরাজয় ঘটে।

খ্রীষ্টপূর্ব ২৮০-৭৫ সালে– টারেন্টাম এবং দক্ষিণ ইতালির অন্যান গ্রীক শহরগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ২৭২ সালে– টারেন্টাম আত্মসমর্পন করে।

রোমের সম্প্রসারণ

খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ ও ৩য় শতাব্দীতে, রোমীয়রা ধীরে ধীরে তাদের অঞ্চল সম্প্রসারিত করে পুরো ইতালিকে রোমের অন্তর্ভুক্ত করে। তারা প্রথমত উত্তরের উন্নয়নশীল এট্রাস্কান প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয় এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৩৯৬ শতাব্দীতে দশ বছর অবরোধের পর, কাছাকাছি শহর ভেইকে দখল করে। তারপর খ্রীষ্টপূর্ব ৩৯০ সালে রোম কেল্যদের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ার পরে, রোমীয়দের বিজয়যাত্রা কিছু কালের জন্য বিঘ্নিত হলেও, পরবর্তীতে তারা তাদের এক সময়কার দক্ষিণের ল্যাটিন মিত্রকে আবারও বশে আনে। তারপর খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে প্রচন্ড ধারাবাহিক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তারা দক্ষিণ ইতালির অ্যাপেনিন পর্বতমালার দুঃসাহসিক স্যামনাইটসদেরকে পরাজিত করে এবং তারপর উত্তরের আম্ব্রিয়ানদেরকে জয় করে।

রোমীয়রা তাদের অসংখ্য পরাজিত শত্রুকে ল্যাটিনীয় অধিকার দিত। আর এগুলো তাদেরকে বিয়ে ও ব্যবসার মত নাগরিকত্বের ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতো। ইতালির বিভিন্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে রোমীয় নাগরিকদের জন্য সুরক্ষিত বসতি স্থাপন করে।

রোমের বিজয়

রোমের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতিতে আতঙ্কিত হয়ে, দক্ষিণ ইতালীর গ্রীক শহর টারেনটাম মহান গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডারের কাকাতো ভাই পিরাহুসকে রোমীয়দের বিরুদ্ধে

[প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ফৈনীকীয় সমুদ্রবন্দর। খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে কার্থেজ ছিল বিশাল ফৈনীকীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী। আর খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪৬ শতাব্দীতে রোমীয়রা শহরটিকে দখল করে ধূলোয় মিশিয়ে দেয়। এই ধ্বংসাবশেষগুলো রোমীয় সময়কে নির্দেশ করে।]

যুদ্ধ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আর তিনি তার সৈন্যদল সহ ২০,০০০ লোক এবং ২০টি হাতি নিয়ে তাদের এই অনুরোধ রক্ষা করেন। যদিও পিরাহুস খ্রীষ্টপূর্ব ২৮০ ও ২৭৬ সালের মধ্যে রোমীয়দের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতে সক্ষম হন। তবে তিনি এতোটাই হতাহতের শিকার হন যে, তিনি বলেন, ‘এই ধরণের আরও একটি জয় পেতে গেলে আমি হেরে যাব।’ আর এই বিবৃতির মাঝে আমরা খুঁজে পাই তার এই অভিব্যক্তি ‘একটি পাইর্হিক জয় (যে জয়লাভে বহু প্রাণহানী ঘটে)’।

প্রতি বারে নতুন শত্রুর মোকাবেলা করতে গিয়ে বহুমুখী রোমীয়রা তাদের সমর কৌশলের উৎকর্ষতা সাধন করতো। খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে তারা চড়াওভাবে যুদ্ধ করার জন্য তৈরী হয়েছিল এবং এই প্রসঙ্গে তারা বলেছিল যে, কেবল নিরাপত্তার কারণে তাদের এই যুদ্ধের প্রস্তুতি।

[প্রথম পিউনিক যুদ্ধের একটি সংগৃহীত ছবি]

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

[পিউনিকের যুদ্ধ]

উত্তর আফ্রিকার তিউনিশিয়ায় কার্থেজের ফৈনীকীয় উপনিবেশের বিরুদ্ধে প্রথম পিউনিক যুদ্ধের সময়, দখলকৃত পিউনিক জাহাজগুলোর অনুকরণে রণতরী নির্মাণ করে, রোমীয়রা তাদের নৌশক্তির অভাবকে পূরণ করে। তারা শত্রু জাহাজ ধরার আঁকশি আবিস্কার করে। আর এই আঁকশি হলো লৌহ দন্ডের সাথে সংযুক্ত তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ বিশিষ্ট আঙটা, যা শত্রু জাহাজে ওঠার আগে সেটিকে থামিয়ে দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হতো। আর এই সব কৌশল সমৃদ্ধ রোমীয় নৌশক্তি সর্বপ্রথম বৈদেশিক যে অঞ্চলসমূহের উপর বিজয় লাভ করেছিল, সেগুলো হলো– সিসিলি, কর্সিকা ও সার্ডিনিয়া।

এই অপমানজনক পরাজয় এবং রোমীয়দের আরোপিত যুদ্ধের ভারী ক্ষতিপূরণে মনে মনে খুবই তিক্তবিরক্ত হয়ে, স্পেন থেকে আক্রমণ পরিচালনা করে এবং সৈন্য ও হাতি বহর নিয়ে উত্তর ইতালিতে প্রবেশের মাধ্যমে হ্যানিবাল রোমীয়দের বিরুদ্ধে তার দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু করেন। হ্যানিবাল তার ধূর্ত রণকৌশল ও কুশলী সৈন্য পরিচালনায় যোগ্যতম ভাড়াটে সৈন্যদের দ্বারা

[পিউনিক কবর]

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

রোমীয় সৈন্য বহরকে ফাঁদে ফেলেন এবং ট্রিবিয়া নদী, ট্রাসিমিন ও কান্না হ্রদের কাছে তাদেরকে পরাজিত করেন। যদিও তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি রোম শহরকে জয় করতে পারেন নি, কিংবা তার ইতালীয় মিত্রদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িতও করতে সক্ষম হন নি। কার্যত তিনি অনুত্যক্ত ছিলেন, কারণ তাকে প্রায় বারো বছর ধরে ইতালীয় উপদ্বীপের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। কিন্তু পরিশেষে, কার্থেসকে হুমকি দিয়ে রোমীয় সামরিক কর্মকর্তা স্কিপিও আফ্রিকানুস সেখান থেকে হ্যানিবালকে সরিয়ে দেন এবং খ্রীষ্টপূর্ব ২০২ শতাব্দীতে স্কিপিও যামায় তাকে পরাজিত করেন।

[রোমীয়দের আপ্পিয়ান সড়কের কিছু অংশ, যা স্পার্টাকাসের নেতৃত্বাধীন ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরবর্তী গণনির্যাতনের দৃশ্যকে তুলে ধরে।]

নিম্ন আদালতের বিচারক (পরীক্ষক) কাটো 'তৃতীয় টিউনিক যুদ্ধের' দাবী করেন। তিনি 'কার্থেজ অবশ্যই ধ্বংস হবে' ধ্বণি তুলে উচ্চতর রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভায় যে ভাষণ দিতেন, তা বন্ধ করেন। আর সঠিক সময়ে, স্কিপিও এমিলিয়ানাস শহরটি ধ্বংস করেন এবং ফসল নষ্ট করতে জমিতে লবণ ছিটিয়ে দেন।

রোমীয়দের কাছে হ্যানিবালের পরাজয়ের পরে, তারা ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ৫ম ফিলিপের দিকে অগ্রসর হন– আর এই ফিলিপের সাথে কার্থেজদের মিত্রতা ছিল (খ্রীষ্টপূর্ব ২০০-১৯৬, ১৭১-১৬৭)। অসংখ্য ম্যাসিডোনীয় ধারাবাহিক যুদ্ধে, অপেক্ষাকৃত বড় রোমীয় বাহিনীর (৩০০০-৬০০০ জন সৈন্যের) অন্তর্গত ১০০-২০০ জন পুরুষের সমন্বয়ে গঠিত ছোট ছোট লড়াইকারী দলগুলো নিজেদেরকে ফ্যালানক্সেস নামে নিশ্চল কঠিন কিন্তু অনমনীয় লড়াইকারী ম্যাসিডোনীয় দলগুলোর কাছে খুবই গতিময় হিসেবে প্রমাণ করেছিল। এরপর আবারও আখায়া সংগঠনের নেতৃত্বে গ্রীক বিদ্রোহ দেখা যায়– ফলে খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৬ সালে করিন্থ শহরটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়, যা এক শতাব্দী কাল ধরে তার ধ্বংসযজ্ঞের ভস্ম থেকে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে নি।

ম্যাসিডোনীয় যুদ্ধ জয়ের ফলে রোমে অনেক ধন-রত্ন এবং অসংখ্য দাস নিয়ে আসা হয়। আর তুলনামূলক দিক থেকে, অনমনীয় স্পেনের নুম্যানশিয়া শহরের বিরুদ্ধে

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

যুদ্ধে (খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৩-১৩৩) কোন কিছুই অর্জিত হয়নি, কেবল দুর্ভোগ ছাড়া। বাড়ি ফেরা সৈনিকরা দেখতে পান যে, দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে বেঁচে থাকার জন্য খামারগুলোকে বিক্রি করতে তাদের পরিবারগুলোকে বাধ্য করা হয়েছিল।

আর এই হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা গ্রাচি ভাইদেরকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৩-১২৩ সালের মধ্যে পুরো পরিস্থিতিকে পুনর্গঠন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। মূলত তারা দেখতে চেয়েছিলেন যেন জনগণের সম্পত্তি পুনরায় বন্টন করা হয়। কিন্তু ধনী অভিজাতরা (যাদেরকে 'অপ্টিমেটস' বলা হতো) সাধারণ জনগণের দলকে (যারা 'পপুলারেস' নামে পরিচিত ছিলেন) কোন বিশেষ সুবিধা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আর প্রতিক্রিয়া হিসেবে, তারা খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৩ সালে তিবিরিয় গ্রাচুসকে হত্যা করেন এবং পরবর্তীতে অপর ভাই গায়ুস গ্রাচুসকে খ্রীষ্টপূর্ব ১২৩ সালে হত্যা করেন।

মারিয়াসের নেতৃত্বাধীন 'পপুলারেস' দল এবং সুল্লার নেতৃত্বাধীন 'অপ্টিমেটস' দলের মাঝে বিদ্যমান তিক্ত শত্রুতা গৃহযুদ্ধের আকারে দুইটি দলের অনুসারীদের মধ্যে বিস্ফোরিত হয়। মারিয়াস ছিলেন বীর যোদ্ধা, যিনি নুমিডীয় নেতা জুগুরথাকে (খ্রীষ্টপূর্ব ১১২-১০৬) পরাজিত করেছিলেন এবং খ্রীষ্টপূর্ব ১০২ ও ১০১ সালে জার্মান যাযাবরদের আক্রমণের হাত থেকে রোমকে রক্ষা করেছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন এক জন 'নতুন লোক', কোন অখ্যাত পরিবারের সদস্য, যিনি রাষ্ট্রীয় কোন দফতর যোগ্যতা বলে অর্জন করেন। তিনি বারে বারে নিম্ন আদালতের প্রধান বিচারপতি নির্বাচিত হচ্ছিলেন। এই ধরণের উচ্চতম দপ্তর স্বাভাবিকভাবেই কেবল ২৫টি অভিজাত পরিবারের সদস্যদের জন্যই বরাদ্দ ছিল, তারাই তাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে প্রধান বিচারক হিসেবে গণ্য হতে পারতেন।

উত্তর তুরস্কের উচ্চাভিলাষী রাজা মিথ্রাডেটসের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সুলাকে খ্রীষ্টপূর্ব ৮৮ সালে সর্বোচ্চ সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৩ সালে পর্গামামের শেষ রাজা তার রাজ্যকে রোমীয়দের কাছে তুলে দেয়ার পর, রোমীয়রা ব্যবসা ও কর-সংগ্রহকে তাদের মুঠিবদ্ধ করে। আর এই রোমীয়দের বিরুদ্ধে রাজা মিথ্রাডেটস ন্যায়ের সংগ্রাম পরিচালনা করেন। তিনি ৮০,০০০ রোমীয়কে এক দিনে হত্যার আদেশ দেন এবং স্বর্ণ গলিয়ে তিনি এক সামরিক কর্মকর্তার গলায় মধ্যে ঢেলে দেন। যদিও সুলার উপস্থাপিত শর্তাবলীকে তিনি মেনে নিতে বাধ্য হন বটে, তবে তিনি নিজেকে এক জন অনমনীয় শত্রু হিসেবে প্রমাণ করেন।

আভ্যন্তরীণ অস্থিরতা

রোম প্রজাতন্ত্রের সর্বশেষ শতাব্দী আভ্যন্তরীণ বিরোধ জনিত সহিংসতার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে। সুলা যেভাবে তার সৈন্যবহর নিয়ে রোমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন– সেই দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে, রোমীয় সামরিক কর্মকর্তারা নিজেদের অনুসারীদেরকে ব্যবহারের করে তাদের নীতিমালাকে চালু করার প্রচেষ্টা চালায়।

ইতালীয়দের মধ্যে বিরাজমান অস্থিরতার কারণে সামাজিক যুদ্ধ শুরু হয়, যা খ্রীষ্টপূর্ব ৯০-৮৮ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আর এই যুদ্ধের কারণে রোমের প্রায় সব ইতালীয় মিত্ররা নাগরিকত্বের অনুমোদন লাভ করে। গ্লাডিয়েটর ও দাসদের মধ্যে থাকা অস্থিরতা সুবিদিত সেই বিদ্রোহের জন্ম দেয় (খ্রীষ্টপূর্ব ৭৩-৭১) এবং গ্লাডিয়েটর স্পাটাকাসের নেতৃত্বাধীন বিক্ষুব্ধ জনতা বেশ কিছু সৈন্য বাহিনীকে ধ্বংস করে। রোমীয় নেতা ক্রাসাস ও পম্পে শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন এবং ৬,০০০ বিদ্রোহীকে আপ্পিয়ান সড়কের পাশে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলেন।

রোমীয়দের দ্বারা রোডসের নৌবাহিনী ধ্বংসের পর, ভূমধ্য সাগরে প্রায়ই জলদস্যুদের আক্রমণ চলতো। আর এই জলদস্যুতার মাত্রা ক্রমশঃ এতোটাই বেড়ে যায় যে, তারা সমুদ্রপথে রোমীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রধান খাদ্য-শস্য সরবরাহের ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে ওঠে। এক বার তারা রোমীয় সম্রাট কৈসরকে বন্দী করে এবং মুক্তিপনের জন্য আটকে রাখে। তাদেরকে দমন করার জন্য পম্পেকে তিন বছরের জন্য অসীম ক্ষমতা দেয়া হয়। বস্তুত তিনি তিন মাসের মধ্যে তার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হন এবং এশিয়া-মাইনর সহ আরও অঞ্চলকে জয় করতে থাকেন এবং যিহূদিয়া, শমরীয়া সহ সমস্ত পলেষ্টিয় অঞ্চলকে একটি রোমীয় উপনিবেশে পরিণত করেন (খ্রীষ্টপূর্ব ৬৭-৬৩)।

যদিও সিসেরো ছিলেন এক জন 'নতুন লোক', যিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৬৩ সালে বক্তা ও লেখক হিসেবে তার অসাধারণ প্রতিভার দ্বারা প্রধান বিচারক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রকাশ্যে ক্যাটলিনের ষড়যন্ত্রের নিন্দা করার মধ্য দিয়ে তিনি তার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময়কে উপভোগ করেন, কিন্তু পাঠকদেরকে নিজের অর্জনের বিষয়ে বার বার মনে করিয়ে দিয়ে তার সুনাম নষ্ট করে ফেলেন।

রোমীয় উচ্চতম রাষ্ট্রীয় পরিষদে রক্ষণশীলতার দ্বারা হতাশ হয়ে পড়ে, তিন জন উচ্চাভিলাষী রাজনীতিবিদ খ্রীষ্টপূর্ব ৬০ সালে 'সমান ক্ষমতাসম্পন্ন তিন ব্যক্তির প্রথম সমন্বয়' হিসেবে এক গোপন চুক্তি করেন। আর এই তিন ব্যক্তিরা ছিলেন– পম্পে, সিজার (কৈসর) ও ক্র্যাসাস। ক্র্যাসাস ছিলেন তার সময়ের সবচেয়ে ধনী লোক,

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

যিনি সামরিক বিজয়ের অপেক্ষায় ছিলেন এবং পার্থিয়দের বিরুদ্ধে দুর্ভাগ্য-পীড়িত অভিযান পরিচালনা করেন। কার্হেতে (যাকে পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের আদিপুস্তকে 'হারণ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে) খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩ সালে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ক্র্যাসাসের সৈন্যবাহিনীকে পার্থিয়রা ঘিরে ফেলে এবং তার সৈন্যদের উপর অবিরাম তীর বর্ষণ করতে থাকে। এই যুদ্ধে ২০,০০০ লোকের মূল্যবান জীবন হারিয়ে রোমীয়রা তাদের সর্বকালের সবচেয়ে ব্যয়বহুল পরাজয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করে।

যুলিয় সিজার (কৈসর)

প্রধান বিচারক হিসাবে এক বছর পার করার পরে, যুলিয় সিজার (কৈসর) রোম ছেড়ে গলে (ফ্রান্স) চলে যান, যেন সেখানকার শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আর সেখানে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮-৫১ সালের মধ্যে, তিনি ধারাবাহিকভাবে হাজার হাজার সৈন্যকে নির্বিচারে হত্যা করে কেল্টিক ও বেলজিক সৈন্য বাহিনীকে পরাজিত করেন। তিনি দুইবার ব্রিটেন (ইংল্যান্ড) আক্রমণ করলেও, ৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ক্লৌদিয়ের পরবর্তী আক্রমণ পর্যন্ত এটিকে রোমের উপনিবেশ করা হয় নি।

[সামরিক কর্মকর্তা যুলিয় সিজার (কৈসর), যিনি রোমের পরিচালক হয়েছিলেন।]

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

যখন পম্পে সিজারকে (কৈসর) প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে তার সময়সীমা শেষে, অস্ত্র রাখার আদেশ দেয়ার জন্য রোমের উচ্চতম রাষ্ট্রীয় পরিষদকে রাজী করান, তখন রুবিকন নদী পাড়ি দিয়ে (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯) তিনি তাদের এই প্রস্তাবের আপত্তি জানান। কারণ এটি প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে তার আওতাধীন সিসালপাইন, গল ও ইতালির মধ্যকার সীমারেখাকে চিহ্নিত করেছিল এবং নিক্ষিপ্ত পাশায় নির্ধারিত ভাগ্যের মত, ঐ সময় তার আর যুদ্ধ থেকে ফেরার কোন উপায় ছিল না। তারপর রোমে যে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়, তাতে সিজারের (কৈসর) চেয়ে পম্পের অনুসারীদের সংখ্যা বেশি ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮ সালে উত্তর গ্রীসের ফার্সালাস সমভূমিতে তিনি পম্পেকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। মিশরে আশ্রয় পাওয়ার আশায় পম্পে পালিয়ে আলেকজান্ড্রিয়াতে চলে যান, কিন্তু সেখানে পা রাখা মাত্রই তাকে খুন করা হয়।

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

সিজার (কৈসর) তার শত্রুদেরকে খুঁজতে মিশর যাত্রা করেন এবং সেখানে তিনি রাণী ক্লিওপেট্রার প্রেমে পড়েন। আর এই ক্লিওপেট্রা ছিলেন মিশরের সর্বশেষ টলেমীয় শাসনকর্ত্রী। যিহূদীদের সাহায্যে আলেকজান্দ্রিয়াতে সৈন্যবাহিনীর দ্বারা আটকে পড়া কঠিন পরিস্থিতি থেকে যিহূদীদের দ্বারা উদ্ধার পাওয়ার পরে, তিনি খুবই ক্ষিপ্রতা সহকারে প্রতিপক্ষের সব কিছু হাতিয়ে নিতে অগ্রসর হন। তার মনে ছিল বিশেষ পরিকল্পনা ও সংস্কারবাদী চিন্তাধারা– তিনি বর্ষপঞ্জী পরিবর্তন করেন (তার 'জুলিয়ান' বর্ষপঞ্জীতে পোপ গ্রেগরির উপস্থাপিত সামান্য পরিবর্তন সহ যে সংস্করণের প্রচলন করা হয়, বর্তমানে সেটিকেই আমরা ব্যবহার করছি)। তিনি করিন্থকে উপনিবেশ করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তিনি দম্ভ সহকারে একনায়ক হিসেবে পুরো ক্ষমতা তার হাতে তুলে নেন। ফলে ব্রুটাস সহ তার কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন এবং ধারণা করা হয় যে, এই ষড়যন্ত্রের রেশ ধরেই খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে তাকে গুপ্তভাবে হত্যা করা হয়।

বিখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার ইউলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাটকের একটি অমর উক্তি, 'বন্ধুরা, রোমীয়রা, দেশবাসীরা'– মার্ক এন্টনিও লোকদেরকে এই গুপ্তহত্যার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে এমন এক চরম পর্যায়ে উন্নীত করেন যে, শেষে দেশ ছেড়ে যাওয়াকেই তিনি তার সবচেয়ে বিজ্ঞতাপূর্ণ কাজ বলে মনে করেন। নিজের বিষয়ে খুবই হতাশ হয়ে এন্টনিও দেখতে পান যে, সিজারের (কৈসর) ইচ্ছা অনুসারে উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য হয়ে তার ক্ষমতা লাভের কোন সুযোগ নেই এবং এর পরিবর্তে তার যুবক ভাই অক্টাভিয়ান উত্তরসূরী হিসেবে মনোনীত হবেন। তাই জাতিগত বিবাদ নিয়ে কিছু তিক্ত সময় পার করার পরে সিজারের (কৈসর) হত্যাকারীদেরকে খুঁজে পেতে তিনি অক্টাভিয়ান ও লিপিডাসকে নিয়ে 'সমান ক্ষমতাসম্পন্ন তিন ব্যক্তির দ্বিতীয় সমন্বয়' গঠন করেন (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩)। আর তাঁদের এই উদ্যোগের প্রথম কাজটি ছিলা বক্তা সিসেরোকে মৃত্যুদন্ড দেয়া, যিনি এন্টনিওকে তার ধারাবাহিক তিক্ত বক্তৃতার দ্বারা মানসিকভাবে জর্জরিত করতেন।

[মার্ক এন্টনি, যিনি সিজারের (কৈসর) খুন হওয়ার পরে যিনি সাম্রাজ্যের সহযোগী শাসক হয়েছিলেন।]

খ্রীষ্টপূর্ব ৪২ শতাব্দীতে ফিলিপী ও ম্যাসিডোনিয়াতে চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। গুপ্তঘাতকদের নেতা ব্রুটাস ও ক্র্যাসাস হতাশ হয়ে পড়েন এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগে কিছুটা ত্রুটি থাকায় তারা আত্মহত্যা

করেন।

বিজেতারা পুরো সাম্রাজ্যকে দুইটি অংশে বিভক্ত করেন– পাশ্চাত্যের অংশটি অক্তাভিয়ান শাসন করেন এবং প্রাচ্যের অংশটি এন্টনিও শাসন করেন। তারপর এন্টনিও রাণী ক্লিওপেট্রাকে তার্ষে তার সামনে উপস্থিত হওয়ার আদেশ দেন এবং তিনি এন্টনিওকে বন্দী করেন। এরপর এক পর্যায়ে এন্টনিও অক্তাভিয়ানের উদারমতি বোন অক্তাভিয়াকে বিয়ে করেন।

উচ্চাভিলাষী রাণী ক্লিওপেট্রার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে এন্টনিও পরবর্তীতে অক্তাভিয়ার সাথে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটান। আর ক্লিওপেট্রার ছেলে সিজারিয়নকে সিজারের (কৈসর) বৈধ উত্তরসূরী বলে প্রচার করেন।

অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম গ্রীসের অক্টিয়া উপসাগরের বাইরে খ্রীষ্টপূর্ব ৩১ সালে অক্তাভিয়ানের নৌ সেনাপতি আগ্রিপ্প কৌশলে এন্টনিওর নৌবহরকে পরাস্ত করেন। উদ্যম হারিয়ে ফেলা সৈন্যদেরকে পুনরায় সংগঠিত করার পরিবর্তে নির্লজ্জের মত এন্টনিওর ক্লিওপেট্রার দলে যোগ দেন। মিশরকে রক্ষার উদ্যমহীন প্রচেষ্টার পরে তিনি আত্মহত্যা করেন। আর ক্লিওপেট্রা তার বক্ষে বিষধর সাপের ছোবল নিয়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাকে এন্টনিওর সমাধির পাশে সমাহিত করা হয়।

[রোমীয়দের যুদ্ধ জাহাজ]

সাম্রাজ্যের নেতৃবর্গ

সম্রাট আগস্তঃ ২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ – ১৪ খ্রীষ্টাব্দ

খ্রীষ্টপূর্ব ২৭ সালে অক্টাভিয়ানকে ‘আগস্ত’ উপাধি প্রদান করা হয় এবং তিনি সাম্রাজ্যের প্রথম ‘সম্রাট’ হন। এই ‘সম্রাট’ শব্দটি একটি সামরিক পদবি ‘সেনাপতি’ থেকে এসেছে। বাস্তবিকপক্ষে তিনি রোমের সংখ্যাগরিষ্ঠ সভার প্রথম সদস্যের চেয়ে আর বেশি কিছু ছিলেন না। কিন্তু তিনি তার নিজের মধ্যে শাসক, বিচারক ও অন্যান্য দপ্তরের সর্বময় ক্ষমতার সমন্বয় ঘটান। তার কোন প্রতিদ্বন্দী ছিল না। প্রধান সশস্ত্র বাহিনীগুলো, যে সামরিক ক্ষমতা সম্পন্ন প্রদেশগুলোর অধীনে থাকতো, বিচক্ষণভাবে তিনি সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সভার সদস্যদের সাথে বিনীত ব্যবহার করে তিনি খুবই বুদ্ধিমত্তার সাথে সিজার (কৈসর) যে ভুলগুলো করেন, তা এড়িয়ে যেতেন। তার রাজত্বকালে, রোমীয় শান্তি (রোমীয় ভাষায় ‘প্যাক্স রোমানা’ বলা হয়ে থাকে) দানুবে ও কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

আগস্ত কেবল প্রথম সম্রাটই ছিলেন না, তিনি ছিলেন খুবই মহৎ এক ব্যক্তিত্ব। সত্যিকার অর্থেই তিনি ‘তার দেশের জনক’ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তিনি রোম ও এর প্রদেশগুলোর বিষয়ে অনেক বিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পদক্ষেপের অনুমোদন দিয়েছিলেন। তিনি গর্ব

[প্রথম রোম সম্রাট আগস্ত।]

করে বলতেন যে, তিনি ইট দিয়ে তৈরি রোম শহরকে মার্বেল পাথরের তৈরি শহরে পরিণত করেছেন।

রোমের বিখ্যাত শান্তি বেদিতে তার সত্যিকার ধার্মিকতার উদ্দেশ্যে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো হয়– পরবর্তীতে এর অনুকরণে তার আরও আশিটি মন্দির পুনর্নির্মাণ করা হয়। তিনি নৈতিকতাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাতেন, কারণ অনৈতিকতার জন্য তিনি এমনকি তার নিজের মেয়ে জুলিয়াকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ে ও সন্তান জন্মের বিষয়কে উৎসাহিত করতে তিনি আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা চালান। তার রাজত্বকালে আদমশুমারীর একটি বিবৃতি অনুসারে, খ্রীষ্টপূর্ব ৮ সালে ৪,২৩৩,০০০ জন এবং ১৪ খ্রীষ্টাব্দে ৪,৯৩৭,০০০ জন নাগরিকের একটি জরিপ প্রকাশ করা হয়। এটি করা হয়েছিল শান্তির এক যুগের সময়ে যখন প্রভু যীশু তাঁর বাবা-মায়ের নাসরতের বাড়ির পরিবর্তে বৈৎলেহমে জন্মগ্রহণ করেন (লূক ২:১) কারণ সম্রাট আগস্তের জারীকৃত এক আদেশ অনুসারে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে তাদের পূর্বপুরুষদের জায়গাতে গিয়ে নিবন্ধন করতে হয়েছিল।

তিবিরিয়: ১৪-৩৭ খ্রীষ্টাব্দ

তিবিরিয় ছিলেন রাণী লিভিয়ার আগে যে বিয়ে হয়েছিল, সেই ঘরের সন্তান। যদিও তিনি ছিলেন এক জন সক্ষম সৈনিক, কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব সিজারের (কৈসর) মনে রেখাপাত করতে পারেনি। তাছাড়া তিবিরিয়ের সাথে নীচ মনের আচরণ করা হয়েছিল বলে তার প্রতি তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। বিশেষত তার প্রিয়তমা স্ত্রী ভিপসানিয়ার সাথে বিয়ের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তাকে আগস্তের ব্যভিচারী মেয়ে জুয়িলাকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

[তিবিরিয় প্রভু যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময় সম্রাটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।]

তিবিরিয়ের রাজত্ব রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিচারের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার ২৬ খ্রীষ্টাব্দে ৬৭ বছর বয়সে, অনিষ্টজনক সেজানুস, যিনি নিম্ন আদালতের বিচারকের ক্ষমতাসম্পন্ন

দেহরক্ষীদের প্রধান ছিলেন, তিনি তাকে নেপলস উপসাগরের কাছাকাছি ক্যাপ্রি দ্বীপের বিলাসবহুল ভবন ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য রাজী করান। লেখক সুয়েটোনিয়াসের মর্মপীড়াদায়ক গল্পের পুনরাবৃত্তি অনুসারে, বেলেল্লাপনা ও ধর্ষণকামীতার বহিঃপ্রকাশের দ্বারা সম্রাট নিজেকে তৃপ্ত করতেন এবং ইতালির মূল ভূখন্ডে খুবই কম যেতেন। ৩১ খ্রীষ্টাব্দে সেজানুসের প্রতারণা প্রকাশ পায় এবং দ্রুত তাকে প্রাণদন্ড দেয়া হয়। ৩০ অথবা ৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সেজানুসের আশ্রিত যিহূদার প্রাদেশিক শাসক পন্তীয় পীলাতের বিচারাধীনে প্রভু যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলার শাস্তি দেয়া হয় (লূক ২৩:২৪-২৫)– আর রোমীয় ইতিহাসবিদ ট্যাসিটাস এই সত্য ঘটনার কথা জানতেন।

গায়: ৩৭-৪১ খ্রীষ্টাব্দ

সম্রাট গায়ের ডাকনাম ছিল ক্যালিগুলা, 'বেবি-বুটস'– তার বাবার সৈন্যবাহিনীর সদস্যরা তাকে এই নামে ডাকতো, যিনি ছিলেন জনপ্রিয় জারমানিকাস। প্রথমত তাকে খুবই ভাল সম্রাট বলে মনে হয়েছিল। তবে সাম্রাজ্যের সিংহাসন দখলের জন্য খুব দ্রুত তিনি নিজেকে এক জন দূর্নীতি-পরায়ণ দানব হিসেবে তুলে ধরেন। চরম অনৈতিকতা হিসেবে তিনি তার বোনদের সাথে যৌনসংসর্গে লিপ্ত হতেন। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ সভার সদস্যদেরকে অপমান করতেন এবং প্রচন্ড নিষ্ঠুরতা নিয়ে তিনি তার কর্মকান্ড পরিচালনা করতেন। ক্ষমতা লোভী ব্যক্তি হিসেবে, তিনি নিজেকে দেবসুলভ ব্যক্তিত্ব হিসেবে দাবী করেন। তিনি যিরূশালেমে যিহূদীদের মন্দিরে তার নিজের মূর্তি স্থাপনেরও হুশিয়ারি দেন। ৪১ খ্রীষ্টাব্দে তার প্রাসাদে তাকে গুপ্তভাবে হত্যা করা হয়।

ক্লৌদিয়: ৪১-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ

সম্রাট গায়ের কাকা ক্লৌদিয় ছিলেন এক জন পন্ডিত। শারীরিক বিকলাঙ্গতার জন্য তার সিংহাসন আরোহনকে বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হয় নি। শিশু বয়স থেকে তিনি পক্ষাঘাতের (পলিও) শিকার হয়েছিলেন বলে হাঁটতে গেলে তিনি পড়ে যেতেন, কথা বলতে গেলে তোতলাতেন, এমনকি এই সময় তার মুখ থেকে লাল ঝরতো। ব্রিটেন (বর্তমান ইংল্যান্ড) ও মরিতানিয়া (মরক্কো) সহ পাঁচটির বেশি প্রদেশকে তিনি তার সাম্রাজ্যভুক্ত করতে পারেন নি। তার প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালাতে তিনি মুক্ত দাস নিয়োগ করেন। আর এদের মধ্যে প্যাল্লাসের নাম উল্লেখযোগ্য, যাঁকে তিনি সাম্রাজ্যের কোষাগারের পদ দিয়েছিলেন। প্রেরিত পৌল সুখবর প্রচার বিষয়ক কাজ সম্রাট ক্লৌদিয়ের রাজত্বকালে সম্পন্ন করেন। কৈসরিয়ার কারাগারে তাঁকে দুই বছর বন্দী জীবন কাটাতে হয় (প্রেরিত ২৪:২৬), যখন প্যাল্লাসের ভাই ফীলিক্স যিহূদার

প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন।

[সম্রাট ক্লৌদিয়, যিনি ব্রিটেনকে রোমের প্রদেশে পরিণত করেন।]

যাহোক, স্ত্রী নির্বাচনে ক্লৌদিয় তেমন বিজ্ঞ ছিলেন না। তার প্রথমা স্ত্রী ম্যাসালিনা এতোটাই নির্লজ্জ ও অবিশ্বস্ত ছিলেন যে, তিনি তাকে মেরে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি আত্মবিস্মৃত অধ্যাপকদের মত ভুলেই যেতেন যে, তার স্ত্রীকে মেরে ফেলা হয়েছে এবং তাই সান্ধ্যকালীন ভোজে তার অনুপস্থিতিতে তিনি বিস্মিত হতেন। তার পরবর্তী স্ত্রী আগ্রীপিনা তার ছেলে নিরোকে সিংহাসনে বসানোর জন্য ক্লৌদিয়কে বিষাক্ত ছত্রাক খাইয়ে মেরে ফেলেন।

নিরো: ৫৪-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ

নিরো ছিলেন জুলিও-ক্লৌদিও বংশধারার সর্বশেষ সম্রাট। সেনেকা ও বারুসের নেতৃত্বাধীন ‘পাঁচটি সোনালী বছর’ পার করার পরে, তিনি নিজে সাম্রাজ্য শাসন করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে তিনি তার উপর প্রভুত্বকারী মায়ের কবল থেকে মুক্ত হন এবং এরপর ধ্বসে পড়া একটি ছাদের নিচের অংশ এবং একটি ভাঙ্গা জাহাজ নিয়ে সেগুলোর উন্নয়নে তিনি বেশ কয়েক বার তার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালান। খ্রীষ্টপূর্ব ৬৪ সালে যে সুবিদিত আগুনে রোম পুড়ে গিয়েছিল, সেই বিষয়ে নিরোর বিরুদ্ধে দোষারোপকারী লেখকদের নাম অজ্ঞাত রয়েছে– তবে এর সম্ভবনা খুবই কম। প্রকৃতপক্ষে, রোমের ভবনগুলোতে আগুন লাগার বিষয়টি এতোটাই অহরহ ঘটতো যে, সেগুলো হয়ে উঠেছিল আগুনের ফাঁদ। আর নিরো তার দোষ এড়াতে খ্রীষ্টিয়ানদেরকে বলির পাঁঠা বানিয়ে তাদেরকে তার বাগানে হত্যা করেন– আর এই এলাকায় ভ্যাটিকান পাহাড়ের উপর ভ্যাটিকান শহরটি এখন দাঁড়িয়ে আছে। পরবর্তীতে রোমে যে নির্যাতন চালানো হয়েছিল, প্রেরিত পৌল ও পিতর সম্ভবত তার শিকার হয়ে সাক্ষ্যমরের মৃত্যুবরণ করেন।

যখন রোম পুড়ছিল, তখন প্রকৃতপক্ষে নিরো ‘বেহালা বাজান’ নি। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি নিজেকে এক জন বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ বলে মনে করতেন এবং তার সঙ্গীত প্রতিভাকে তিনি বন্দি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরতেন। আর ভাড়াটে লোকজন অবিরাম তার সঙ্গীত পরিবেশনায় অবিরাম হাততালি দিয়ে

যেতো। গ্রীক সংস্কৃতির প্রশংসাকারী হিসেবে, সামগ্রিকভাবে গ্রীকদের জন্য আয়োজিত একটি প্রতিযোগীতায় অংশ-গ্রহণের জন্য তিনি গ্রীসে গিয়েছিলেন। এটি আর বলার প্রয়োজন পড়ে না যে, ঐ প্রতিযোগীতার সবগুলো বিভাগেই তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। খুবই গর্ব সহকারে তার জেতা সব সোনার মুকুট তিনি তার স্বর্ণ ভবনে সাজিয়ে রাখেন, যেটিকে তিনি রোমে আগুন লাগার পরবর্তী সময়ে নির্মাণ করেন। আর এই ভবনটির কাছাকাছি তিনি ব্রোঞ্জ আবৃত তার একটি মূর্তি স্থাপন করেন– যার উচ্চতা ছিল ৩০ মিটার/ ৩৩ গজ।

[খ্রীষ্টিয়ানদের নির্যাতনকারী প্রথম সম্রাট নিরো। রোম শহর যখন পুড়ছিল, তখন তিনি তা দেখছিলেন ও বাজনা বাজাচ্ছিলেন বলে শোনা যায়।]

নিরোর বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল বলে, তিনি আতঙ্কিত ছিলেন। তিনি লোকদেরকে, যেমন সেনেকা ও গ্যাল্লিয়োকে আত্মহত্যার আদেশ দেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে, এমনকি তার দেহরক্ষীরা তাকে ছেড়ে চলে যায় এবং এক জন চাকরের সহায়তায় তিনিও আত্মাহত্যা করেন এই আক্ষেপ নিয়ে, 'কি মহান এক সঙ্গীত প্রতিভার জীবনের অবসান ঘটলো।' নিরোর মৃত্যুর পরে, ৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তার জায়গাতে একে একে ধারাবাহিকভাবে খুব দ্রুত আবির্ভাব ঘটে গালবা, ওথো এবং ভাইটেলিয়াসের।

ফ্লাভিয়ান সম্রাটগণ

ভ্যাসপাসিয়ান: ৬৯-৭৯ খ্রীষ্টাব্দ

ভ্যাসপাসিয়ান ছিলেন ফ্লাভিয়ান বংশানুক্রমিক ধারার প্রথম সম্রাট। তিনি রোমীয় সৈন্যবাহিনীর এক জন সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে ব্রিটেন ও যিহূদিয়াতে দায়িত্ব পালন করার পরে যিহূদীদের বিরুদ্ধে অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার দায়িত্বভার তার ছেলে তীতের (টাইটাস) হাতে দিয়ে তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন। সম্রাট

হিসেবে তার উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর মধ্যে সম্রাট নিরোর অপচয় করে উড়ানো অর্থকে ফিরিয়ে আনা। অর্থনীতি বিষয়ক চরম পদক্ষেপ নিয়ে তিনি তার লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছিলেন এবং এই পদক্ষেপ কার্যকর করতে তিনি এমনকি জনসাধারণের প্রসাবখানার উপর কর আরোপ করেন।

[ভ্যাসপাসিয়ান]

তীত (টাইটাস): ৭৯-৮১ খ্রীষ্টাব্দ

তীত তার সার্বজনীন উদারতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। রোমে আরও এক বার আগুন লাগা, মহামারী, ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ভিসুভিয়াস পর্বতের আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের কারণে তার সংক্ষিপ্ত রাজত্বকাল বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। আগ্নেয়গিরির তরঙ্গায়িত কাদামাটির স্রোতে হাকুলেনিয়াম শহর এবং ছাই ও ঝামাপাথরের ধারায় পম্পে শহর ঢাকা পড়ে। প্লিনি দ্যা ইয়াগারের চিঠিগুলোতে এই অগ্ন্যুৎপাতের চোখে দেখা বিবরণ সংরক্ষিত রয়েছে।

ডমিশিয়ান: ৮১-৯৬ খ্রীষ্টাব্দ

ডমিশিয়ান ছিলেন তীতের (টাইটাস) ছোট ভাই। তার বাবা ও ভাই যেভাবে তাকে

[পম্পেতে প্রাচীন রোমের সর্বসাধারণের জন্য সভাস্থল, যার পশ্চাদ্ভূমিতে রয়েছে ভিসুভিয়াস পর্বত।]

অজ্ঞাত অবস্থায় রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন, তাতে তিনি বিরক্ত বোধ করতেন। তাই যখন তিনি সম্রাট হন, তখন তিনি নিজেকে এক জন স্বেচ্ছাচারী শাসক হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস পান। তিনি চাইতেন যেন তাকে 'প্রভু ও ঈশ্বর' হিসেবে সম্বোধন করা হয়। তিনি তার সময়কালে যিহূদী ও খ্রীষ্টিয়ানদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিলেন। তার রাজত্বকালেই যোহনকে পাট্‌ম দ্বীপে নির্বাসিত করা হয় এবং সেখানকার কারাগারে বসে তিনি 'প্রকাশিত বাক্য' নামে পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের বইটি লিখেছিলেন (প্রকাশিত বাক্য ১:৯)। ডমিশিয়ানকে গুপ্তভাবে হত্যা করার মধ্য দিয়ে তার রাজত্বকালকে সংক্ষিপ্ত করা হয়।

নার্ভা: ৯৬-৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

ডমিশিয়ানের পরবর্তী সম্রাট ছিলেন নার্ভা। তিনি ছিলেন রোমের সংখ্যাগরিষ্ঠ সভার বয়োজ্যেষ্ট সদস্য, যিনি প্রাথমিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক-সম্রাট হিসাবে কাজ করেন এবং এভাবে ৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্যের মধ্যে যে অরাজকতা দেখা যায়, তা এড়িয়ে যেতে সক্ষম হন। তিনি উত্তরসূরী হিসেবে এক জন সক্ষম স্পেনবাসী, ট্রাজানকে নির্বাচন করেন।

বিদেশী সম্রাটগণ

ট্রাজান: ৯৮-১১৭ খ্রীষ্টাব্দ

ট্রাজান ছিলেন প্রথম প্রাদেশিক শাসনকর্তা, যিনি সম্রাট হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। ধারাবাহিকভাবে অসংখ্য সামরিক প্রচারণার (১০১-১০৬ খ্রীষ্টাব্দ) পরে, দানিয়ুবের উত্তরে অবস্থিত দাসিয়া (বর্তমান রোমানিয়া) দখল করেন। আর রোমে সর্পিলাকার উদ্‌গত শিল্পকর্ম সম্বলিত বিজয় স্তম্ভের মধ্য দিয়ে তার এই কৃতিত্বকে স্মরণীয় করে রাখা হয় (বর্তমানে সেই স্তম্ভের শীর্ষে প্রেরিত পিতরের মূর্তিকে সংস্থাপিত করা হয়েছে)। এছাড়াও আরবীয় প্রদেশ হিসেবে তিনি নবায়োতীয়দের রাজ্যকে (যর্দন পরবর্তী অংশ ও সিনাই উপদ্বীপ) তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি অল্প সময়ের জন্য পার্থিয়দের কাছ থেকে আর্মেনিয়া ও মেসোপটমিয়া জোর করে দখল করেছিলেন।

খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি রোমীয়দের দৃষ্টিভঙ্গী

সম্রাট ট্রাজানের কাছে প্লিনির চিঠি:

[২য় শতাব্দীতে খ্রীষ্টধর্ম কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং কিভাবে খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের সাথে ব্যবহার করা হতো, তা বিথুনিয়ার শাসনকর্তা প্লিনি ও সম্রাট ট্রাজানের মধ্যকার

এই চিঠিটি তুলে ধরে।]

“মহান সম্রাট, যে সব প্রশ্নের বিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে, সেগুলোর জন্য আপনার মুখাপেক্ষী হওয়া আমার একটি স্বভাব। যখন আমি নিশ্চল হই– তখন কে আমাকে আরও ভালভাবে পথ চলার নির্দেশনা দেবে; অথবা যখন আমি কোন বিষয়ে অজ্ঞ থাকি, তখন কে আমাকে জ্ঞান দেবে? আমি খ্রীষ্টিয়ানদের বিষয়ে তদন্তে কখনো অংশ গ্রহণ করি নি। কারণ আমি জানি না যে, কোন্ অপরাধের কারণে তাদেরকে সচরাচর শাস্তি দেয়া হয় বা তাদের বিষয়ে তদন্ত করা হয়, অথবা এই বিষয়ে কি আদেশ দেয়া হয়েছে। তাই বয়সের কোন বৈষম্য কিংবা সবচেয়ে দুর্বল আক্রমণকারীর সাথে সবচেয়ে শক্তিশালীর মত ব্যবহার করা হয় কিনা; কিংবা যারা অনুতপ্ত হয়, তাদেরকে ক্ষমা করা হয় কিনা; কিংবা যে ব্যক্তি এক সময় খ্রীষ্টিয়ান ছিল, এখন ঐ ধর্মমত পালন করা থেকে বিরত থেকে কোন কিছুই পায় কিনা; গোপন অপরাধকে রেখে কেবল নামে মাত্র শাস্তি দেয়া হচ্ছে কিনা, কিংবা নামের সাথে সংযুক্ত কোন গোপন অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে কিনা– এই সব বিষয়ে আমার বিন্দু মাত্র অনিশ্চয়তা নেই বললেই চলে। আর এটিই হলো অভিযুক্ত লোকদের পুরো ঘটনার বিবরণ, যাদেরকে খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে আমার সামনে আনা হয়েছিল, আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তারা খ্রীষ্টিয়ান কিনা। আর যদি তারা স্বীকার করতেন, তবে আমি তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার আবারও জিজ্ঞাসা করতাম। আর যদি তারা আমার প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চুপ থাকতো, তবে আমি তাদেরকে মেরে ফেলার অনুমতি দিতাম। তারা যাকে সত্য বলে মনে করতো, সেটি কি ছিল– সেই বিষয়ে আমার কোন প্রশ্ন ছিল না কারণ যাই ঘটুক না কেন, উল্লেখিত সত্যের বিষয়ে যদি তাদের মধ্যে একগুঁয়েমি ও অনমনীয় মনোভাব লক্ষ্য করা যেতো, তবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হতো। আর এই উন্মাদ প্রকৃতির আরও লোক ছিল, যারা রোমীয় নাগরিক– তাই তাদের কথা লিখে আমি রোমে পাঠিয়ে দিলাম।

“খ্রীষ্টিয়ানরা যে বিষয়টিকে সত্য বলে মনে করেছিল, সেটি আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনিই রয়েছে। উল্লেখ করার মত নিছক ঘটনাটি হলো এই যে, অপেক্ষা-কৃত সাধারণ হয়ে ওঠা এই বিষয়টি এবং একে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া বেশ কিছু পৃথক ঘটনার দিকে দৃষ্টি দেয়ার জন্য অভিযোগ রয়েছে। অসংখ্য নামের উল্লেখ সহকারে স্বাক্ষরবিহীন একটি কাগজ উপস্থাপন করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, যারা বলেছিল, তারা খ্রীষ্টিয়ান ছিল না, কিংবা আদৌ খ্রীষ্টিয়ানও নয়– আমি তাদেরকে ছেড়ে দেয়া সঠিক বলে মনে করেছি কারণ দেবতাদের উদ্দেশ্য তাদের নিবেদিত প্রার্থনাকে, আমি আমার লেখাতে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি। তারা

আপনার মূর্তির কাছে সুগন্ধী ও আংগুর-রস সহকারে প্রার্থনা উৎসর্গ করেছে। আর আমি ওগুলো রাজসভায় নিয়ে আসার আদেশ দিই যেন দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করার এবং খ্রীষ্টকে অভিশাপ দেয়ার কাজে ব্যবহার করা যায়– এই জিনিসগুলো (যেভাবে বলা হয়েছে), যারা সত্যিকার অর্থে খ্রীষ্টিয়ান, তাদেরকে দিয়ে করা সম্ভব নয়। যাদের নাম গুপ্তচররা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছেন, তারা বলেছেন যে, তারা খ্রীষ্টিয়ান ছিল এবং তারপর ব্যাখ্যা তুলে ধরার মধ্য দিয়ে আবার অস্বীকার করে বলেন যে, যদিও তারা খ্রীষ্টিয়ান ছিল, তবে এদের কেউ তিন বছর আগে, কেউবা বেশ কিছু বছর আগে এবং কেউ আবার এমনকি বিশ বছর আগে এই ধর্মমত পালন করা ছেড়ে দিয়েছে। আর এখন এদের সবাই আপনার মূর্তি ও দেবতাদের প্রতিমূর্তিকে পূজা করে এবং খ্রীষ্টকে অভিশাপ দেয়।

“যাহোক, তারা ঐ সত্যে অটল থেকে যে ভুলটি করে সেটি হলো এই যে, অভ্যাসবশত একটি নির্দিষ্ট দিনে সূর্যদয়ের আগে তারা একত্রিত হয় এবং দেবতা হিসেবে খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে পালাক্রমিকভাবে এক ধরণের বাক্য উচ্চারণ করে। শপথ সহকারে এক সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখে এবং যে কোন অপরাধ থেকে, যেমন– চুরি, ডাকাতি অথবা ব্যভিচার নিজেদের দূরে রাখে; প্রতিশ্রুতি না ভাঙ্গা এবং যারা তাদের কাছে কোন জিনিস বা অর্থ রাখলে ও পরে তা ফিরিয়ে নিতে চাইলে তা দিতে অস্বীকার করে না, ইত্যাদি।”

প্লিনিকে দেয়া সম্রাট ট্রাজানের উত্তর:

“আমার প্রিয় সেকান্ডাস, যাদের বিষয়ে আপনার কাছে খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে অভিযোগ করা হয়েছিল, তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার বিষয়গুলোর মধ্যে আপনি সঠিকটিই বেছে নিয়েছেন। তবে অবশ্যই আইনগত পর্যায়ক্রমিক ধারার সাথে সম্পৃক্ত সাধারণ প্রশাসনিক বিষয়ের মত কোন কিছুই এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না। আর তাদেরকে খুঁজে বের করাও সম্ভব নয়। কিন্তু যদি তারা অভিযুক্ত ও অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তবে তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে। আর এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, যদি কেউ নিজেকে খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে অস্বীকার করে এবং তার কর্মকান্ডের দ্বারা, তথা আমাদের দেবতাদেরকে পূজা করার মাধ্যমে সে যদি বিষয়টিকে সরল করে তোলার চেষ্টা করে, তবে তার অতীত আচার-আচরণ সন্দেহজনক হলেও, প্রায়শ্চিত্তের উপর ভিত্তি করে তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে। অস্বাক্ষরিত যে কাগজপত্রগুলো তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলোকে কোন অভিযোগের ক্ষেত্রেই সত্য বলে গ্রহণ করা উচিৎ নয়– কারণ উদাহরণ হিসেবে এগুলো আদৌ গ্রহণযোগ্য এবং আমাদের সময়োপযোগী নয়।”

আরও এক জন স্পেনবাসী ও সম্রাট ট্রাজানের আত্মীয় হাড্রিয়ান গ্রীক সংস্কৃতির প্রশংসাকারী, অবিরাম ভ্রমণকারী এবং বিস্ময়কর নির্মাতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সম্রাট হওয়ার পর, হাড্রিয়ান বুদ্ধিমত্তার সাথে সদ্য জয় করা অঞ্চল আর্মানিয়া ও মেসোপটমিয়াকে ফিরিয়ে দেন এবং সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তকে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে নিয়ে আসেন। তিনি পশ্চিমে তার নাম অনুসারে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের মাঝখান দিয়ে সুবিশাল দেয়াল নির্মাণ করেন। আর তিনি রোমে আগ্রিপ্পের প্যানথিয়ান ভবনের পুনর্নির্মাণ করেন এবং টিবুরে (টিভলি) খুবই ব্যয়বহুল একটি ভবন নির্মান করেন। সুবৃহৎ বৃত্তাকার সমাধিস্থল, যেখানে তাকে সমাহিত করা হয়– বর্তমানে এটি স্যান এঞ্জেলো দুর্গ নামে পরিচিত। তার রাজত্বকালেই বারকোচবার দ্বিতীয় মহা যুদ্ধ শুরু হয় (সময়কাল: ১৩১-১৩৫ খ্রীষ্টাব্দ)।

[ট্রাজানের বিজয় স্তম্ভের একটি অংশ, যেটি ১১৩ খ্রীষ্টাব্দে দাকিয়ার উপর সম্রাট ট্রাজানের বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে রোমের ফোরামে (রোমের জনসাধারণের সভাস্থল) নির্মাণ করা হয়েছিল। আর এই যুদ্ধের বিভিন্ন দৃশ্যাবলীকে সর্পিল আকারে স্তম্ভের গায়ে খোদাই করা হয়েছে।]

সম্রাট হাড্রিয়ানের উত্তরসূরি হিসেবে এন্টোনিনাস (১৩৮-১৬১ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন গল থেকে আসা প্রথম সম্রাট। তার সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও ভদ্রতার জন্য তাকে ধার্মিক বলে ডাকা হতো। আবার তার উত্তরসূরি মার্কাস অর্লিয়াস (১৬১-১৮০ খ্রীষ্টাব্দ) তার বৈরাগ্যবাদী দর্শন ও ধ্যান বিষয়ক দার্শনিক রচনার জন্য খুবই বিখ্যাত ছিলেন। তার রাজত্বকাল মহামারী ও সীমান্তবর্তী দানিয়ুব আক্রমণে অবরুদ্ধ হয়ে পরে। ভিয়েনাতে প্রচারণা চলাকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

[সম্রাট হাড্রিয়ান (রাজত্বকাল: ১১৭-১৩৮ খ্রীষ্টাব্দ), যিনি রোম সাম্রাজ্যের আয়াতনকে কমিয়ে, এটিকে সুরক্ষিত করেন।]

মার্কুস অর্লিয়াসের অযোগ্য ছেলে কমোডাস (১৮০-১৯২ খ্রীষ্টাব্দ) মহৎ ছিলেন না– যেমন তার বাবা ছিলেন। সাম্রাজ্য পরিচালনার চেয়ে তিনি গ্লাডিয়েটরদের ক্রীড়াশৈলী ও খেলাধুলার প্রতি বেশি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন

পুরোপুরি কুখ্যাত এক ব্যক্তিত্ব। সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা বাহিনী (প্রেটুরিয়ানরা) তাকে গোপনে হত্যা করার সাথে সাথে সিংহাসন নিলামে সর্বোচ্চ দামে বিক্রি করে দেয়।

সেভেরি

১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্টিনেক্স ও ডিডিয়াস জুলিয়ানাসের সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালের পরে, 'সেভেরি' নামের ছয় জন শাসকের একটি বংশানুক্রমিক ধারা রোম সাম্রাজ্যের ক্ষমতায় আসে। আর এই ধারার শাসকদের সর্বপ্রথম জন ছিলেন সেপ্টিমিয়াস সেভেরাস (১৯৩-২১১ খ্রীষ্টাব্দ)– লিবিয়ার লেপটিস ম্যাগনাতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং শহরটিকে সেভেরিয়রা খুবই সৌন্দর্যমন্ডিত করে তুলেছিলেন এবং এর ধ্বংসাবশেষগুলো এখন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও চমকপ্রদ বিষয়।

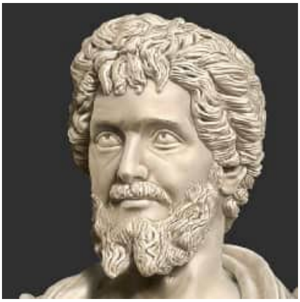

[সম্রাট সেপ্টিমিয়াস সেভেরাস, যিনি তার রাজত্বকালের অধিকাংশ সময় সামরিক প্রচারণার কাজে ব্যয় করেন– প্রথমে পার্থিয়াতে তিনি তার এই প্রচারণা চালান এবং তারপর ব্রিটেনে (ইংল্যান্ডে), যেখানে তিনি মারা যান।]

কারাকাল্লা: ২১১-২১৭ খ্রীষ্টাব্দ

ছেলে কারাকাল্লার প্রতি বাবা সেভেরাসের উপদেশ: 'তোমার সৈন্যবাহিনীকে সমৃদ্ধ কর এবং অন্য লোকদেরকে অবজ্ঞা কর' এবং বাবার এই আদেশকে ছেলে গ্রহণ করেন। কর ও সৈন্য-নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সম্রাট কারাকাল্লা ২১২ খ্রীষ্টাব্দে, সব স্বাধীন লোকদেরকে তার সম্রাজ্যে নাগরিকত্বের অনুমোদন দেন। কিন্তু এই সময় রোমীয় নাগরিকত্ব সুযোগ-সুবিধার চেয়ে লোকদের কাছে আরও বোঝা হয়ে ওঠে।

এলাগাবালাস: ২১৮-২২২ খ্রীষ্টাব্দ

সম্রাট এলাগাবালাস নিজের শহরে সিরিয়ার এমিসার সূর্য দেবতাকে তার সাম্রাজ্যের প্রধান দেবতা হিসেবে উপস্থাপন করেন। তার নৈতিক অবক্ষয় ও লাম্পট্যের জন্য তাকে অবজ্ঞা করা হয় এবং সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা বাহিনী (প্রেটুরিয়ানরা) তাকে হত্যা করে। তার উত্তরসূরী সেভেরাস আলেকজান্ডার (২২২-২৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) ইস্রায়েলের উত্তর-পশ্চিমে অক্কোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অব্রাহাম, প্রভু যীশু ও টায়ানার এপোলোনিয়াসকে সমানভাবে ভক্তি করতেন। আর এই সময় পারস্যের নতুন সাসানীয় সাম্রাজ্য ও জার্মান সীমান্তবর্তী বার্বারীয়রা তাকে হুমকি দেয়। এভাবে আরও একটি বার বিদ্রোহী সৈন্যরা সম্রাটকে হত্যা করে।

খ্রীষ্টধর্ম ও সম্রাটগণ

পরবর্তী পঞ্চাশ বছর (২৩৫-২৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) সেনানিবাস থেকে উঠে আসা প্রায় ছাব্বিশ জনের মত সম্রাটের দ্রুত সিংহাসনে আরোহণ ঘটে। আর এদের মধ্যে কেবল এক জনের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

ডেসিয়াস: ২৪৯-২৫১ খ্রীষ্টাব্দ

উপরোল্লিখিত ছাব্বিশ জনের মধ্যে ডিসিয়াস নামে এক জন সম্রাট তার রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের মধ্যে খ্রীষ্টিয়ানদের উপর ব্যাপক হত্যাকান্ড চালায়।

ডায়োক্লিশান: ২৮৫-৩০৫ খ্রীষ্টাব্দ

সম্রাট ডায়োক্লিশান এসেছিলেন ইলিরিকাম (যুগোশ্লাভিয়া) থেকে। তিনিও খ্রীষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে নির্মম হত্যাকান্ড পরিচালনা করেন। যিনি তখনকার নুয়ে পড়া অর্থনীতির উন্নয়নে নির্ধারিত মূল্যে জিনিসপত্র বিক্রয়ের নীতিকে প্রবর্তন করেন। তবে ব্যবসায়ীদের পণ্যসামগ্রী ফেরত নেয়ায় ও মজুত রাখায় তার এই উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আর এভাবে অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফিতি দেখা দেয়। ডায়োক্লিশানের রাজত্বকালে চৌদ্দ বছরের মধ্যে ১০০ দিনারি মূল্যের ১ পেক (প্রায় ৯ কেজি) ময়দার দাম হয় ১০,০০০ দিনারি।

সম্রাট ডায়োক্লিশান মূলত চার জন প্রাদেশিক শাসকের দ্বারা পুরো সাম্রাজ্য শাসন করতে চেয়েছিলেন: এক জন আগস্ত ও এক জন সিজার (কৈসর) থাকবেন সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশে এবং এক জন আগস্ত ও এক জন সিজার (কৈসর) থাকবেন সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে। কনস্টানটাইনের বাবা কনস্টানটিয়াস ক্লোরাস ছিলেন সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশের সিজার (কৈসর)। যখন ডায়োক্লিশান সম্রাট হিসেবে তার ক্ষমতা ছেড়ে দেন, তখন তার উত্তরসূরী নির্ধারণে খোলাখুলিভাবে যুদ্ধ শুরু হয়।

কনস্টানটাইন একটি দর্শন পেয়েছেন বলে দাবী করেন যে, 'চি-রো' (খ্রীষ্টের নাম নির্দেশ করতে গ্রীক বর্ণমালার প্রথম দুইটি অক্ষর) চিহ্নে তার রাজ্য জয় করা উচিৎ। ৩১২ খ্রীষ্টাব্দে রোমের উত্তরে মিলভিয়ান ব্রিজের যুদ্ধে তিনি সম্রাট ম্যাক্সেনটিয়াসকে পরাজিত করেন। ৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসিনিয়াস ও পশ্চিমাংশের দায়িত্বে নিয়োজিত আগস্তকে নিয়ে কনস্টানটাইন খ্রীষ্টিয়ান সহ সব ধর্মের প্রতি সহনশীলতার অনুমোদন দিয়ে মিলানের অধ্যাদেশ জারী করেন।

কনস্টানটাইন ৩২৪-৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একক ভাবে সম্রাটের দায়িত্ব পালন করেন

এবং প্রকাশ্যে খ্রীষ্টধর্মকে সমর্থন করেন, যদিও তার মৃত্যুর কিছু দিন আগে পর্যন্ত তিনি বাপ্তিস্ম নেন নি। খ্রীষ্টিয় ধর্মমতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে নিকায়ার পরামর্শসভার আয়োজন করা হয়, যা ছিল খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সমাবেশ। আর ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাইজেন্টিয়ামে কনস্টান্টিনোপল নামে একটি নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। তার মা হেলেনা বৈৎলেহমের একটি গুহার উপরে যীশুর পবিত্র জন্মস্থানের মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেন। আর এই বৈৎলেহম ছিল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঐতিহ্যগত জন্মস্থান এবং এখানেই কালভেরীর নির্ধারিত জায়গায় রয়েছে ঐতিহ্যবাহী যীশুর পবিত্র সমাধিস্তম্ভের মণ্ডলী।

[সম্রাট কনস্টনটাইনের বিজয়ের প্রতীক।]

[ইংল্যান্ডের হ্যামশায়ারে অবস্থিত পোর্টচেস্টার দুর্গ, যা উপকূলকে অ্যাংলো-স্যাক্সন আক্রমণ-কারীদের হাত থেকে রক্ষা করতে রোমীয়রা ৩০০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেছিল।]

সাম্রাজ্যের নেতৃবর্গ

সাম্রাজ্যের সংগঠিতকরণ

রোম সরকার

রোমে প্রজাতান্ত্রিক সরকার চলাকালে সাম্রাজ্যের বাইরের অসংখ্য বিদেশী প্রদেশ দখল করা হয়। তাই 'প্রোকন্সুলাস' হিসেবে প্রাক্তন নিম্ন আদালতের বিচারকদের পরিচিত একটি প্রথাগত বিষয় হয়ে ওঠে যেন প্রাদেশিক বিষয়গুলোকে তাদের কাছে পাঠানো হলে তারা শাসনকর্তা হিসেবে কাজ করতে পারেন। আগেকার সাম্রাজ্যের দুই ধরণের প্রদেশ ছিল: অপেক্ষাকৃত শান্ত এলাকাগুলো 'পারিষাদিক' প্রদেশ বলা হতো এবং এগুলো প্রোকন্সুলসরা শাসন করতেন। অন্যদিকে, সম্রাটের প্রতিনিধিরা অস্থির সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলোকে শাসন করতেন। ২য় খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট নিজেই এই দুই ধরণের প্রদেশকে শাসন করতেন। ধনী প্রদেশ মিশরের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা জারী ছিল, সম্রাটের অনুমতি ছাড়া কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ সভার সদস্য সেখানে পরিদর্শন করতে যেতে পারতেন না।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫১ সালে কিলিকিয়ার শাসনকর্তা সিসেরোর মত চমৎকার ও নিরপেক্ষ মনের শাসনকর্তা খুবই কম ছিল। তবে সিসিলির শাসনকর্তা ভেরিসের মত কুখ্যাতরাই বেশি ছিল। এক বার সিসেরো ভেরিসকে জোর করে কর আদায়ের দায়ে ফৌজদারীরতে সোপর্দ করেন। প্রাদেশিক লোকজন ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তাদের শাসনকর্তার কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে খুব কমই অভিযোগ করতে পারতেন। তাদের বিরুদ্ধে এই প্রচেষ্টা কেবল তখনই করা যেতো, যখন তার দাপ্তরিক ক্ষমতার সময়কাল শেষ হয়ে যেতো। যিহূদিয়ার শাসনকর্তা আলবিনাসের (সময়কাল: ৬২-৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) জোসিফাস লিখেছিলেন: 'কেবল দাপ্তরিক ক্ষমতার অপব্যবহারই নয়, বরং তিনি ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি চুরি ও লুণ্ঠন করেন এবং বাড়তি কর আরোপ করে পুরো জাতির উপর বোঝা চাপিয়ে দেন; কিন্তু তিনি তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে মুক্তিপন আদায় করেন তাদের পক্ষ হয়ে, যাদেরকে ডাকাতির জন্য স্থানীয় পরিষদ বন্দী করেন।' পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের 'প্রেরিত' নামের পুস্তকটির লেখক তুলে ধরেছিলেন যে, প্রেরিত পৌলের বন্দীত্ব থেকে মুক্তির জন্য তাঁর কাছ থেকে যিহূদিয়া প্রদেশের শাসনকর্তা ফীলিক্স ঘুষ প্রত্যাশা করেছিলেন (প্রেরিত ২৪:২৬)।

সৈন্যদের খাবার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, যাতায়াত অথবা অন্যান কাজের ফরমাশ দেয়ার অধিকারই ছিল শাসনকর্তার ক্ষমতার বিশেষ অপ্রীতিকর দিক। মূলত এটি

ছিল সেই রীতি, যেটিকে প্রভু যীশু উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'আর যে কেউ এক মাইল যেতে তোমাকে পীড়াপীড়ি করে, তার সঙ্গে দুই মাইল যাও' (মথি ৫:৪১)। এই উক্তিকে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, যখন রোমীয়রা কুরীণী শহরের শিমোন নামের এক পথিককে গলগাথার পথে প্রভু যীশুর ক্রুশকে বহন করতে বাধ্য করেন (মথি ২৭:৩২)।

সচরাচর শাসনকর্তারা রাজধানীতে বসবাস করতেন এবং সুনির্দিষ্ট সময় ভিত্তিতে কেবল প্রদেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। সাধারণ দৈনন্দিন সরকারী কাজগুলোর দায়িত্বভার স্থানীয় কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেয়া হতো। আর এরা ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর সদস্য, যাদের স্বায়ত্বশাসিত রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সময় থাকতো এবং প্রত্যাশিত সেবার ব্যয়ভার বহনের মত ধন-সম্পত্তি এদের ছিল। করিন্থের ইরাস্ত প্রেরিত পৌলের দ্বারা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন (রোমীয় ১৬:২৩), যিনি ঐ শহরের এক জন কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। প্রাচীন করিন্থের একটি ল্যাটিন লেখা পাওয়া যায়, তাতে উল্লেখিত ইরাস্ত ছিলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত গণপূর্ত বিভাগের এক জন কর্মকর্তা (এইডাইল) এবং এটি দিয়ে সম্ভবত ঐ একই ব্যক্তিকে বোঝান হয়েছে।

পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের 'প্রেরিত' পুস্তকটিতে লূকের দ্বারা উল্লেখিত অন্যান স্বায়ত্বশাসিত কর্মকর্তাদের মধ্যে থিষলনীকীয়ের 'পলিটার্চ/ নগর প্রশাসক' (প্রেরিত ১৭:৬) এবং ইফিষের 'এশিয়ার্চ/ প্রেরিত পৌলের রাজকর্মচারী বন্ধুরা' (প্রেরিত ১৯:৩১), যিনি তাঁকে উল্লেখিত জনসভায় দাঙ্গার আশঙ্কায় যেতে নিষেধ করেছিলেন। আর এই রাজকর্মচারীরা ছিলেন প্রদেশের সবচেয়ে ধনী লোকদের মধ্যে অন্যতম। ইফিষের নগর সম্পাদক (গ্রামাটিয়াস) নিছক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ক্ষমতাহীন ব্যক্তি ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন নগরের গণতান্ত্রিক কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা (প্রেরিত ১৯:৩৫)।

রোমীয় কর ব্যবস্থা

রোমীয়রা এবং যারা প্রদেশে বসবাস করতেন, তাদেরকে সব ধরণের কর দিতে হতো। জমি ও অন্যান ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর 'ট্রিবিউটাম' নামে সরাসরি কর আরোপিত ছিল। 'ভেগটিগালিয়া' নামে অন্যান বিভিন্ন ধরণের কর প্রচলিত ছিল। সম্রাট সিজারের (কৈসর) সময় যিহূদিয়াতে উৎপাদিত ফসলের ১২.৫% কর হিসেবে নির্ধারিত ছিল। স্ত্রীলোক ও দাস/দাসী সহ প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ককে মাথাপিছু কর– এক দিনের পারিশ্রমিক দিতে হতো (পবিত্র বাইবেলের কিংস জেমস সংস্করণে 'দিনারি'কে অনুবাদ করে ইংল্যান্ডের 'পয়সা' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল কারণ দিনারির জন্য

সাম্রাজ্যের সংগঠিতকরণ

প্রাচীন ব্রিটিশ মুদ্রামানের এক পয়সার প্রতীক ছিল ‘d’)। সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর ছিল ১% এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ধন-সম্পত্তির উপর আরোপিত কর ছিল ৫%। যে সব লোকেরা দাস/দাসীদেরকে ক্রয় করতো, তাদেরকে ক্রয়মূল্যের উপর ৪% কর দিতে হতো এবং ৫% কর দিতে হতো যদি তারা ঐ সব দাস/দাসীদের কাউকে মুক্ত করে দিত।

আর রাজস্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল সামুদ্রিক বন্দর এবং সীমান্তবর্তী অবস্থানগুলোতে আমদানী ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রদেয় শুল্ক। কিছু পন্ডিতরা বিশ্বাস করেন যে, মথি যিনি কফরনাহূমে কর আদায়কারী (মথি ৯:৯) হিসেবে কাজ করতেন এবং সক্কেয় ছিলেন যিরীহোর প্রধান কর আদায়কারী (লূক ১৯:২)− যিহূদিয়া ও পেরিয়ার (যর্দন নদীর অন্য পার) সীমান্তবর্তী অঞ্চল হিসেবে এই যিরীহোতে টোল আদায়কারীরা অবস্থান করতেন। আরব থেকে আসা সুগন্ধীর উপর ২৫% সমমূল্যের টোল ছাড়া অন্যান্য সামগ্রীর উপর টোল ছিল ২-২.৫% মধ্যে।

রোম প্রজাতন্ত্রের শেষের দিকে, সমাজের অশ্বারোহীণের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রেণী থেকে আসা কর-জোতদার নামের কর-সংগ্রাহকরা কর আদায় করতেন। তারা চুক্তির ভিত্তিতে কোন প্রদেশ থেকে কর আদায়ের জন্য দরপত্র উপস্থাপন করতেন। আর সেই দরপত্র অনুসারে, কর আদায়ের আগেই তাতে প্রস্তাবিত অর্থ তাদেরকে দিতে হতো− তারপর তারা যতটা সম্ভব কর ঐ প্রাদেশিক জনগণের কাছ থেকে আদায় করে নিতো, কারণ প্রদানকৃত অর্থের অতিরিক্ত যা থাকতো, সেটাই ছিল দরপত্রে তাদের লাভ। আর এভাবে কর আদায় প্রক্রিয়া প্রচন্ড লালসা ও অপব্যবহারের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। সম্রাট ট্রাজান এই কর আদায় করার প্রক্রিয়াকে পাল্টে দিয়ে সেখানে কর্মকর্তাদেরকে নিয়োগ করেন, যারা আদায়কৃত করের নির্ধারিত অংশ তাদের পারিশ্রমিক হিসেবে লাভ করতেন। যিহূদিয়া প্রদেশের কর সংগ্রাহকরা অসৎ ছিলেন বলে মনে করা হয়। আর এই ঘটনার সত্যতা রব্বিদের লেখা ও পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়ম থেকে যাচাই করা যেতে পারে (উদাহরণ হিসেবে সক্কেয়ের কথা বলা যেতে পারে, যিনি প্রভু যীশুকে বলেন, ‘প্রভু দেখুন, আমার সম্পত্তির অর্ধেক আমি দরিদ্রদেরকে দান করছি; আর যদি অন্যায়পূর্বক কারো কিছু হরণ করে থাকি, তার চারগুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি’ (লূক ১৯:৮)।

সাম্রাজ্যের শেষের বছরগুলোতে, সম্রাটরা তাদের জাঁকাল বিলাসীতা ও সৈন্যবাহিনী প্রতিপালনের ব্যয়ভার বহনের জন্য তহবিল বাড়ানোর চেষ্টা চালাতে গিয়ে জনগণের উপর কর আরোপের মাধ্যমে রক্ত ঝরিয়ে তাদেরকে নিঃশেষ করে ফেলেন।

রোমীয় সৈন্যবাহিনী

রোমীয় সৈন্যবাহিনীতে ছিল তিন শ্রেণীর সৈন্য: প্রিটোরিয়ান গার্ড; লিজিওনারীস এবং সহায়ক সৈন্য বাহিনী।

প্রিটোরিয়ান গার্ড/ সম্রাটের দেহরক্ষী বাহিনী

প্রিটোরিয়ান গার্ড ছিল সম্রাট অগাস্তের গড়ে তোলা সম্রাটের দেহরক্ষী বাহিনী দিয়ে। ১২-১৬টি কোহর্ট নিয়ে গঠিত হতো এবং প্রায় ৫০০ জন লোক নিয়ে এক একটি কোহর্ট গঠন করা হতো। আর এই প্রিটোয়ান গার্ডের সদস্যরা রোমে অবস্থান করতেন। এই দলের সদস্য বড় অঙ্কের অর্থ বেতন পেতেন এবং তাদের কার্যকাল ছিল খুব সংক্ষিপ্ত– ১৬ বছর এবং কাজ ছিল খুবই হালকা ধরণের। প্রেরিত পৌল যখন রোমে বন্দী ছিলেন, তখন তাকে এই প্রিটোরিয়ান গার্ডের এক সদস্যের অধীনে শিকল দিয়ে বাঁধা হয়েছিল (প্রেরিত ২৮:১৬,২০)। তার প্রচারের ফলে, খ্রীষ্টিয় সুসমাচারের বার্তা সমগ্র প্রিটোরিয়ান শিবিরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্রাট ক্লৌদিয় তার সিংহাসন আরোহণের সময় প্রিটোরিয়ান গার্ডদের জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিকের চেয়ে বাড়তি পাওনার ব্যবস্থা করে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এবং তার রাজত্বকাল থেকেই, পূর্ববর্তী কোন সম্রাটকে গোপনে হত্যা করা হলে, সম্রাটের এই দেহরক্ষী দলের লোকেরা নতুন সম্রাটকে প্রতিষ্ঠা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।

[খড়্গ, বর্ম ও বর্শা সজ্জিত সম্রাটের দেহরক্ষী বাহিনীর এক জন সৈনিক।]

লিজিয়নারীস (বাহিনী)

প্রধান সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীগুলোই লিজিয়নারীস অথবা পদাতিক সৈন্যবাহিনী নামে পরিচিত ছিল– রোমীয় নাগরিকদের মধ্য থেকে এদেরকে নিয়োগ করা হতো। সম্রাট ট্রাজানের সময়– ইতালী নিজে পাঁচ বাহিনী সৈন্যের মধ্যে কেবল একটি বাহিনী সরবরাহ করেছিল। যদিও অনেকে ১৪ বছর বয়সে এই সৈন্যদলে তালিকাভুক্ত

হতো, তবে তালিকাভুক্তির সাধারণ বয়স সীমা ছিল ১৯ বছর। দৈহিক উচ্চতা ৪.১১ ফুট (১.৪৮ মিটার) আশা করা হতো। কিন্তু ৩৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এটিকে বাড়িয়ে ৫.৫ ফুট (১.৬৪ মিটার) করা হয়েছিল।

সম্রাট আগস্তের রাজত্বকালে পঁচিশটি লিজিয়ন ছিল– কিন্তু সম্রাট সেপ্টিমিয়াস সেভেরাস এটিকে বাড়িয়ে পয়ত্রিশটি করেছিলেন। আদর্শের দিক থেকে, প্রতিটি লিজিয়নের ছিল ১০ কোহর্ট এবং প্রতিটি কোহার্টের ছিল ৫৪০ জন সৈন্য– অর্থাৎ প্রতিটি লিজিয়নের মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ৫,৪০০ জন। হতাহতের কারণে লিজিয়নের দুর্বলতা এড়াতে এদের সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায়ই বেশি রাখা হতো। প্রতি কোহর্টকে আবার ৯০ জন সৈন্যের ছয়টি শতকে উপবিভক্ত হতো, যারা এক জন শতপতির অধীনে থাকতেন। আর প্রতি লিজিয়নের সাথে যুক্ত থাকতো ১২০ জন ভাড়াটে সৈন্যের একটি দল।

[এক জন রোমীয় শতপতি।]

পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে এক জন লোকের কথা উল্লেখ রয়েছে, যিনি বলেছিলেন যে, তার নাম ‘বাহিনী’ কারণ তার মাঝে অসংখ্য মন্দ আত্মা বাস করতো (মার্ক ৫:৯)। আবার প্রভু যীশুর মৃত্যুর আগে যখন শত্রুরা তাঁকে ধরেছিল, তখন তিনি বলেছিলেন যে, যদি তিনি তার পিতার কাছে চান তবে তিনি তাকে সাহায্য করার জন্য বারটি বাহিনীর চেয়ে বেশি স্বর্গদূত পাঠিয়ে দেবেন (মথি ২৬:৫৩)।

লিজিয়ন (বাহিনী) সৈন্যের কর্মকর্তারা

লিজিয়ন বা বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সভার কূটনৈতিক প্রতিনিধির পদ

থাকতে হতো। সংখ্যাগরিষ্ঠ সভার সদস্য অথবা অশ্বারোহণ বিষয়ক পদের অধিকারী ছয় জন সামরিক বিচারকর্তা তাকে সাহায্য করতেন। রোম প্রজাতন্ত্রের সময়, প্রত্যেক উচ্চাকাঙ্খী রাজনীতিবিদকে আশা করা হতো যেন নির্বাচনে অংশগ্রহণের আগে তিনি যেন অন্তত দশ বছর সৈন্যবাহিনীতে কাজ করেন।

কোন প্রকার সৈনিকের অভিজ্ঞতা ছাড়াই কেবল সামাজিক পদ মর্যাদার ভিত্তিতে সামরিক কর্মকর্তাদেরকে নিয়োগ দেয়া হতো, তাই সাধারণ সৈনিকদের অধিকাংশই ছিল গরিব। ৯ম খ্রীষ্টাব্দে ভেরাস নামে এক জন রোমীয় সেনাপতি, নিজের দায়িত্বে সৈন্যদেরকে নিয়ে জার্মানির টিউটোবার্গ জঙ্গলে প্রবেশ করলে তার উপর হঠাৎ আক্রমণ করা হয় এবং তিনি তার সব সৈন্যদেরকে হারান। আর এই কথা শুনে সম্রাট আগস্ত রাতের মধ্য প্রহরে, চিৎকার করে ওঠেন: ‘ভেরাস, ভেরাস– আমার তিন লিজিয়ন সৈন্য তুমি ফিরিয়ে দাও।’

শতপতি

সৈন্যদের মেরুদন্ডই ছিলেন এই শতপতিরা এবং তাদের ছিল সৈনিক হিসেবে কাজ করার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা। যখন কোন শতপতিকে উন্নীত করা হতো, তখন সচরাচর তাকে অন্য লিজিয়নে স্থানান্তরিত করা হতো যেন তার অধীনস্ত সৈন্যদের সাথে তিনি ঘনিষ্ঠ না হয়ে উঠতে পারেন। এই শতপতিদের বার্ষিক বেতন ছিল এক সাধারণ সৈনিকের বেতনের পনের গুণ, অর্থাৎ ৫,০০০ দিনারি (সম্রাট ট্রাজানের রাজত্ব-কালে)। এদের মধ্যে পাঁচ জন উচ্চতর পদাধিকারী শতপতিকে বার্ষিক বেতন হিসেবে ১০,০০০ দিনারি দেয়া হতো। লিজিয়নের প্রথম বর্শাধারী অথবা প্রধান শতপতি বছরে ২০,০০০ দিনারি বেতন পেতেন।

বেতন ও সাজ-সরঞ্জাম

এক জন সাধারণ লিজিয়নারী বা বাহিনী সৈনিক বার্ষিক ২২৫-৩০০ দিনারি পারিশ্রমিক পেতেন এবং এই অর্থ থেকে তাকে তার খাবার ও কাপড় কিনতে হতো। এছাড়াও তাকে ‘লবণ ক্রয় করতে নির্দিষ্ট ভাতা’ দেয়া হতো (আর ‘স্যালারিয়াম’ তথা ভাতা কথাটি থেকে আমরা ‘স্যালারি’ শব্দটি পেয়েছি)। তাদের খাবার ছিল রুটি, সিদ্ধ নরম খাদ্যশস্য এবং অম্লরস, যা প্রভু যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় দেয়া হয়েছিল (মথি ২৭:৪৮)।

এক লিজনারী সৈন্যকে প্রায় ৮০ পাউন্ড (৩৬ কিলোগ্রাম) ওজনের একটি বোঁচকা বহন করতে হতো– আর তাতে থাকতো দুই সপ্তাহের জন্য নির্ধারিত খাদ্যদ্রব্য এবং

কোদাল ও কুড়ালের মত বিভিন্ন সরঞ্জাম। তিনি ব্রোঞ্জের শিরস্ত্রাণ মাথায় পরতেন– এই শিরস্ত্রাণটি ব্রোঞ্জের তৈরি হলেও– এর সাথে লোহার সমন্বয় করে আরো মজবুত করা হতো এবং এটি মাথায় পরা যেতো এমন একটি চামড়ার টুপির সাথে আটাকানো থাকতো। তিনি ধাতব পাতে তৈরি খন্ডিত বর্ম বুক রক্ষার জন্য ও কোমরবন্ধনী পরতেন। তিনি পায়ে বিশেষ পেরেকযুক্ত পুরু তলার স্যান্ডেল পরতেন। সুরক্ষার জন্য তিনি কাঠের স্তরযুক্ত একটি ঢাল বহন করতেন, যা ধাতব অংশের সাথে বাঁধা ও চামড়ায় ঢাকা থাকতো। তার ব্যবহৃত আক্রমনাত্বক অস্ত্রগুলোর মধ্যে ছিল ৭ ফুট দৈর্ঘ্যের ২টি বর্শা। কিন্তু তিনি মূলত ২ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি তরবারি। আর এই তরবারির দুই দিক ধারালো হলেও এটি কাটতে ও সজোরে ঢুকিয়ে দেয়ার চেয়ে সচরাচর আঘাত করতেই বেশি ব্যবহার করা হতো।

প্রেরিত পৌল এই ধরণের সৈনিকের যুদ্ধের সাজ-পোশাক ও বর্মকে রূপক অর্থে ইফিষীয়দেরকে লেখা তাঁর চিঠিতে ব্যবহার করেন: “এজন্য তোমরা ঈশ্বরের সমস্ত যুদ্ধের সাজ-পোশাক গ্রহণ কর, যেন সেই অধর্মের দিনের প্রতিরোধ করতে এবং সকলই সম্পন্ন করে দাঁড়িয়ে থাকতে পার। অতএব সত্যের কোমরবন্ধনী কোমরে বেঁধে, ধার্মিকতার বুকপাটা পরে, এবং শান্তির সুসমাচার প্রচারের জন্য পায়ে জুতা পরে দাঁড়িয়ে থাক; এসব ছাড়া বিশ্বাসের ঢালও গ্রহণ কর, যার দ্বারা তোমরা সেই শয়তানের সমস্ত অগ্নিবাণ নিভিয়ে ফেলতে পারবে; এবং পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ ও পবিত্র আত্মার খড়ুগ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ কর (ইফিষীয় ৬:১৩-১৭)।”

বাহিনী সৈন্যদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা

২০ বছর কাজ করার পরে, বাহিনী বা লিজিয়নারী সৈন্যদেরকে তাদের কাজ থেকে অব্যহতি দিয়ে তাদের জন্য কার্থেজ, করিন্থ অথবা ফিলিপ্পীর মত সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী ঔপনিবেশিক অঞ্চলে জমি বরাদ্দ দেওয়া হতো। আর ইংল্যান্ডের ইয়র্ক লিংকন, কলচেস্টার ও গ্লাউচেস্টারে এই ধরণের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করা হয়। (জায়গাগুলোর নামের শেষে ‘চেস্টার’ অথবা ‘সেস্টার’ শব্দাংশটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ‘ক্যাস্ট্রাম’ থেকে, যার অর্থ ‘শিবির’।)

১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট সেপ্টিমিয়াস সেভারাসের অধ্যাদেশ পর্যন্ত, সৈনিক থেকে শুরু করে সব পদের শতপতি পর্যন্ত– সবার বিয়ে করা নিষিদ্ধ ছিল। বিবাহিত হিসাবে যেসব পুরুষরা এই পেশায় যোগদান করতেন, তাদেরকে তাদের বিয়ে ভেঙ্গে দিতে হতো। কিন্তু শিবিরের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও লিপি থেকে দেখা যায় যে, অনেক স্ত্রীলোক তাদের সৈনিকদেরকে সাথে থাকতেন। এই সব স্ত্রীলোকদেরকে যদিও ‘স্ত্রী’

বলা হতো, তবে আইনগত দিক থেকে তারা ছিল মূলত উপপত্নী। স্ত্রীদেরকে ছেড়ে দেয়ার পর, চুক্তিভিত্তিক বিয়ে ও বংশধরদেরকে নাগরিকত্বের সুবিধা প্রদানের জন্য তাদেরকে 'ডিপ্লোমা' নামে ব্রোঞ্জের ভাঁজ করা একটি সনদপত্র দেয়া হতো।

যাহোক, ১৪০ খ্রীষ্টাব্দের পরে, কম সৈনিক নিয়োগের কারণে কেবল তালিকাভুক্ত সুদীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সৈনিকদের ছেলেদেরকেই নাগরিকত্ব দেয়া হতো। দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের পরে যে নতুন সৈনিক নিয়োগ করা হতো, তাদের অধিকাংশই ছিল সৈনিকদের ও তাদের উপপত্নীদের সন্তান।

সহায়ক সৈন্যবাহিনী

লিজিয়নারী বা বাহিনী সৈন্যের সাথে আরও সমান সংখ্যক সহায়ক সৈন্য যুক্ত হতো, যারা প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের নাগরিক ছিল না। ২৫ বছর সৈন্যবাহিনীতে কাজ করার পর, তারা নাগরিকত্ব লাভ করতো। এই সব সহায়ক সৈন্যেদের অনেকেই বিশেষ বিশেষ অস্ত্র চালনায় পারদর্শী ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, সিরিয়ার তীরন্দাজ এবং স্পেনের পূর্ব উপকূলের দূরবর্তী বেলেরিক দ্বীপের ফিঙ্গা নিক্ষেপকারীদের কথা। তাদেরকে প্রাথমিকভাবে সীমান্তবর্তী প্রদেশ থেকে নিয়োগ করা হতো এবং সাম্রাজ্যের প্রথম দিকের বছরগুলোতে তারা তাদের বাড়ির কাছাকাছি এলাকাতে কাজে নিয়োজিত থাকতো।

প্রথম খ্রীষ্টাব্দের যিহূদিয়া প্রদেশের সৈন্যরা ছিল মূলত সহায়ক সৈনিক ছিল– যাদেরকে সেবাস্টি (শমরীয়) এবং কৈসরিয়ার অযিহূদী জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে নিয়োগ করা হয়েছিল– যিহূদীদের জন্য যাদের কোন সহানুভূতি ছিল না। প্রেরিত ১০ অধ্যায়ে কর্ণীলিয়ের গল্পে এক কোহর্ট স্বেচ্ছাসেবী ইতালীয় সৈন্যের কথা উল্লেখ রয়েছে– যাদেরকে যিহূদিয়ার সহায়ক সৈন্যদের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল। আর কর্ণীলিয় এই সৈন্যদলেরই এক জন শতপতি– যেভাবে তার পরিবারের কথা তুলে ধরা হয়েছে, সেভাবে সম্ভবত স্থানীয় কোন স্বেচ্ছাসেবী (যিনি তার ল্যাটিন নামকে ঘৃণা করতেন) ছিলেন।

[তলোয়ার হাতে বর্ম সজ্জিত এক জন সহায়ক সৈনিক।]

সাম্রাজ্যের সংগঠিতকরণ

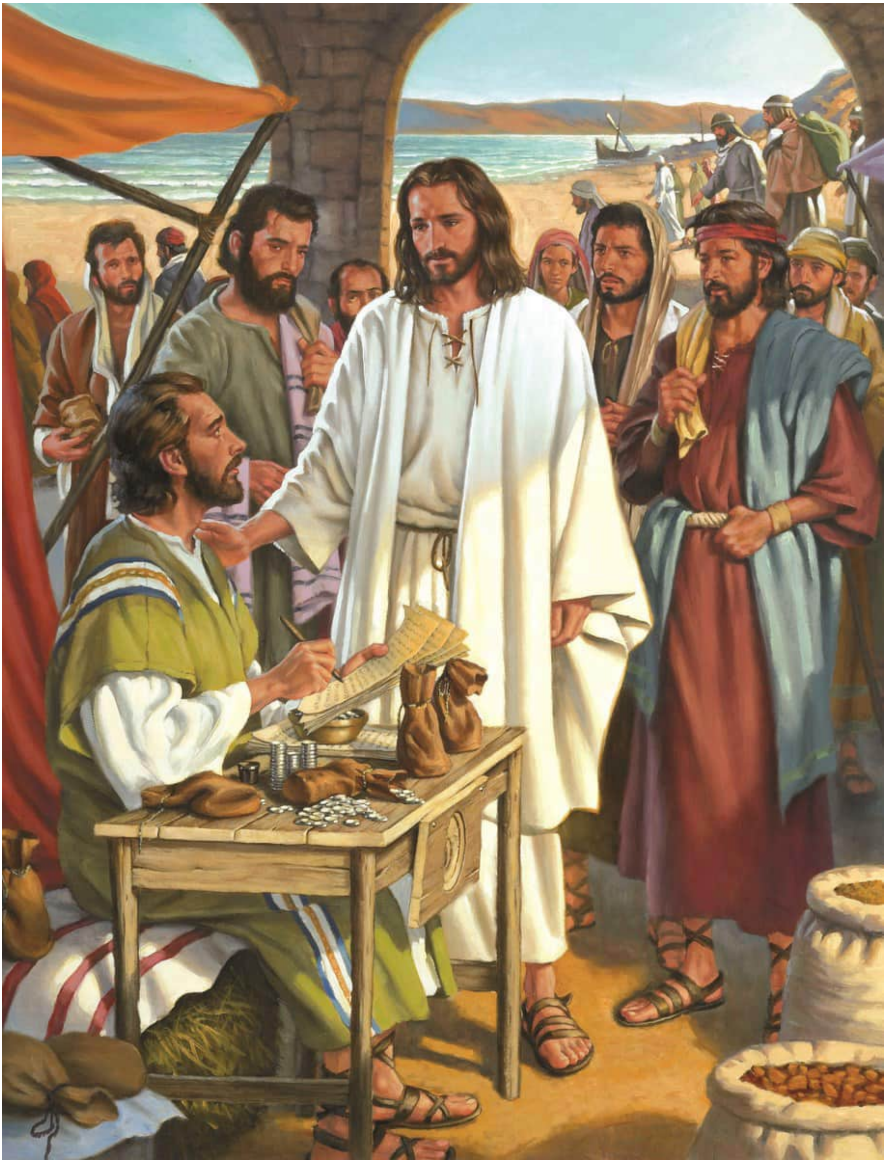

[রোমীয়দের নিয়োগকৃত কর আদায়কারী মথিকে প্রভু যীশু তাঁর শিষ্য হতে আহ্বান করেছিলেন।]

সাম্রাজ্যের সংগঠিতকরণ

প্রেরিত পৌল ইফিষীয় মণ্ডলীর কাছে লেখা পত্রে ঈশ্বরের যুদ্ধসজ্জার যে বিবরণ দিয়েছেন তা তিনি রোমীয় সৈন্যদের যুদ্ধের সাজ পোষাকের বিভিন্ন অংশ থেকে নিয়েছেন। তাদের যুদ্ধের সাজ-সজ্জার মধ্যে শিরস্ত্রাণ, বুকপাটা, ঢাল, খড়ুগ, কটিবন্ধ এবং জুতা অন্যতম ছিল। যুদ্ধের এই সব উপকরণগুলোকেই তিনি ইফিষীয় ৬:১০-১৮ পদে বর্ণনা করেছেন।

রোমের জনগণ

সিনেট সভার (সংখ্যাগরিষ্ঠ সভার) সদস্যগণ

রোমীয় সমাজের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাদের অবস্থান ছিল, তারা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সভার সদস্য। যারা রোম প্রজাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা পরিষদ হিসেবে অর্থনীতি, বৈদেশিক নীতিমালা এবং সামরিক অভিযানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। ৬০০ জন সদস্যের এই উপদেষ্টা পরিষদের প্রত্যেকের কমপক্ষে দশ লাখ সেস্টার্স (৩০,০০০ পাউন্ডের সমান) থাকবে বলে আশা করা হতো। সমুদ্রপথে ও রাষ্ট্রিয় চুক্তিভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের উপর আইনানুগ নিষেধাজ্ঞা থাকায়, তারা তাদের অর্থকে বৃহত্তর ভূসম্পত্তি খাতে বিনিয়োগ করতেন। তারা চওড়া বেগুণী ডোরাকাটা দাগ যুক্ত কাপড়ে তৈরি হাটু পর্যন্ত লম্বা, আস্তিনযুক্ত/আস্তিনবিহীন, ঢিলা পোশাক পরতেন।

আর সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ সভার গুরুত্বও কমতে থাকে। সম্রাটদের সাথে প্রতিদ্বন্দিতা করার সন্দেহে অনেক সংখ্যাগরিষ্ঠ সভার সদস্যদেরকে হত্যা করা হয়। সম্রাট নিরো ও নার্ভার রাজত্বকালের মধ্যবর্তী সময়ে (প্রায় ৮৮-৯৬ খ্রীষ্টাব্দ), সংখ্যাগরিষ্ঠ সভার অর্ধেক বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যের পরিবারকে বাদ দেয়া হয়।

[বক্তা সিসেরো সংখ্যাগরিষ্ঠ সভায় সদস্যদেরকে ক্ষমতা দখলের একটি ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সাবধান করছেন।]

সাম্রাজ্যের শাসনকালে, 'সম্রাট কৈসরের বন্ধুদল' হিসেবে পরিচিত, ২০ থেকে ৩০ জন ব্যক্তিগত সহযোগী নিয়ে গঠিত মন্ত্রীপরিষদ সম্রাটের কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠ সভার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অশ্বারোহী সৈন্য

রোমীয় বীরযোদ্ধা (ইকুইটস) বলতে যাদেরকে বোঝান হতো, তারা ছিলেন মূলত প্রজাতান্ত্রিক সৈন্যবাহিনীর ১,৮০০ জন অশ্বারোহী সৈন্য, যাদেরকে রাজ্য ঘোড়া সরবরাহ করতো। খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ সাল পর্যন্ত যেসব ধনী লোকেরা তাদের নিজেদের ঘোড়া সরবরাহ করতে পারতেন, তারাও অশ্বারোহী হতে পারতেন। তবে অশ্বারোহী সৈন্যদের জন্য সামগ্রিক সৈন্যবাহিনী প্রয়োজনীয় সহায়ক সৈন্যবাহিনীর উপর উত্তরোত্তর নির্ভর করতো বলে বাস্তবিকপক্ষে অশ্বারোহী বাহিনী, সামরিক বিভাগের পরিবর্তে হয়ে ওঠে এক রাজনৈতিক ধারা।

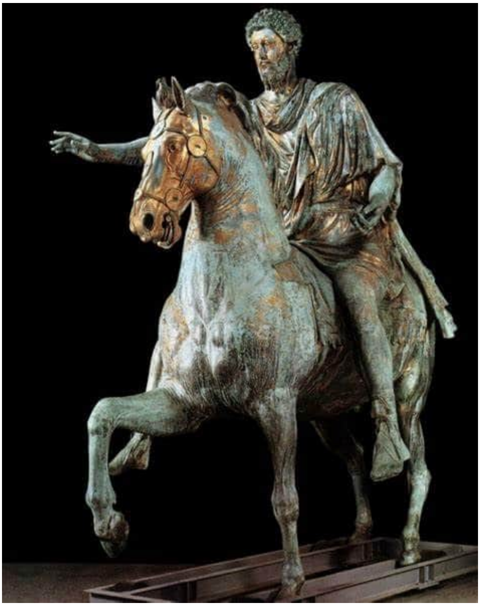

[একজন রোমীয় অশ্বারোহী সৈন্য]

সংখ্যাগরিষ্ঠ সভার সদস্যদের সংখ্যা খুবই সীমিত ছিল, কিন্তু অশ্বারোহী সৈন্যদের সংখ্যা সীমিত ছিল না। খ্রীষ্টপূর্ব ২২৫ সাল পর্যন্ত এই শ্রেণীর যোগ্যতাসম্পন্ন সদস্যের সংখ্যা ছিল ২১,০০০ জন। রঙ্গমঞ্চের বাদকদলের নির্ধারিত আসন সংরক্ষিত থাকতো সংখ্যাগরিষ্ঠ সভার সদস্যদের জন্য। অন্যদিকে, বাদকদলের পিছনের প্রথম চৌদ্দটি সারির আসন সংরক্ষিত থাকতো অশ্বারোহী সৈনিকদের জন্য।

রোম প্রজাতন্ত্রের শেষের দিকে, অশ্বারোহী সৈনিকরা এমন পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেন তারা ব্যবসায়ী ও সরাইখানার মালিক হিসেবে কর আদায় করছেন। খ্রীষ্টপূর্ব ১২৩ সালে, তারা আদালতে বসার অধিকার অর্জন করেন– যেখানে তারা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মাধ্যমে পরামর্শ প্রদানে সচেষ্ট হতেন এবং হয়ে উঠতেন শক্তিশালী রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস।

রোমের জনগণ

খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীর রোম সাম্রাজ্যের নাগরিকদের যদি কমপক্ষে ৪০০,০০০ সেস্টার্স, অথবা ১২,০০০ পাউন্ড থাকতো তবে তাদেরকে অশ্বারোহী সৈনিকদের সমান যোগ্যতাস্পন্ন বলে মনে করা হতো। তাদেরকে সরু বেগুণী ডোরাকাট দাগযুক্ত কাপড়ে তৈরি আলখিল্লা ও সোনার আংটি পরার বিশেষ অধিকার প্রদান করা হতো। কিছু কিছু লেখক বলেন, যে ধনী লোকটি 'সোনার আংটি হাতে পরে' খ্রীষ্টিয়ান চার্চে বা সমাজ-ঘরে প্রবেশ করছিলেন (যাকোব ২:২), পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত 'যাকোবের চিঠি' নামের বইটিতে উল্লেখিত সেই ব্যক্তি ছিলেন এক জন অশ্বারোহী সৈনিক।

সাম্রাজ্যের শাসনকালে, সম্রাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সভার সদস্যদের পক্ষ থেকে তাদেরকে দেয়া হুমকিকে প্রতিরোধ করতে অশ্বারোহী সৈনিকদেরকে ব্যবহার করতেন। কেবল এক জন অশ্বারোহী সৈনিকই মিশরের শাসনকর্তা ও দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান হতে পারতেন। আর এই অশ্বারোহী সৈনিকরা সৈন্যবাহিনীর কর্মকর্তা হিসেবে এবং যিহূদিয়ার মত 'ছোট' প্রদেশগুলোর শাসনকর্তা হিসেবে কাজ করতে পারতেন। সম্রাট ডায়োক্লিশানের রাজত্বকালে, প্রশাসনিক ও সামরিক অধিকাংশ প্রশাসনিক ও সামরিক দফতরগুলো অশ্বারোহী সৈনিকে ভরে গিয়েছিল।

দরিদ্র শ্রেণী

নুম্যানটাইন যুদ্ধের সময় (খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৩-১৩৩ সাল) দেশের বাইরে সৈনিক হিসেবে সুদীর্ঘ কাল কাজ করার জন্য সৈন্যদের প্রয়োজন হয়। আর সুদীর্ঘ সময় ধরে বিদেশে কাজ করার ফলে অনেক কৃষককে তাদের জমি হারাতে হয় এবং তারা রোম শহরে এসে উপস্থিত হয় এবং হয়ে ওঠে শহুরে জনগোষ্ঠীর অংশ। কৃষকদের এই দুরবস্থা সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব তিবেরিয় গ্র্যাচুসের মনে খুবই রেখাপাত করে এবং তিনি বলেন: 'ইতালিতে ঘুরে বেড়ানো বন্য প্রাণীদের থাকার জন্য সেখানে গুহা রয়েছে এবং মিথ্যাবাদীদের রয়েছে তার বুকে থাকার আশ্রয়, কিন্তু যারা ইতালির জন্য যুদ্ধ করেছেন এবং জীবন দিয়েছেন, তাদের কিছুই নাই– তাদের জন্য রয়েছে কেবল প্রকৃতির বাতাস ও আলো। গৃহহীন ও অর্থহীন অবস্থায় তারা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে নিয়ে ঘুর বেড়ায়..... । তাদেরকে বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর প্রভু, অথচ নিজের বলতে তাদের এক খন্ড মাটির ঢেলাও নাই।'

সংখ্যাগরিষ্ঠ সভার সদস্যরা যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে আসা সৈনিকদের জমির সংস্কার বিষয়ক তিবেরিয় গ্র্যাচুসের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং তার ভাই জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ ও সংস্কারক গাইয়াস গ্র্যাচুসকে যেভাবে মেরে ফেলা হয়েছিল, সেভাবে

[জল ও পর্যাপ্ত উষ্ণতার ব্যবস্থা ছাড়াই ঘিঞ্জিতে ভরা, চারদিক রাস্তা দিয়ে ঘেরা দালান-কোঠার ফ্ল্যাটগুলোতে অধিকাংশ দরিদ্রতর লোকেরা বাস করতো। অস্টিয়ায় অবস্থিত উল্লেখিত চারদিক রাস্তা দিয়ে ঘেরা দালান-কোঠার একটি নমুনা।]

তার মৃত্যুর বার বছর পরে, খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৩ সালে তিবেরিয় গ্র্যাচুসকেও তারা হত্যা করেন। যাহোক, খ্রীষ্টপূর্ব ১২৩ সালে গাইয়াসের প্রচেষ্টায় 'শস্য মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী আইন' (লেক্স ফ্রুমেন্টারিয়া) প্রণয়ন করে ভর্তুকির ব্যবস্থা করা হয় যেন শস্যকে সস্তায় শহরে মুক্ত লোকজনের কাছে বিক্রয় করা যায়। আর এই পর্যায়টিই পরবর্তীতে 'ডোল' নামে বিনামূল্যে শস্য বিতরণ প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়।

রোমীয়দের উপর্যপরি বিজয়ে সেখানে অগণিত যুদ্ধ বন্দীর সমাগম হয়, যারা স্বল্প পারিশ্রমিকে ধনীদের জন্য কাজ করতেন। জমি-জমা যাদের কম ছিল, এমন ছোট ছোট কৃষকরা ধনীদের কাছে তাদের জমি বিক্রয় করতে না পেরে, রোমে এসে সেখানকার জনসংখ্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলতো। 'ডোল' সুবিধা পাওয়ার উপযুক্ত পারিবারিক প্রধানদের সংখ্যা খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে ১৫০,০০০ থেকে ৩০০,০০০ এসে দাঁড়িয়েছিল। আর এই অবস্থায় সম্রাট যুলিয় কৈসর এই সংখ্যাকে সীমিত করে আবারও অর্ধেক করেন। সম্রাট আগস্ত এই সংখ্যাটিকে নামিয়ে ২০০,০০০ করেন। কারণ অন্তত ৬০০,০০০ লোক– অর্থাৎ রোমের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক 'ডোল' এর উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করতো। কেবল সংখ্যালঘু স্বাধীন নাগরিকরাই তাদের জীবিকা উপার্জন করতে সক্ষম হত এবং বাকীরা 'কল্যাণ তহবিল' এর উপর নির্ভর করতো।

স্বাধীন নাগরিকদের মধ্যে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সভার সদস্য ছিলেন না, অথবা

অশ্বারোহী সৈনিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, তাদেরকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল তথাকথিত 'তৃতীয় রাজনৈতিক/ সামাজিক শ্রেণী'। তাদের অধিকাংশই মধ্যবৃত্তের চেয়ে অপেক্ষাকৃত নিচু, একটি নিম্নবৃত্ত শ্রেণী গঠন করতেন। সম্রাট, সংখ্যাগরিষ্ঠ সভার সদস্য এবং ২-৩ কোটি সেস্টার্সের অধিকারী মুক্তিপ্রাপ্ত ধনী ক্রীতদাস, এবং যারা বছরে প্রায় ২০,০০০ সেস্টার্স আয় সহকারে নম্র জীবন কাটাতে চাইতেন– তাদের মধ্যে থাকতো বিরাট বিভেদ। আর এটিই ছিল সেই লক্ষ্য, যা লেখক জুভেনাল তার লেখায় পাঠকদেরকে আশ্বস্ত করতে তুলে ধরেন: 'কখন আমি নিজেকে আশ্বস্ত করতে পারবো যে, ভিক্ষার লাঠি ও মাদুর থেকে আমি আমার ফেলে আসা বছরগুলোকে রক্ষা করতে সক্ষম হবো? প্রদানকৃত সুদ বিশ হাজার সেস্টার্স, অভেদ্য সুরক্ষা ...... আমার মত এক জন গরিব লোকের জন্য পর্যাপ্ত।'

গরিব লোকের ভাগ্য খুব সুখকর ছিল না। কোন আসবাবপত্র ছাড়াই দালান বাড়ির উপরের তলার চিলেকোঠায় তাকে থাকতে হতো এবং দিন-রাতে শীতের হাত থেকে রক্ষা পেতে তার ছিল কেবল একটি ছোট খাটো আলখিল্লা। সে অম্ল আংগুর-রস পান করতো এবং রুটি ও শাক-সব্জি খেয়ে জীবন কাটাত; যদি ভাগ্য বেশি সুপ্রসন্ন হতো

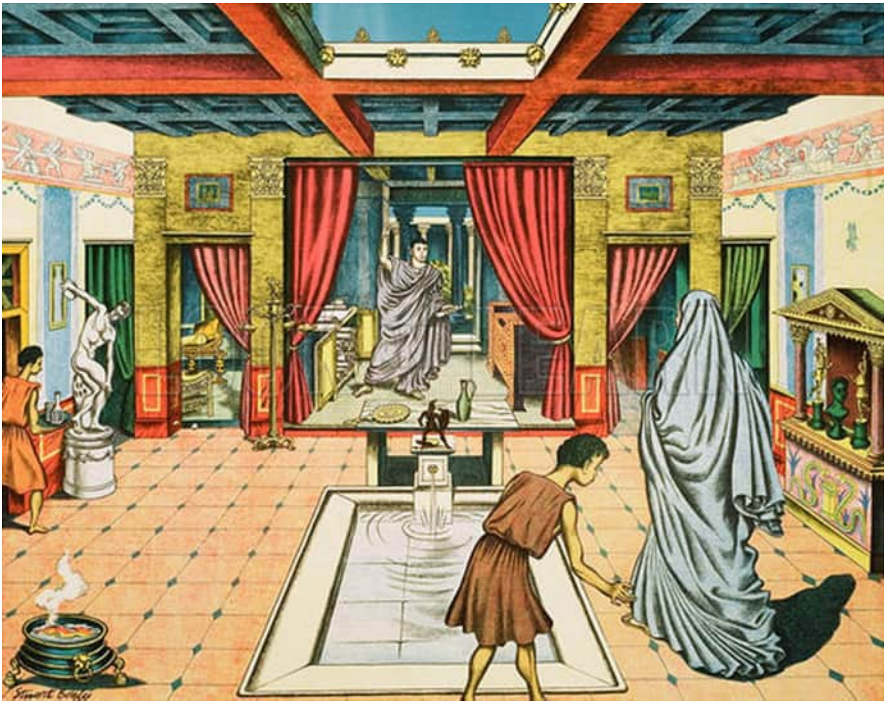

[একটি রোমীয় ধনী পরিবারের বাসগৃহের দৃশ্য।]

[ধনী রোমীয় নাগরিকরা বিলাসবহুল ভবনে বাস করতো। ঘরের দেয়ালে ছবি আঁকা হতো এবং অভ্যন্তরভাগের মেঝেতে রঙ্গিন পাথরের কারুকার্যমন্ডিত নকশা শোভা পেতো। এই সব দালানকোঠার গঠনশৈলী হিসেবে পরিচিত বিশেষ একটি অংশ হার্কুলেনিয়াম ও পম্পেতে খনন করা হয়েছে। আর এই ভবনগুলো প্রায় অখন্ড অবস্থায় ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আগ্নেয় পর্বত ভিসুভিয়াসের বিস্ফোরণে নিক্ষিপ্ত কাদা ও ছাইয়ের গভীর আস্তরণের নীচে সংরক্ষিত রয়েছে।]

তবে ভেড়ার মাথা অথবা শূকরের মাথা জুটতো। গরিব হওয়াই ছিল সবচেয়ে সামাজিক কলঙ্কময় দিক। লেখক জুভেনাল এই প্রসঙ্গে অভিযোগের সুরে বলেন: ‘যদি তুমি গরিব হও, তবে তুমি সব সময় হাস্যকর একটি বিষয় হয়ে ওঠো। যদি তোমার পোশাক নোংরা অখবা ছেঁড়া হয়, যদি হয় তোমার আলখেল্লায় কিছুটা মাটি লেগে থাকতে দেখা যায়, যদি তোমার জুতা ছেঁড়া থাকে। অথবা, যদি অসংখ্য তালি দিয়েও তোমার পোশাকে বারে বারে করা রিপুকাজকে এড়াতে না পার! দরিদ্রতা হলো সব চেয়ে বড় অভিশাপ। সত্যিকারের গরিব হওয়ার চেয়ে আরও যে খারাপ দিকটি সেটি হলো এই যে, এটি মানুষকে তামাশা, হাস্যরস, বিনম্রতা ও বিভ্রান্তির বিষয় করে তোলে।’ বস্তুত অধিকাংশ স্বাধীন, কিন্তু গরিব রোমীয়দের চেয়ে ধনী লোকদের দাসদের অবস্থা অনেক ভাল ছিল: ‘স্বাধীনভাবে জন্ম নেয়া লোকদের ছেলেরা, ধনী লোকদের দাসদেরকে পথ করে দিয়েছে।’

দাস-দাসী

ঋণের কারণে, অপহরণ ও বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে এবং দাস বাবা-মায়ের সন্তান হিসাবে জন্ম নেয়ার জন্য লোকেরা দাসে পরিণত হয়। তবে এভাবে দাস হয়ে ওঠার চেয়ে

রোমের জনগণ

আরও বেশি লক্ষ্যণীয় দিকটি ছিল হাজার হাজার যুদ্ধ বন্দীর দাস হয়ে ওঠার বিষয়টি।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী পর্যন্ত দেশের বাইরে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি না হওয়া পর্যন্ত, রোমে দাসের সংখ্যা খুবই কম ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী পর্যন্ত করা হিসাব অনুসারে দাসের সংখ্যা ছিল ২৫০,০০০ জন। আরেকটি হিসাব অনুযায়ী, সম্রাট ট্রাজানের রাজত্বকালের ১ম শতাব্দীতে রোমের মোট জনসংখ্যা ছিল ১,২০০,০০০ জন এবং এই জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ তথা ৪০০,০০০ জন ছিল দাস-দাসী। তবে ঐ সময়ের পরে দাসের সংখ্যা হ্রাস পায়।

প্রাথমিক পর্যায়ের দাসরা মূলত ছিল এপিরোটীয় (আলবেনীয়), গ্রীক, স্কুথীয়, ফরুগিয়, এবং সিরিয়। ক্রীতদাসদের প্রধান বাজারগুলোর মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়া, দিলোস, ইফিষ এবং বাইজেন্টিয়ামের নাম উল্লেখযোগ্য। গড়ে ধনী লোকদের প্রত্যেকেই এক বা দুই জন দাসের মালিক ছিল। কিন্তু ঐ সময় অধিক সংখ্যক দাস রাখার নজিরও লক্ষ্য করা যায়, যেমন– প্লিনি (কনিষ্ঠতম) এবং ইসিদোরাস নামে

[প্রতিটি পরিবারেরই ছিল নিজেদের দাস/দাসী– যাদের মধ্যে কেউ কেউ নিয়োজিত থাকতো গৃহস্থলীয় কাজকর্মে এবং অন্যরা বাড়ির গৃহকর্তীর সেবা-যত্নে করতো। নীচের পাথরের খোদাইকৃত শিল্পকর্মটিতে বাড়ির দাসীদেরকে তুলে ধরা হয়েছে, যারা গৃহকর্তীর সেবায় নিয়োজিত রয়েছে– এদের এক জন তার মাথার চুল সুবিন্যস্ত করছে এবং অন্য জন আয়না ধরে রয়েছে।]

এক ধনী লোকের যথাক্রমে ৫০০ ও ৪,০০০ দাস-দাসী ছিল।

দাস প্রথা এতোটাই বিস্তৃতি লাভ করেছিলে যে, দার্শনিক ছাড়া খুব কম লোকই বিষয়টি নিয়ে ভাবতো। দার্শনিক প্লেটো দাসদেরকে ‘মালপত্রের ঝামেলাপূর্ণ একটি জায়গা’ হিসেবে বর্ণনার প্রয়াস পেয়েছিলেন। অ্যারিস্টটোটল বিশ্বাস করতেন যে, মানব জাতির কিছু কিছু লোক প্রকৃতির খেয়ালবশত নিকৃষ্টতর এবং কিছু কিছু লোক ভাগ্য নির্ধারিতভাবেই দাস হিসেবে জন্ম গ্রহণ করে। যদিও তিনি তাদের প্রতি মানবিক ব্যবহার করার অনুরোধ জানান– তবে তা শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ হিসেব করার মধ্য দিয়েই করতে হবে। ক্রীতদাসেরাও যে মানুষ এই বলে বৈরাগ্যবাদীরা কিছুটা সফলতা লাভ করেন, কিন্তু তারাও এই দাসত্বকে বিলোপ করার কোন চেষ্টা করে নি।

রোমীয় আইন অনুসারে, এক জন দাসকে মনে করা হতো দ্রব্য সামগ্রীর একটি উপকরণ। আর এই কারণে একাধিক লোক এক জন দাসের মালিক হতে পারতেন। কিন্তু যদিও এক জন দাসকে ভূমিদাস হিসাবেই ব্যবহার করা হতো। অথচ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে নিছক এক জন ব্যক্তি হিসাবেই তার উপস্থিতি ঘটতো। এক জন দাসের শপথকে বন্ধন, তার অভিশাপকে সক্রিয় এবং তার সমাধিকে একটি ধর্মীয় স্থান হিসেবে মনে করা হতো। সে কর্মীদের সমিতিতে (ল্যাটিন ভাষায় যাকে ‘কলেজিয়াম’ বলা হয়) যোগদান করতে পারতো– যাতে সাধারণ খাবারের আয়োজন করা হতো এবং এই প্রতিষ্ঠানটি তার সদস্যদের সমাধির ব্যবস্থা করতো। সম্রাট হাড্রিয়ানের রাজত্বকালে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল যেন প্রভুরা তাদের দাসদেরকে হত্যা বা অত্যাচার করতে না পারে।

তবে কিছু কিছু জ্ঞানালোকিত প্রভুরা ছিলেন, যারা তাদের দাসদেরকে তাদের ব্যক্তিগত তহবিল ব্যবহার করতে দিতেন যাতে তারা তাদের মুক্তি ক্রয় করতে পারে, মাঝে মাঝে সাত বছরের মধ্যে তা করতে পারত। পারিবারিক দাসদের সাথে ভাল আচরণ এবং স্নেহসুলভ ব্যবহার করা হতো। এই প্রসঙ্গে সিসেরোর কথা বলা যেতে পারে– তার ভাই কুইন্টাস নিজের প্রিয় দাসকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন বলে, সিসেরো লিখেছিলেন: ‘আমি এই মাত্র টাইরোর বিষয়ে শুনতে পেলাম। তার কখনোই দাস হওয়া উচিৎ হয় নি। পরিবর্তে এখন তুমি সিদ্ধান্ত নিয়েছো যে, আমাদের তার বন্ধু হওয়া উচিৎ।’ ঠিক এমনই একটি ঘটনাকে লূক তাঁর সুখবরে উল্লেখ করেন– যখন এক জন শতপতি প্রভু যীশুকে তার দাসকে সুস্থ করার জন্য অনুরোধ করেন, যে ‘ঐ শতপতির খুবই প্রিয় এক জন দাস ছিল’ (লূক ৭:২)। এছাড়াও প্রভুদের জীবন তাদের দাসদের দ্বারা রক্ষা পাওয়ার অসংখ্য বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়।

রোমের জনগণ

ধনী পরিবারগুলোর মধ্যে, যেমন– সম্রাটের পরিবারে, প্রত্যেকটি কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরণের দাস/দাসী ছিল। এক শ্রেণীর দাসী ছিল, যারা স্তন্যদায়ী হিসেবে কাজ করতো, আরেক জন শিশুদের দেখাশোনা করতো, আবার অন্যরা ধাত্রী, সেবক/ সেবিকা, সম্পাদক, কেরানি, পাঠক, অনুচর এবং শোবার ঘরের তত্ত্বাবধানকারী হিসেবে কাজ করতো। কাপড়ের ব্যবসায় এর উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতো অসংখ্য দাস-দাসী, যারা সুতা-কাটনী, পশম-কর্মী, তাঁতী, পরিমাপকারী, কাপড়-প্রস্তুতকারী, রিফুকার এবং কাপড়-ভাঁজকারী হিসেবে কাজ করতো। এই বিশেষীকরণ দ্বারা বোঝানো হয়েছিল যে, রোমীয়দের দাসত্ব প্রথা 'চিরস্থায়ী ছিল না, আবার যতদিন তা টিকে ছিল, তা অসহনীয়ও ছিল না।'

কিছু কিছু দাসদেরকে আবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও দেয়া হতো– এমনকি তাদেরকে অন্য দাসদের মালিক হওয়ারও ক্ষমতা দেয়া হতো। রাজনীতিবিদ ক্রাসাসের স্থপতি ও রাজমিস্ত্রী মিলিয়ে মোট ৫০০ জন কর্মচারী ছিল। অন্য দাসরা মাটির ও কাচের জিনিসপত্র উৎপাদনে কল-কারখানায় কাজ করতো। সবচেয়ে অত্যাচারিত দাসরা ছিল তারা, যাদেরকে খনিতে কাজ করতে হতো। এদের অনেককে একত্রে শিকলে বেঁধে, জোর করে আবদ্ধ সুড়ঙ্গ পথে কাজ করতে বাধ্য করা হতো।

কিছু কিছু প্রভুরা ছিলেন, যারা তাদের দাসদের সাথে খুবই নৃশংস ব্যবহার করতেন। সেনেকা নিজে দাসদের প্রতি সদয় ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে, নির্যাতিত দাসদের ভাগ্যকে বর্ণনার প্রয়াস পেয়েছিলেন এভাবে– 'হতদরিদ্র দাসরা তাদের ঠোঁট নেড়ে এমনকি কথা বলতে পারে না। তাদের ক্ষীণতম ধ্বণিকেও লৌহদন্ড দিয়ে অবদমিত করা হয়। দৈবাৎ শব্দ, কাশি, হাঁচি অথবা হেঁচকির জন্য চাবুকের আঘাত সহ্য করতে হয়। নিঃশব্দতার নূন্যতম বিঘ্নে অনেক ভয়ানক শাস্তি প্রদান করা হয়– সারারাত ক্ষুধা নিয়ে বোবার মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।'

আর দাসদের প্রতি এমন অমানবিক ব্যবহারের কারণে দাস বিদ্রোহ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর এই দাস বিদ্রোহের মধ্যে গ্লাডিয়েটর স্পার্টাকাসের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহটি সবচেয়ে বেশি সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৭৩ ও ৭১ সালের মধ্যে তিনি প্রায় ৭০,০০০ বিদ্রোহী দাসকে একত্রে সংঘঠিত করে রোমীয় সৈন্যবাহিনীকে হারিয়ে দেন। খ্রীষ্টপূর্বে ৩৬ সালে জলদস্যু সেক্সটাস পম্পেয়াসকে পরাজিত করে, সম্রাট অক্টাভিয়ান ৩০,০০০ পালিয়ে যাওয়া দাসদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য তাদের প্রভুদের কাছে ফেরৎ দেন, অথবা নিজেই তাদেরকে হত্যা করেন। সম্রাট নিরোর রাজত্বকালে, একটি কঠোর আইন জারী করা হয়, কারণ তার এক জন কর্মকর্তাকে এক দাস মেরে

ফেলায় তিনি তার সাম্রাজ্যের বাড়িতে কর্মরত সব দাস-দাসীদেরকে হত্যার আদেশ দেন।

সম্রাট নিরোর এই হত্যার আদেশ জারী হওয়া সত্ত্বেও অনেক দাসরা পালিয়ে গিয়েছিল। পালিয়ে যাওয়া দাসদের উদাহরণ হিসেবে– সিসেরোর দাসের কথা বলা যায়, যে সম্রাট নিরোর দাস হত্যার আইন জারীর পরে, তার বই চুরি করে পালিয়েছিল। আবার পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের ফিলীমনের কাছে লেখা প্রেরিত পৌলের চিঠিতে ওনীষিম নামে এক দাসের কথা উল্লেখ রয়েছে (ফিলীমন ১:১০-১২)– যাকে প্রেরিত পৌল তাঁর বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তাঁর প্রভু ফিলীমনের কাছে ফেরৎ পাঠান। আইন অনুসারে, নৌপথে পালানোর শাস্তির নির্দেশ দেয়া হয়েছিল– এই ধারা অনুসারে, নৌপথে পালানোর সময়, যদি কাউকে ধরা হতো, তবে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলা হতো, অথবা ‘পলাতক’ হিসেবে চিহ্নিত করতে তার শরীরে ‘এফ’ অক্ষর অঙ্কিত করা হতো।

সম্রাটের নিজের পরিবারে অসংখ্য দাস-দাসী থাকতো– কখনো কখনো এই সংখ্যা ২০,০০০ ছাড়িয়ে যেতো। ফিলিপীয়দের কাছে প্রেরিত পৌলের চিঠিতে উল্লেখিত এইসব এবং অন্যান্য দাসদের মধ্য থেকেই কেউ কেউ প্রথমে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে (ফিলিপীয় ৪:২২)। পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে রোমীয়দের কাছে লেখা প্রেরিত পৌলের চিঠির ১৬ অধ্যায়ে উল্লেখিত পরিচিত দাসদের নামগুলো ছিল– আমপ্লিয়াত, উর্বাণ, স্তাখু, ত্রুফেণা, ত্রুফোষা ও হর্মা। যদিও ১ম শতাব্দী খ্রীষ্টিয়ানরা

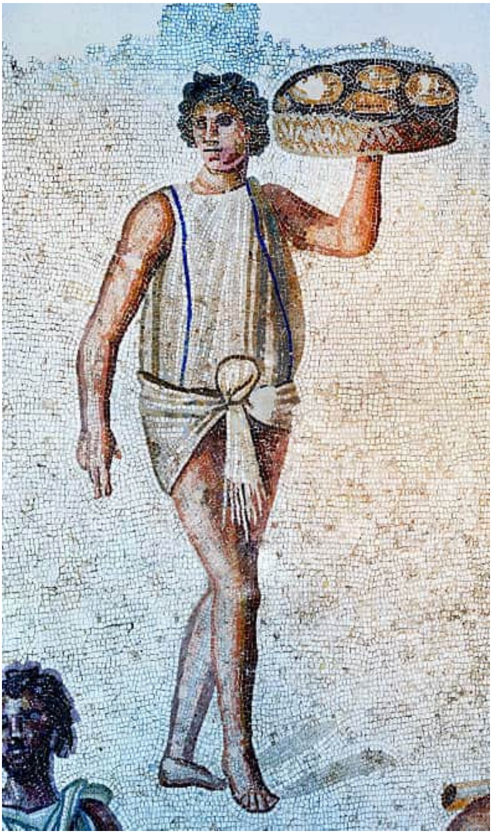

[৩য় খ্রীষ্টাব্দের পাথরের কারুকার্যখোচিত এক জন ক্রীতদাসের ছবি।]

দাস প্রথা বিলোপের জন্য কোন উদ্যোগ নেন নি। বরং, তারা দাসদেরকে সাদরে তাদের বিশ্বাসী ভাই হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তাদের মধ্যে অনেকে এমনকি মণ্ডলীর নেতাও হয়ে ওঠেন। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এটি সম্ভব ছিল না, যখন উইলিয়াম উইলবারফোর্স নামের এক জন খ্রীষ্টিয়ান বিশ্বাসী ইউরোপে দাসত্ব বিলোপে সর্বপ্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

দাসত্ব থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দাস-দাসী

রোমীয় সমাজে একটি শ্রেণী ছিল, যাদেরকে 'লিবারটিনি' বলা হত, যার অর্থ– দাসত্ব থেকে মুক্ত দাস ও দাসী, অথবা যারা আগে দাস বা দাসী ছিল। যিরূশালেমে দাসত্ব থেকে মুক্ত এমন দাস-দাসীদের জন্য একটি সমাজ-ঘর ছিল। খ্রীষ্টিয়ান প্রচারক স্তিফানের সাক্ষ্যমর হিসাবে মৃত্যুবরণের আগে এই সমাজ-ঘরের সদস্যরা তাঁর সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিল (প্রেরিত ৬:৯)। দাসদেরকে মুক্ত করার অনেক কারণ ছিল; এগুলোর কিছু কারণ ছিল পরার্থসম্মত এবং অন্যগুলো তা নয়। এমন অনেক প্রভুরা ছিলেন, যারা তার দাসদেরকে বিশেষ কাজের পুরস্কার হিসেবে, ধর্মীয় কারণে, এবং মহানুভবতার কারণে ইচ্ছাপত্রের দ্বারা মরণোত্তর সুনাম অর্জনের জন্য মুক্ত করে দিত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি ছিল অপেক্ষাকৃত সস্তা একটি বিষয়। কারণ দাসত্ব মুক্ত দাস-দাসীরা আগের দাস-দাসী হিসেবে ডোল বা সস্তালভ্য শস্যের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতো। কিন্তু এমনকি মুক্তির পরেও মুক্তিপ্রাপ্ত দাস-দাসীরা পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাদের প্রভুদের প্রতি অনুগত থাকত। আর তাদের নামের মধ্য দিয়ে তাদের প্রাক্তণ প্রভুরা চিহ্নিত হত।

[একজন স্বাধীন রোমীয়, যিনি দাস থেকে স্বাধীন হয়েছিল।]

রোমীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ দিক ছিল এই যে, কিছু সীমাবদ্ধতা সহকারে, মুক্ত দাস-দাসীরা রোমীয় নাগরিক হতে পারতো। তারা যতই ধনী

হোক না কেন, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সভার সদস্য হতে পারতো না– বেশি হলে সাম্রাজ্যের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার পরে, তারা কেবল অশ্বারোহী সৈনিকের মর্যাদা লাভ করতে পারতো। অধিকাংশ দাসত্ব মুক্ত দাস-দাসীদেরকে নিয়ে একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠিত হয়েছিল। অর্থ উপার্জনের জন্য তারা 'মুক্ত কিন্তু গরিব'– এমন রোমীয় নাগরিকদের মত তাদের হাত নোংরা করতে ভয় পেত না। সিসেরোর তালিকাভুক্ত এইসব তথাকথিত 'নোংরা' পেশায় নিয়োজিত থাকার জন্য তারা খুবই ইচ্ছুক ছিল: 'মাছবিক্রেতা, কসাই, রাধুনী, পিঠা প্রস্তুতকারী এবং জেলে .... সুগন্ধী ব্যবসায়ী, নর্তকী এবং জুয়াড়ীদের দল।'

দাসত্ব থেকে মুক্ত কিছু কিছু দাসেরা খুবই ধনী হয়ে ওঠে– কিন্তু তাদের ধন-সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও তারা উপেক্ষিত ছিল। পেট্রোনিয়াসের 'স্যাটিরিকন' নামক বইয়ের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ট্রিমালচিয়ো তার সম্পত্তি ও গেঁয়ো জাক্‌জমকের জন্য খুবই পরিচিত ছিল। অন্যরা তাদের সাহিত্য বিষয়ক কাজের জন্য দীর্ঘস্থায়ী খ্যাতি অর্জন করে: লিভিয়াস এন্ড্রোনিকাস ছিলেন প্রাথমিক পর্যায়ের এক জন কবি; উত্তর আফ্রিকা থেকে আসা দাস, টেরেন্স, মঞ্চের মিলনান্তক নাটকের ক্ষেত্রে বিখ্যাত এক জন নাট্যকার ছিলেন এবং এপিকটেটাস ছিলেন এক জন বিখ্যাত বৈরাগ্যবাদী দার্শনিক।

খ্রীষ্টিয়ান প্রভুরা প্রায়ই তাদের দাসদেরকে মুক্ত করে দিতেন। রোমের সবচেয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু বিশপ, যেমন– পায়াস (১৪০-১৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) এবং ক্যালিস্টাস (২১৭-২২২ খ্রীষ্টাব্দ) সম্ভবত আগে দাস ছিলেন।

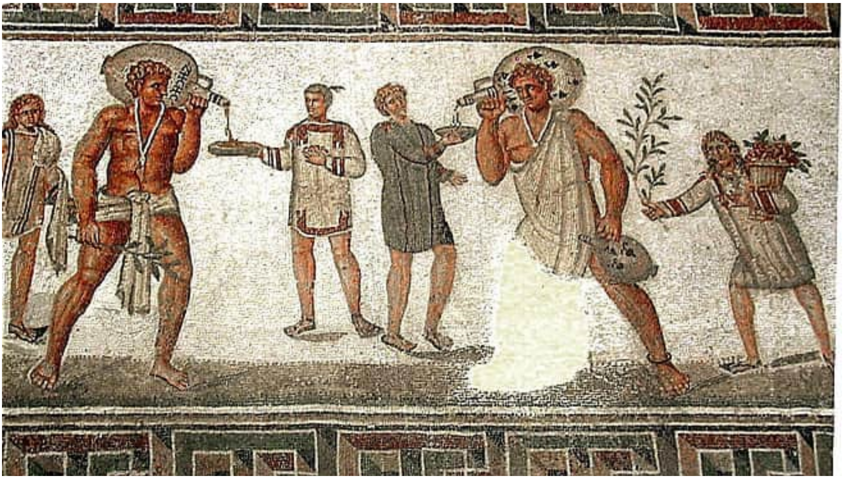

[প্রাথমিক খ্রীষ্টিয় জগতে রোমান সাম্রাজ্যে দাসদের ছবি]

রোমীয়দের জীবন ও বিশ্বাস

কোন প্রযুক্তি ছাড়াই আধুনিক শহুরে জীবনের সব ধরণের ফাঁদই প্রাচীন রোমের ছিল। চারদিক রাস্তা ঘেরা সুউচ্চ দালান-কোঠার অসংখ্য কক্ষ নিয়ে তৈরি প্রতিটি তলায় এবং শহরতলীর বিলাসবহুল ভবনে রোমীয় লোকজন বাস করতো– যেগুলোর সাথে উন্নত জল সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সংযুক্ত থাকতো। অসংখ্য নয়নাভিরাম, ব্যবহারোপযোগী এবং সরকারী দালান ছিল। এগুলোর মধ্যে ছিল বিভিন্ন কার্যালয়, দপ্তর, পাঠাগার, নাট্যমঞ্চ, রঙ্গমঞ্চ, মন্দির এবং স্নানাগার উল্লেখযোগ্য। এর জালের মত বিস্তৃত সড়ক পথ ব্যবসা ও যোগযোগের ক্ষেত্রে গতিময়তা এনে দিয়েছিল।

ইতিহাসের অন্যান্য কালসীমার মত বস্তুগত অগ্রগতির দ্বারা এরা লালিত-পালিত হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটি তাদের ধর্মীয় আকাঙ্খাকে তৃপ্ত করতে সক্ষম হয় নি। জ্যোতিবিদ্যা, সম্রাটের উপাসনা এবং অগণিত রহস্যময় ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত বাসনাদি চরিতার্থ করার জন্যই ছিল না, বরং এগুলো রোমীয় জনজীবনের একটি অংশ ছিল।

[রোমান সাম্রাজ্যের প্রাচীন রোমীয় জীবন ও বিশ্বাস]

সামাজিক প্রতিষ্ঠান

বিয়ে ও বিয়ে-বিচ্ছেদ

সম্রাট আগস্তের রাজত্বকালে, বিয়ের জন্য মেয়েদের ও ছেলেদের সর্বোচ্চ বৈধ বয়সের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল যথাক্রমে ১২ ও ১৪ বছর। বিয়ের জন্য মেয়ে ও ছেলের এই নির্ধারিত বয়সের সীমাকে পরবর্তীতে মণ্ডলীর মানদন্ড বিষয়ক আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রোমীয় লেখক প্লুটার্ক ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন: কুমারীত্ব সুনিশ্চিত করতে মেয়েদেরকে তাদের কিশরী বয়সে বিয়ে দেয়া হতো। কোন মেয়ের যদি উনিশ বছর বয়সেও বিয়ে না হতো, তবে তাকে 'বয়স্ক মেয়ে' হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ফলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বাবা-মা মেয়ের বিয়ের জন্য ছেলেদেরকে আকর্ষণ করতে যৌতুকের পরিমাণ বাড়িয়ে প্রচারণা চালাত। যেসব মেয়েরা ও ছেলেরা যথাক্রমে ২০ ও ২৫ বছর বয়সে অবিবাহিত থাকতো, তাদের জন্য সম্রাট আগস্ত পারিবারিক উত্তরাধিকারের বিষয়গুলো ও রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণকে কঠিন করে দিয়েছিল।

রোম প্রজতন্ত্রের আগের বছরগুলোতে, বাবারা তাদের ছেলেমেয়েদের উপর এক চরম ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতো– তারা তাদের সন্তানদেরকে বিক্রি করে দিতে, অথবা মেরে ফেলার ক্ষমতা ভোগ করতো। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের অভিভাবকত্বের অধীনে থাকতো; তাদের এমনকি পৃথক নামও থাকতো না, যেমন– ক্লৌদিয়া ও যুলিয়া– এই নাম দুইটি দিয়ে নারীসুলভ নামের সমাপ্তিসূচক গোত্রীয় নাম বোঝায়। যাহোক, প্রজাতন্ত্রের পরবর্তী বছরগুলোতে স্ত্রীলোকেরা অনেক স্বাধীন হয়ে ওঠে।

বিয়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতো বাগদানের মধ্য দিয়ে, যাতে সম্পৃক্ত থাকতো সাত জন যুবক ছেলেমেয়ে। পুরুষরা তাদের বাগদত্তা স্ত্রীর ডান হাতের চতুর্থ আঙ্গুলে লোহার আংটি পরাতো এবং চুম্বন করতো।

শুভ লক্ষণের কারণে এপ্রিল অথবা জুনের দ্বিতীয়ার্ধ তথা মাঝামাঝি সময়কে বিয়ের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হিসেবে বিবেচনা করা হতো। বছরের মোট দিনের এক তৃতীয়াংশ অমঙ্গলসূচক বলে বিবেচিত হতো। বিশেষত ঐ সব দিনগুলোর প্যারেন্টালিয়া ও লেমুরিয়া ভোজের সময়, যখন মৃত মানুষের আত্মারা মুক্ত থাকতো বলে ভাবা হতো।

[রোমীয় মেয়েদের বিয়ের পোশাক]

বিয়ের আগে, কনে তার সব খেলনা এবং শৈশবের সব পোশাক-পরিচ্ছদ তার পারিবারিক দেবতাকে দিয়ে দিতো। কনেকে তার বিয়েতে সাদা ফ্লানেল অথবা মসলিন কাপড়ে তৈরি হাঁটু পর্যন্ত লম্বা, ঢিলা ও আস্তিনযুক্ত বা আস্তিনবিহীন ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরানো হতো এবং কোন কোন সময় এর সঙ্গে উজ্জ্বল কমলা রঙের ঘোমটা পরানো হতো– তবে ঘোমটা পরালেও মুখ-মন্ডল খোলা থাকতো। আর প্রকাশ্যে কনের নতুন বাড়ি তথা বরের বাড়িতে প্রবেশের মধ্য দিয়ে বিয়ের এই আনুষ্ঠানিকতা শেষ হতো। কনের তার স্বামীর বাড়িতে প্রবেশের সময়, বর সামনে এগিয়ে ছেলেমেয়েদের দিকে আখরোট ছুঁড়ে দিত। তারপর সে কনেকে কোলে তুলে নিয়ে বাড়ির চৌকাঠ পেরোতো, যেন সে হোঁচট না খায়– কারণ হোঁচট খাওয়া কনের জন্য দুর্ভাগ্যসূচক বলে মনে করা হতো।

গতানুগতিকভাবে বাবা-মায়ের কাকাতো/ পিশাতো/ মাসতুতো/ মামাতো ভাই-বোনের ছেলেমেয়ের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে, এমনকি কাকাতো/পিশাতো/ মাসতুতো/মামাতো ভাই-বোনের মধ্যে বিয়েকেও মেনে নেয়া হয়েছিল। ৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের ক্লৌদিয়ের সাথে তার ভ্রাতুস্পুত্রী আগ্রীপ্পিনার বিয়ে ছিল এক জঘণ্য নজির।

বিয়ের বিষয়ে দাস বা দাসীদের কোন অধিকার ছিল না। তাই রোমীয় বিয়ের চুক্তি সম্পন্ন করার কোন অধিকারই তাদের ছিল না। বিয়ের মত এমন একটি সম্পর্কে এক জন দাস বা দাসীর জড়িয়ে পরার বিষয়টি হয়তো তার প্রভু মেনে নিতেন অথবা অস্বীকার করতেন। তবে দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে, যে কোন দাসের প্রথম কাজটি ছিল তার ‘স্ত্রীর’ মুক্তিকে ক্রয় করা। সম্রাট আগস্তের প্রবর্তিত আইন অনুসারে, ‘জন্মগতভাবে স্বাধীন লোকদের কোন পতিতা, পতিতার মহিলা দালাল, পতিতার পুরুষ বা মহিলা দালালের দ্বারা মুক্ত কোন স্ত্রীলোক, ব্যভিচারে ধরা পড়া পুরুষ বা স্ত্রীলোক, লোকজনের দ্বারা অভিযুক্ত কেউ, অথবা প্রাক্তন কোন অভিনেত্রীকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ ছিল।’

রোমীয়দের জীবন ও বিশ্বাস

রোম প্রজাতন্ত্রের সময় কোন ছেলেমেয়ে জন্ম নিলে তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করা হতো এবং যারা নিঃসন্তান ছিল, তারা ছেলেমেয়ে না থাকায় বিলাপ করতো। খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীর বিখ্যাত তুরিয়ার সমাধিস্তম্ভের লিপিতে উল্লেখ রয়েছে– বন্ধ্যা হওয়াতে কিভাবে এক জন স্ত্রী তাকে পরিত্যাগ করার জন্য তার স্বামীকে অনুরোধ করেছিল যেন সে দ্বিতীয় বার বিয়ে করে সন্তানের বাবা হতে পারে।

সাম্রাজ্যের শাসনামল শুরুর আগের অবস্থায়, জন্ম নেয়া এবং লালন-পালনশীল ছেলেমেয়েদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছিল। আমাদেরকে যেভাবে বলা হয়েছে, কিছু স্ত্রীলোক তাদের সৌন্দর্য হারানোর ভয়ে মাতৃত্বকে এড়িয়ে যেত। অন্যরা গর্ভপাতের সাহায্য নিত, অথবা নালাগুলোতে তাদের বাচ্চাদেরকে রেখে চলে আসত। যদি ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি জন্ম নিতো, তবে মৃত্যুর জন্য তাদেরকে ফেলে আসা হতো। সম্রাট ট্রাজানের রাজত্বকালে, অবৈধ ছেলেমেয়েদেরকে সার্বজনীন সাহায্যের যে তালিকা দেয়া হয়েছিল, তাতে ১৪৫ জন ছেলেমেয়ের মধ্যে কেবল ৩৪ জন মেয়ে ছিল।

রোমের অপেক্ষাকৃত প্রাথমিক পর্যায়ের ইতিহাস অনুসারে, ঐ সময় বিয়ে-বিচ্ছেদ

[হার্কুলিয়ামের উপর আচ্ছাদিত ও আলো-বাতাস চলাচলের সুবিধা সম্বলিত প্রধান কক্ষই ছিল বিলাসবহুল ভবনের প্রধান থাকার ঘরের একটি নমুনা– যার ছাদের বর্গাকার অংশের মধ্য দিয়ে ভিতরে আলো প্রবেশ করতো এবং বৃষ্টির জল নীচে থাকা অগভীর জলাধারে সংরক্ষিত হতো।]

খুবই কম ঘটতো। রোম প্রজাতন্ত্রের পরবর্তী এবং সাম্রাজ্যের শাসনকাল শুরুর প্রথম দিকের বছরগুলোতে উচ্চবৃত্ত শ্রেণীর মধ্যে প্রায়ই রাজনীতিকে এবং কখনো কখনো সামান্য কারণকে কেন্দ্র করে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটতো। সম্রাট পম্পে পাঁচ বার ও সিজার (কৈসর) চার বার বিয়ে করেন। লেখক সেনেকা এক বার মন্তব্য করেছিলেন: 'কোন স্ত্রীলোকেরই বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটানোর ক্ষেত্রে লজ্জায় লাল হয়ে যাওয়া উচিৎ নয়, কারণ খুবই সম্মানিত স্ত্রীলোকেরা বছর নির্দেশ করতে, রোমীয় শাসকদের নাম না বলে, তাদের নিজেদের স্বামীদের নাম বলে থাকেন। তারা বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে থাকেন আবারও বিয়ে করার জন্য এবং তারা বিয়ে করেন বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য।'

রোম প্রজাতান্ত্রিক শাসন আমলের আগে, এক জন পুরুষ তার স্ত্রীকে মারাত্মক অপরাধ, যেমন– ব্যভিচার, তার ছেলেমেয়েদেরকে বিষ প্রয়োগ, অথবা তার চাবির নকল তৈরির দায়ে পরিত্যাগ করতে পারতো, কিন্তু এক জন স্ত্রীলোক তেমন কোন পদক্ষেপ নিতে পারতো না। যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত অবস্থায় ধরতে পারতো, তবে তার ঐ ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে হত্যা করার এবং তার প্রেমিককে ক্ষতবিক্ষত বা হত্যা করার অধিকার ছিল। সম্রাট আগস্ত কৈসর ব্যভিচারকে প্রকাশ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তার জারীকৃত এই আইন অনুসারে, ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত তার স্ত্রীর প্রেমিক যদি সমাজের নিম্নবৃত্ত শ্রেণীভুক্ত হতো, তবে তাকে হত্যা করার অধিকার ঐ স্বামীর ছিল।

[রোমীয় স্ত্রীলোকদের ব্যবহৃত হাতির দাতের দিয়ে তৈরি চিরুনি।]

সন্তান জন্ম দেয়ার ঝুঁকির কারণে অর্ধেকেরও বেশি স্ত্রীলোকেরা চল্লিশ বছরের আগেই মৃত্যুবরণ করতো। অন্যদিকে স্বামীদের বয়স স্ত্রীদের চেয়ে দশ বছর বেশি হতো বলে এবং তারা যুদ্ধে বিপদের সম্মুখিন হত বলে স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের চেয়ে বেশি দিন বাঁচতো।

আবিস্কৃত অসংখ্য সমাধিস্তম্ভের লিপিতে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সুখের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এই বিষয়ের উপর সাধারণ একটি বাক্যাংশ লক্ষ্য করা যায় যে, এই দম্পতিরা বহু বছর একত্রে কাটিয়েছেন, 'কোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদ ছাড়া।' স্ত্রীদের প্রশংসা করা হয়েছে এই বলে যে, 'তারা বাড়িতে থাকতে সন্তুষ্ট', 'বিনয়ী', 'অনুগত', 'অর্থের বিষয়ে যত্নবান', এবং 'ধার্মিক, কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন নন'।

রোমীয়দের শিক্ষা

ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষক ব্যবহারে রোমীয়রা গ্রীকদেরকে অনুসরণ করতো। আর প্রায়ই তারা এই বিষয়ে গ্রীক দাসদেরকে নিয়োগ করতো। এই পৃথিবীর বুকে, শিক্ষার ক্ষেত্রে রোমীয়রা গ্রীকদের থেকে আলাদা কিছু লক্ষ্যণীয় বৈষম্যের পরিচয় ঘটায়। গণিত, জ্যামিতি ও সঙ্গীত কেবল সেখানেই শিক্ষা দেয়া হতো, যেখানে এগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভব ছিল। দর্শন অলঙ্কারিক বিষয় ছিল না, কারণ উচ্চতর শিক্ষামূলক বিষয়গুলোর মধ্যে এটিকে সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে করা হতো। রোমীয়রা গ্রীকদের খেলাধুলা ও শরীরচর্চার ক্ষেত্রে নগ্নতার উন্মোচনকে পছন্দ করতো না।

মেয়েরা ছেলেদের সাথে একত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে পারতো। গ্রীসের বিপরীত দিক হিসেবে, রোমে কেবল ছেলেরা বিদ্যালয়ে যেতে পারতো। কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোকেরা সাহিত্য বিষয়ক জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়েছিল, যাদের বিষয়ে জুভেনাল তার আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছিলেন: 'কিভাবে তাদেরকে আমি ঘৃণা করি। স্ত্রীলোকেরা, যারা কেবল প্যালেমনের ব্যাকরণ বইয়ের পিছনের পৃষ্ঠাতেই পড়ে থাকতো– সব নিয়মগুলো শেখার মাধ্যমে যারা এমনই লক্ষ্যণীয় অলঙ্কারিক উপকরণে পরিণত হয়ে উঠেছে যে, তারা এখন এমনকি এর থেকে উদ্ধৃত করতেও সক্ষম– যা আমি কখনোই শুনিনি।'

যেকোন উন্মুক্ত জায়গা হলেই সেখানে ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে বসে বিদালয়ের পাঠ দান করা হতো– কখনো কখনো এটি বসতো খোলা বাজারগুলোতে, কখনো বসতো বাড়ির সামনে ছাউনির নীচে– তবে আর যাই হোক না কেন এটি হালকা বিভাজনের দ্বারা সাধারণ জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতো। গণিত শিক্ষার জন্য ছাত্ররা ছোট ছোট নুড়ি পাথরে তৈরি গণনার কাঠামো ব্যবহার করতো।

যে শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো পড়াশোনা করতো, তাদেরকে ল্যাটিন ভাষায় 'প্লেগ্রুপ' বলা হতো এবং এই সব ছেলেমেয়েদের বয়স ছিল সাত থেকে দশ অথবা

এগার। বিদ্যালয় শব্দটি এসেছে, গ্রীক 'অবকাশ' শব্দ থেকে। বাবা-মায়েরা শিক্ষকদের কাছ থেকে তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য অনেক প্রত্যাশা করলেও, তাদেরকে অনেক কম বেতন দিত; কখনো কখনো কেবল আদালতের আদেশক্রমে তাদেরকে বেতন দেয়া হতো। ঈসোপের নৈতিক উপদেশপূর্ণ গল্পগুলো পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেয়ার জন্য খুবই জনপ্রিয় ছিল।

নিয়মানুবর্তীতা ছিল শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। পম্পে থেকে সংগৃহীত একটি চিত্রে একটি ছেলেকে দেখানো হচ্ছে, যাকে অন্য দুই জন ধরে রয়েছেন যেন শিক্ষক তার পিঠে চাবুক মারতে পারেন। ল্যাটিন বাক্যাংশ 'লৌহ দন্ড থেকে হাত সরিয়ে নেয়া' দিয়ে 'বিদ্যালয় ছেড়ে দেয়া' বোঝানো হতো। শিক্ষার ক্ষেত্রে ভয়ের চেয়ে প্রশংসা, প্রতিযোগীতা ও এমনকি খেলাধুলাকে আরও ভাল উৎসাহব্যঞ্জক দিক হিসেবে তুলে ধরে, লেখক কুইন্টিলিয়ান চাবুক মারার চিরন্তন রীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।

বার বছর থেকে পনের অথবা ষোল বছরে, যখন এক জন রোমীয় যুবক সাবালক হয়ে উঠতো এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী সাদা আলখিল্লা পরতো, তখন তারা মাধ্যমিক পর্যায় অথবা ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয়ে যেতে সক্ষম হতো। আর এখানে দেয়া মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলো ছিল– ভাষার কৌশলগত দিক এবং সাহিত্য– আর সাহিত্যের মধ্যে প্রাথমিকভাবে হোমার ও গ্রীক লেখাগুলো স্থান পেতো। খ্রীষ্টপূর্ব ২৫ শতাব্দীর

[গলের রোমীয় একটি স্কুল। দুই জন ছাত্র তাদের প্যাপিরাসের গুটানো বই খুলছে এবং অন্যদিকে, তৃতীয় জন দেড়ি করে সেখানে উপস্থিত হয়েছে।]

পূর্বে কোন ল্যাটিন লেখার পরিচয় ঘটেনি। এইগুলোর মধ্যে ভার্জিল, সিসেরো, টেরেন্স এবং হোরেসের লেখাগুলোর অন্তর্ভুক্তি ঘটে।

ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয়ের পরে, আঠারো অথবা বিশ বছর পর্যন্ত যুবকেরা ভাষার অলঙ্কারিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করতো। যেহেতু রোম প্রজাতন্ত্র থেকে সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল, তাই রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা কমতে থাকে এবং ভাষাগত অলঙ্কারিক প্রশিক্ষণের বিষয়টি বাস্তব জীবনে আরও ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে। ছাত্রদেরকে কিছু বিষয়ের উপর বক্তব্য তুলে ধরতে বলা হলা, যেমন– 'পৌরাণিক রাজা আগামেনোনের কি তার মেয়েকে উৎসর্গ করা উচিৎ ছিল?' অথবা, দূরবর্তী কোন মামলার বিষয়, যার মধ্যে আইন-কানুন মধ্যে সংঘাতের বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অলঙ্কারিক শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদেরকে বাক্যালঙ্কার শিক্ষা দান করতেন। প্রেরিত পৌল তাঁর লেখায় ত্রিশটি বিভিন্ন ধরণের বাক্যালঙ্কার ব্যবহার করেন এবং সম্ভবত তার্ষ শহরে প্রাথমিক বিষয় হিসেবে তিনি কিছু অলঙ্কারিক প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন। তবে যে প্রশিক্ষণই প্রেরিত পৌল পান না কেন, ইচ্ছা করেই অলঙ্কারিক ভাষার এই সব বিশদ ও জাঁকালো ব্যবহারকে তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন, যা তাঁর সময়কার বক্তারা সমর্থন ও করতালির জন্য ব্যবহার করতেন।

অপরাধ

'ভিজাইলস' নামে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর দ্বারা রোমীয় পুলিশ বাহিনীর সদস্যদেরকে নিয়োগ করা হতো। প্রায় দশ লাখের মত লোকের একটি শহরে তারা অপরাধকে প্রতিহত করতে খুব কমই সক্ষম হত। স্নানাগারের কাপড় নিয়ে পালিয়ে যেতো কাপড় চোরেরা। আর যারা সিঁধেল চোর, তারা ঘরে প্রবেশ করে চুরি করতো এবং দস্যুরা পথে ওৎ পেতে আক্রমণ করে পথিকদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে যেতো। যেসব ধনীদেরকে রাতে পথ চলতে হতো, তারা তাদের ভৃত্যদেরকে দিয়ে ঐ সব অপরাধীদেরকে দূরে সরিয়ে রাখত যেন কাছে ঘেষতে না পারে। জুভিনালের বর্ণনা অনুযায়ী যেসব পথিকেরা নিঃসঙ্গ পথ চলতো, দুর্বৃত্তরা তাদেরকে আক্রমণ করতো। এভাবে এই সব আক্রমণের সূত্রপাত ঘটতো– অর্থাৎ মারামারি শুরু হয়– যদি আপনি একে মারামারি বলে মনে করেন। যখন সে তার সবগুলো ঘুষি ছুঁড়ে, তখন আমি যা করতে পারি, সেটি হলো এই আঘাতগুলো সহ্য করা। এক পর্যায়ে সে থামে। আর আমাকে থামতে বলে। আমি থামি। কারণ এখন তার কথা শোনা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। আপনি কিইবা করতে পারেন, যখন সে উম্মাদ হয়ে ওঠে এবং আপনার চেয়ে আকৃর্তিতে অনেক বড় ও আরও বেশি শক্তিশালী হয়?..... ।

যদি আপনি তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেন, অথবা কোন কিছু না বলে নিঃশব্দে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন, তবে আবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবেঃ অর্থাৎ আপনাকে আঘাত করা হবে এবং জামিনের শর্তাধীন রেখে আপনার উপর আঘাত চালাতে থাকবে।

আর এটিই হলো এক জন অসহায় মানুষের স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত। নির্যাতিত ও মুষ্টাঘাতে থেতলে যাওয়া অবস্থায়, আঘাতের পরে মুখে বাকী থাকা দাত কয়টি নিয়ে সে ঐ আক্রমণকারীর কাছে অনুনয়-বিনয় করে বলে, দয়া করে আমাকে এক বার আমার বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ দিন।

রোমের ব্যবসা-বাণিজ্য

সম্রাট আগস্তের অধীনে সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরে (প্যাক্স রোমানা), রোম এবং নিকটপ্রাচ্য (মধ্যপ্রাচ্য) ও দূরপ্রাচ্য সহ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে ব্যবসা শুরু হয়।

[রঙিন কাপড় ছিল রোমীয়দের আমদানীকৃত উপকরণের মধ্যে একটি।]

রোমীয়দের জীবন ও বিশ্বাস

পৃথিবীর মধ্যে কেবল দক্ষিণ-পশ্চিম আরবের প্রাচীন শিবা (বর্তমান ইয়েমেন) এবং পূর্ব আফ্রিকার প্রাচীন পুন্ট (সোমালিয়া) নামের দুইটি জায়গাতে খর্বাকৃতি গুল্ম জন্মে, যেগুলো থেকে গন্ধরস ও লোবান উৎপন্ন হয়। আর গুল্ম থেকে সংগৃহীত এই নির্যাস বা রজনগুলোকে সুগন্ধি ও ঔষধ হিসেবে এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতো। রাণী ইষ্টেরের ছয় মাস ব্যাপি সৌন্দর্য চর্চার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল এবং ব্যথা উপশমে ও মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্যও এটি ব্যবহার করা হতো।

এই সব মূল্যবান পণ্য-সামগ্রী প্রক্রিয়াজাত করানোর জন্য আরবীয়রা ও নাবাতীয়রা জাহাজে করে গাজা ও আলেকজান্দ্রিয়াত পাঠিয়ে দিত। লেখক প্লিনি (জ্যেষ্ঠ) তাঁর বর্ণনায় তুলে ধরেছিলেন যে, আলেকজান্দ্রিয়াতে কর্মরত শ্রমিকদেরকে খালি গায়ে চাবুক মারা হতো এবং কাজ শেষে কর্মক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাবার অনুমতি দেয়ার আগে তাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তল্লাশি করা হতো।

হিসাব অনুসারে দেখা যায় যে, এই সব সুগন্ধি দ্রব্য ও নির্যাস এবং অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রী, যেমন– প্রবাল ও মুক্তা কেনার জন্য প্রতি বছর পাঁচ কোটি সেস্টার্স (প্রাচীন রোমীয় মুদ্রা) আরবে পাঠানো হতো। প্লিনি বিশ্বাস করতেন যে, দক্ষিণ আরবের স্থানীয়রা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী জনগোষ্ঠী।

প্রাচ্যে রোমের প্রধান প্রতিদ্বন্দী ছিল দুর্দান্ত পার্থীয় সাম্রাজ্য, যেটি সন্দেহাতীতভাবে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩ সালে ক্রাসাসকে এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৩৬ সালে অ্যান্থনিকে পরাজিত করে। খ্রীষ্টপূর্ব ২০ সালে সম্রাট আগস্ত আপোষ-মিমাংসার মধ্য দিয়ে পার্থীয়দের হস্তগত করেন, এবং রোমীয়দের হারিয়ে যাওয়া মানদন্ডকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। আর এভাবে পার্থীয়দের সাথে স্থাপিত শান্তি, বিস্তৃত পার্থীয় সমাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে রোমীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্য করার পথকে উন্মুক্ত করে।

আর সম্রাট আগস্ত খ্যারাক্সের ইসিডোরকে পারস্য উপসাগরের উভয় দিক আবিস্কারের আদেশ দেন। ইসিডোরের 'পার্থীয়দের ঘাটি' নামের বইটিতে তিনি মেসোপটমিয়া ও পারস্যের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া স্থলভাবে বিস্তৃত যাত্রাপথের বর্ণনা করেন, যা পরবর্তীতে বিখ্যাত সিল্ক রোড নামে চীন দেশে চলে গিয়েছে। এই গমনপথ সিরিয়া থেকে মেসোপটমিয়া ও পারস্যের মধ্য দিয়ে বাকট্রিয়া (উত্তর আফগানিস্তান) বরাবর প্রায় ৪,০০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রোম ও চীনের প্রথম সরাসরি যোগাযোগ হয়েছিল, যখন ১৬০ খ্রীষ্টাব্দে চীনের হ্যান কোর্টে রোম থেকে প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়েছিল।

রোমীয়দের জীবন ও বিশ্বাস

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দ থেকে চীনে রেশম উৎপাদন শুরু হয় এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে পারস্যের অ্যাকিমেনিড রাজারা তা ব্যবহার করতে থাকেন। আর এই রেশমকে সিরিয়া, ফৈণীকীয়া, গালীলের বুনন কেন্দ্রগুলোতে পাঠানো হতো। আর সেখানে এর সাথে লিলেন অথবা পশম মিশিয়ে বস্ত্র বুনন করা হত এবং রং করা হতো। যত দিন না সম্রাট এলাগাবালাসের জন্য খাঁটি রেশম দিয়ে বোনা আলখেল্লা তৈরি করা হয়েছিল, ততদিন পর্যন্ত এই ধরণের কাপড়ের ব্যবহার শুরু হয় নি।

বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ কতিপয় লোকের হাতে থাকার কারণে রোম সাম্রাজ্যের অর্থনীতি সার্বিকভাবে সুষম ছিল না। তারা তাদের ব্যাপক অর্থ আমদানী প্রসাধনীর জন্য ব্যয় করতো– ফলে ব্যয়িত ঐ অর্থ চলে যেতো সাম্রাজ্যের বাইরে, যা অধিকরতর দরিদ্রপীড়িত বিশাল জনগোষ্ঠীর কোন কাজে লাগতো না।

ভারতের সাথে রোমের ব্যবসা-বাণিজ্য

সম্রাট আগস্তের রাজত্বকালের কবি হোরেস কাব্যিক অতিরঞ্জনের মাধ্যমে দাবী করেছিলেন, 'এখন স্কুথীয় ও অহঙ্কারী ভারতীয়রা রোমের কাছ থেকে প্রভুত্ব অর্জনের চেষ্টা করছে এবং চীন দেশীয়রা সম্রাটের আদেশ অমান্য করতে পারছিল না। সম্রাট আগস্তের রাজত্বকালে সর্বপ্রথম ভারত থেকে রাষ্ট্রদূত রোমে এসেছিলেন এবং তিনি তার সাথে সাপ, মুক্তা, মূল্যবান পাথর এবং হাতবিহীন জন্ম নেয়া একটি ছেলেকে নিয়ে আসেন।

রোমীয়রা খ্রীষ্টপূর্ব ২৫ সালে লৌহিত সাগর আবিস্কারের জন্য এ্যালিয়াস গ্যালাসের অধীনে সমুদ্র অভিযান পরিচালনা করেছিল। নতুন জলপথ এবং সম্ভবত সম্রাট তিবিরিয়ের রাজত্বকালে সমুদ্রপথে মৌসুমী বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ার আবিস্কারই ছিল

ভারতের সাথে রোমের ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল চাবিকাঠি। আর এই আবিস্কারের সুফল হিসেবে রোমের বার্ষিক বাণিজ্য মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে পাঁচ কোটি সেস্টার্সে পৌঁছায়। ঋতু পরিক্রমায় দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু মৌসুমী বায়ু এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বইতে শুরু করে, যা এই সময় রোম থেকে ভারতে সমুদ্র যাত্রার জন্য বাণিজ্য জাহাজগুলোকে অনুকূল সুযোগ করে দিতো। অন্যদিকে, উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বইতে থাকে বলে এই সময় ভারত থেকে বাণিজ্য জাহাজগুলো লৌহিত সাগরে ফিরে আসতো। এটি জানার পর রোমীয়রা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরবীয়দের দালালীকে বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয়।

ভারত থেকে যেসব উপকরণ আসতো এগুলো ছিল– তোতা পাখি, কচ্ছপের বহিরাবরণ, মুক্তা, মূল্যবান রত্ন, ইত্যাদি। বিশেষ আমদানিকৃত দ্রব্যাদির মধ্যে ছিল উদ্ভিজ্জ উপকরণ এবং মসলা, যেমন– আবলুস, সুগন্ধি লতা, তেজপাতা, দারুচিনি ও মরিচ। এগুলো ভারতে ও সিরিয়াতে উৎপাদিত হতো– তবে রোমীয় সাম্রাজ্যে এর তেমন কোন বড় ধরণের আমদানী ছিল না। সম্রাট হোরেস এক বার এটিকে জলে সিদ্ধ তরল ঔষধি খাবার হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। ভারত, পার্সিয়া ও যিহূদিয়াতে তুলা উৎপাদিত হতো।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননের দ্বারা ভারতে রোমীয়দের উপস্থিতিকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। পন্ডিচেরির কাছে আরিকামদুতে প্রত্নতাত্ত্বিকরা গুরুত্বপূর্ণ আরিটাইন কবিতার খন্ডাংশ ও রোমীয় কাচের সামগ্রী এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গাতে সম্রাট আগস্তের রাজত্বকালের বেশ কিছু রোমীয় মুদ্রা আবিস্কার করেন।

সমুদ্রযাত্রা

সমুদ্রযাত্রা সচরাচর নির্ভর করতো মৌসুমের উপর। আর সমুদ্রযাত্রার সবচেয়ে ভাল সময় ছিল গ্রীষ্মকাল– ২৬শে মে ও ১৪ই সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী দিনগুলো। অন্যদিকে, শীতকালে ১০ই নভেম্বর ও ৫ই মার্চের মধ্যবর্তী দিনগুলো ছিল এতোটাই বিপজ্জনক যে, কেউ পরিস্থিতির শিকার হয়ে বা চাপে পড়ে যাত্রা করতো, যেমন– যুদ্ধের সময় লোকদেরকে বাধ্য হয়ে সমুদ্রযাত্রা করতে হতো। ১৪ই সেপ্টেম্বর ও ১০ই নভেম্বরের মধ্যবর্তী দিনগুলো এবং ৫ই মার্চ ও ২৬শে মে'র মধ্যবর্তী দিনগুলো সমুদ্রযাত্রার জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। প্রেরিত পৌলের সুবিদিত সমুদ্রযাত্রায় জাহাজ ভেঙ্গে পড়ার ঘটনাটি (প্রেরিত ২৭:৩৯-৪৪) ঘটেছিল সম্ভবত অক্টোবর মাসে।

বন্দি হিসেবে প্রেরিত পৌলের সমুদ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়ার খাদ্যশস্য

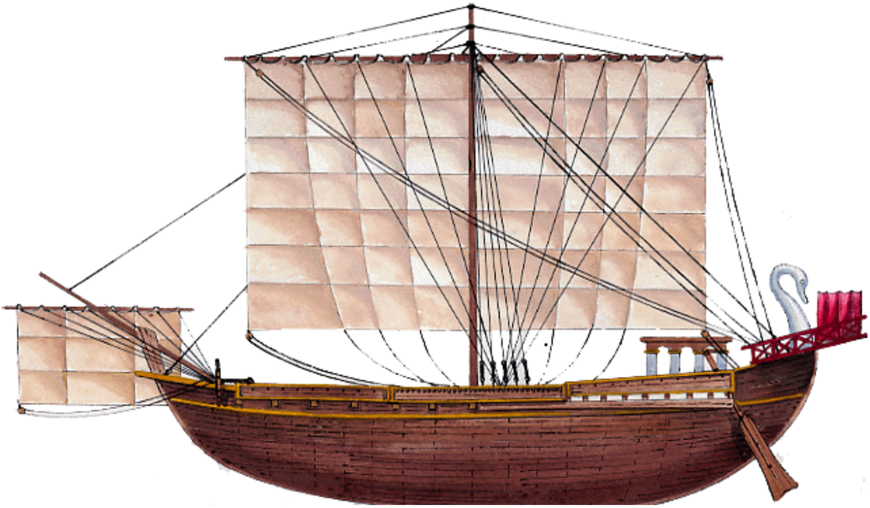

[একটি রোমীয় বাণিজ্য জাহাজ, যা খাদ্যশস্য জাতীয় মালামাল পরিবহনে ব্যবহার করা হতো।]

বহনকারী একটি জাহাজে করে এবং এই জাহাজে ছিল ২৭৬ জন যাত্রী। আর এই ধরণের জাহাজগুলো দৈর্ঘে সচারচর ১৮০ ফুট/ ৫৫ মিটার হতো এবং এগুলোর বহন ক্ষমতা ছিল ১,২০০ টন। রোমে যাওয়ার পথে, যিহূদী ঐতিহাসিক জোসিফাসও জাহাজডুবির শিকার হয়েছিলেন। তিনি যে জাহাজে ভ্রমণ করেছিলেন, সেটিতে ৬০০ জন লোক ছিল।

সম্রাটের বার্তবাহকরা অনায়াসেই প্রায় ৫০ দিনের মধ্যে রোম ও ইস্রায়েল দেশ ও আশেপাশের অঞ্চলের মধ্যে সফর করতে পারতেন। অন্যদিকে, একই দূরত্ব অতিক্রম করতে বণিকদের ১০০ দিন লাগতো। যাহোক ডাকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে দেরি হতো। সিরিয়ার শাসনকর্তা পেট্রোনিয়াস যখন সম্রাট ক্যালিগুলার আদেশ অমান্য করেন, তখন সম্রাট ৪০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাকে হত্যার আদেশ দিয়ে একটি বার্তা পাঠান। আর ৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী ক্যালিগুলাকে গোপনে হত্যা করা হয়। তবে আনন্দের বিষয় হিসেবে সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ, পেট্রোনিয়াসকে পাঠানো প্রথম বার্তার ২৭ দিন আগেই ফেব্রুয়ারী মাসে তার কাছে পৌঁছায়। এই সব কিছুই ঘটেছিল শীতকালে, যখন সমুদ্রযাত্রা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

বই ও গ্রন্থাগার

প্রাচীন বিশ্বের লোকজন মিশর থেকে আনা প্যাপিরাস কাগজে লিখতো। (ইংরেজী

পেপার শব্দটি এসেছে ‘প্যাপিরাস’ থেকে)। ফৈণীকীয় সমুদ্রবন্দর বিবলসের মধ্য দিয়ে গ্রীকরা তাদের প্যাপিরাস কাগজ আমদানি করতো। গ্রীকরা তাদের বইকে ‘বিবলস’ বলতো (আর এই ‘বিবলস’ থেকেই বাইবেল শব্দটি এসেছে)।

যখন এশিয়া-মাইনর অঞ্চলে অবস্থিত পার্গামামের একটি শহর প্যাপিরাস কাগজ সরবরাহ থেকে বঞ্চিত ছিল, তখন সেখানকার লোকেরা পার্চমেন্ট কাগজ আবিস্কার করে– ছাগল ও ভেড়ার চামড়া থেকে লেখার এই উপকরণটি তৈরি করা হয়েছিল। অন্যান্য লেখার উপকরণগুলোর মধ্যে ছিল ভাঙ্গা মাটির পাত্রের টুকরা (ল্যাটিন ভাষায় যাকে ‘অস্ট্রাকা’ বলা হয়) এবং মোমের ফলক, যা বিদ্যালয়ে লিখতে ব্যবহৃত হতো। প্রেরিত পৌল এক বার তীমথিয়কে পার্চমেন্টের জন্য অনুরোধ করেন– সম্ভবত এটি ছিল পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের চামড়ায় গুটানো বইয়ের জন্য অনুরোধ (২ তীমথিয় ৪:১৩)।

প্রাচীন হিব্রু ও অরামিক ভাষার পাণ্ডুলিপিগুলো স্বরবর্ণ ছাড়াই লেখা হয়েছিল। যদিও কিছু দীর্ঘ স্বরবর্ণকে নির্দেশ করতে, কিছু ব্যঞ্জন বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছিল। কোন প্রকার বিরাম চিহ্ন এবং শব্দের মাঝে দূরত্ব ছাড়াই গ্রীক মূল পাঠ লেখা হতো। বিশেষত প্রাচীন লেখাগুলো প্যাপিরাস কাগজে অথবা চামড়ায় লেখা হতো– এগুলোর কোন কোনটির দৈর্ঘ আবার ৩০ ফুট বা ৯ মিটারের মত। এই ধরণের গুটানো বই থেকে বিশেষ কোন অনুচ্ছেদ খুঁজে বের করা খুবই কঠিন। (পবিত্র বাইবেলের অধ্যায় ও পদ ভিত্তিক বিভাজনগুলো পনেরশো ও ষোলশো খ্রীষ্টাব্দে উপস্থাপন করা হয়)।

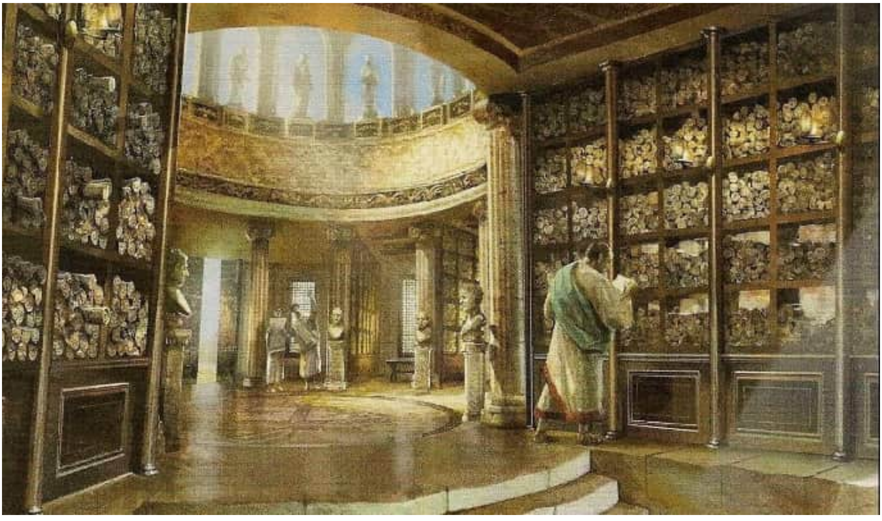

[একটি রোমীয় গ্রন্থাগার]

BACIB International Bible CHURCH

রোমীয়দের জীবন ও বিশ্বাস

প্রাথমিক খ্রীষ্টিয়ানরা অপেক্ষাকৃত সহজ উদ্ধৃতির জন্য ‘কোডেক্স’ নামে বইয়ের একটি ধরণকে গ্রহণ করেন। মিশর থেকে উদ্ধারকৃত ২য় শতাব্দীর আগেকার প্যাপিরাস কাগজের উপরে হাতে লেখা ১২টি কোডিসের খন্ডাংশ আমাদের রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সাতটি পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের এবং তিনটি নতুন নিয়মের। একটি তথাকথিত ‘এগারটন’ সুসমাচার এবং অন্যটি ‘হের্মেসের মেষপালক’ নামে একটি লেখার অংশ। ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত অযিহূদী লেখকরা কোডেক্সকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করেন নি। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এথেন্সের শাসক পিসিস্ট্রাটাস এবং সামঃ দ্বীপের পলিক্রেটস প্রাচীনতম গ্রন্থলোকে সংগ্রহ করেন। চিন্তাবিদ প্লেটো ও এরিস্টোটল তাদের দর্শন বিষয়ক বিদ্যালয়ের বইগুলোকে সংগ্রহ করেন। গ্রীকরা সর্ব প্রথম গণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারটি ছিল প্রাচীন বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম। এটিতে ছিল ৫০০,০০০ থেকে ৭০০,০০০ মত (চামড়ায় লেখা) গুটানো বই– যেগুলো সনাক্তকারী চিরকুট সমেত তাকে সাজানো ছিল। দীর্ঘতর লেখার জন্য গুটানো বইয়ের খন্ডাংশগুলো বালতির মত ধারণপাত্রে রাখা হতো। গ্রন্থাগারের প্রতিটি তালিকায় ১২০টি করে স্ক্রল উল্লেখ থাকতো। আরেকটি বৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল পর্গামে (বর্তমান তুরস্কে)।

রোমীয়রা ম্যাসিডোনিয়ার ও আখায়ার যুদ্ধে গ্রন্থাগারগুলোকে নিজেদের জন্য সংগ্রহ করে। যুদ্ধ শেষে সেনাপতি এমিলিয়াস পৌলাস রাজা পার্সিয়াসের গ্রন্থাগার এবং সুলা এরিষ্টেটলের বইয়ের সঙ্কলন নিয়ে ফিরে আসেন। সিসেরো তার নিজের গ্রন্থাগারটি সংগ্রহ করেন এবং তার দাসদেরকে দিয়ে পান্ডুলিপিগুলোর অনুলিপি তৈরি করিয়ে নেন। রোম সম্রাট ট্রাজান গ্রীক ও ল্যাটিন লেখা বা বইগুলোর সমন্বয়ে পড়ার কক্ষ সহকারে ‘বিবলিওথিকা আলপিয়া’ নামে একটি চমৎকার গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্রাট হাড্রিয়ান এথেন্সে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তার একটি দেয়াল আজও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ৪র্থ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রোমে প্রায় ২৯টির মত গণ গ্রন্থাগার দেখতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টিয়ান পন্ডিতদের মধ্যে ওরিজেন (১৮৫-২৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) কৈসরিয়াতে এবং ২১২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বিশপ আলেক্জান্ডার যিরূশালেমে গ্রন্থাগার স্থাপন করেন।

রোমীয়দের ভাষা

খ্রীষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীর ল্যাটিন ভাষায় প্রাচীনতম টিকে থাকা লেখাটি প্রেনেস্টে একটি সোনার ব্রোচের (পোশাক আটকানোর জন্য কারুকার্য করা পিন) উপর পাওয়া যায় এবং এটি লেখা হয়েছিল ডান থেকে বাম দিকে। রোমের সর্বসাধারণের সভাস্থলের ল্যাপিস নাইজার (সময়কাল: খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী) হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও

রোমীয়দের জীবন ও বিশ্বাস

প্রাচীন শিলা লিপি এবং এটি লেখা হয়েছিল বাম থেকে ডানে এবং ডান থেকে বামে পর্যায়ক্রমিকভাবে। খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে গ্রীক লেখার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ল্যাটিন সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীরও আগেকার কিছু কিছু শিলালিপি এখনো টিকে রয়েছে।

সম্রাট আগস্তের পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে ল্যাটিন সাহিত্যের স্বর্ণযুগ আসে। তার রাজত্বকালেই উদ্ভব ঘটে কবি ভার্জিল ও হোরেস এবং ঐতিহাসিক লিভি ও ভূতত্ত্ববিদ স্ট্রাবোর বিখ্যাত সব লেখাগুলো। প্রণয়শীল বিষয়ে লেখার জন্য লেখক ওভিড সম্রাটের ক্রোধের শিকার হয়েছিলেন। রোমীয়দের কাছে সাইবেরিয়ার সমতুল্য বুলগেরিয়ার কৃষ্ণ সাগর উপকূলে তাঁকে নির্বাসিত করা হয়েছিল।

সম্রাট নিরোর শাসনকালে, বৈরাগ্যবাদী দার্শনিক সেনেকা তার ভাইয়ের ছেলে লুসানের মত করে লিখছিলেন। এই লুসান ছিলেন যুলিয় সিজার (কৈসর) ও পম্পের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল, সেটিকে কেন্দ্র করে লেখা 'ফার্সালিয়া' মহাকাব্যের লেখক। পেট্রোনিয়াস 'স্যাটারিকন' নামের অশ্লীল কল্পকাহিনী লিখেছিলেন, যা সম্রাট নিরোর রাজত্বের অবক্ষয়কে তুলে ধরে।

ফ্লাভিয়ান সম্রাটদের রাজত্বকালে শিক্ষা, ফ্রন্টিনাসের কৌশলগত সন্ধি, স্টেটিয়াসের কবিতা এবং মার্শিয়ালের ব্যঙ্গাত্মক রচনার উপর প্লিনির (জেষ্ঠ্য) সর্বব্যাপী প্রাকৃতিক ইতিহাস কুইন্টিলিয়ান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে একত্রে লেখা হয়েছিল। সম্রাট ট্রাজান ও হাড্রিয়ানের রাজত্বকাল থেকে প্লিনির (কনিষ্ঠ) চিঠি, জুভিনাল ও সুয়েটোনিয়াসের ব্যঙ্গাত্মক রচনা 'সিজারদের (কৈসরদের) জীবন' এবং ট্যাসিটাসের ইতিহাস বিষয়ক লেখাগুলো এসেছিল।

বিভিন্ন প্রদেশে বসবাসরত লোকদের জন্য ল্যাটিন ভাষার চেয়ে গ্রীক ভাষায় পড়াশোনা করা আরও বেশি স্বাভাবিক বিষয় ছিল। তবে আইন অথবা রাজনীতিতে পেশাগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ল্যাটিন ভাষা অপরিহার্য ছিল। প্রদেশগুলোতে কেবল দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক নথিপত্রের জন্য ল্যাটির ভাষা ব্যবহৃত হতো।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশের উপর যে লেখা ছিল– তা ল্যাটিন, গ্রীক ও হিব্রু (অথবা, অরামিক লেখায় হিব্রু বর্ণের ব্যবহার) ভাষায় লেখা হয়েছিল। যাহোক, অগণিত ল্যাটিন নামকে বাদ দিয়ে গ্রীক ভাষায় পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে কেবল ২৫টি ল্যাটিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর এই শব্দগুলোকে পাওয়া যায় মার্কের লেখা

সুখবরে এবং পন্ডিতরা বিশ্বাস করেন যে, এটি সম্ভবত রোমে বসে লেখা হয়েছিল।

১৯৬১ সালে কৈসরিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিস্কৃত রঙ্গমঞ্চে খুবই মজাদার একটি ল্যাটিন শিলা লিপি পাওয়া। আর এতে থাকা একটি উৎকীর্ণ লিপিতে পন্তীয় পীলাতের নাম প্রথম বারের মত প্রকাশ পায় এবং এটি একটি মন্দিরকে নির্দেশ করে, যেটি সম্রাট তিবিরিয়কে উপাসনার জন্য উৎসর্গ করা হয়েছিল।

প্রথম গুরুত্বপূর্ণ খ্রীষ্টিয়ান ধর্মতত্ত্ববিদের ল্যাটিন ভাষায় লেখাটি ছিল 'কার্থেজের জ্বালাময়ী টার্টুলিয়ান' (১৯৭-২২২ খ্রীষ্টাব্দ)। যদিও তিনি তাঁর এই লেখাতে গ্রীক ভাষায় শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন। যাহোক, কার্থেজের বিশপ সিপ্রিয়ান (২০০-২৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) শাস্ত্রীয় ল্যাটিন অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত করেন, যা এখন 'ওল্ড আইটালিক' সংস্করণ নামে পরিচিত। সর্বপরি, তিনি ছিলেন যেরোম (৩৪৭-৪২০ খ্রীষ্টাব্দ), যিনি ল্যাটিনকে পাশ্চাত্যের মণ্ডলীগুলোর ভাষায় পরিণত করেন।

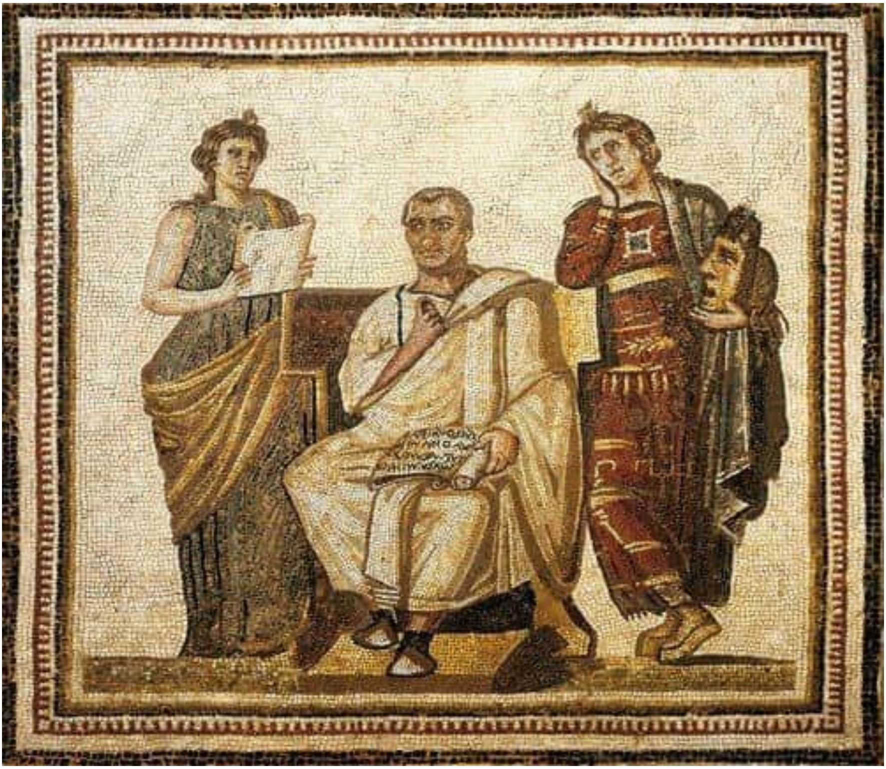

[অ্যাসক্লেপিয়াম স্বাস্থ্য কেন্দ্রের একটি দৃশ্য]

বাইবেলকে মূল হিব্রু ও গ্রীক ভাষা থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করতে তিনি পয়ত্রিশ বছর বৈৎলেহমে অবস্থান করেন এবং তার সংস্করণ 'ভলগেট' থেকে এখনো উদ্ধৃত করা হয়।

প্রাচীন বিশ্বের ঔষধ

কোসের কিংবদন্তি 'হিপোক্রেটস' (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬০-৩৮০ সাল) ছিলেন 'চিকিৎসা শাস্ত্রের পিতা'। যাহোক, চিকিৎসা বিষয়ক কোন লেখাই তার নামের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না। তবে খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০-৩৫০ সাল পর্যন্ত চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবদানের কৃতিত্ব অবশ্যই তাকে দেয়া উচিৎ। বর্তমান সময়ের চিকিৎসকরা তথাকথিত 'হিপোক্রেটসের সেই শপথ বাক্য' আজও উচ্চারণ করে থাকেন এবং এই শপথের সাথে সম্পৃক্ত কথাগুলো: "তুমি তোমার দক্ষতাকে পুরোপুরিভাবে তোমার রোগীর সুস্থতার জন্য ব্যবহার করো, কোন ঔষধের ব্যবস্থা দিও না, কোন অস্ত্রোপচার করো না, এমনকি অপরাধমূলক বিষয়ের ক্ষেত্রেও যদি সনির্বন্ধ অনুরোধও করা হয়, এটাই পরামর্শ দিও।"

এগ্রিজেন্টামের এম্পেডোকল্স (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯০-৪৩৫ সাল)

তিনি একটি চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, যেটি নিশ্চিত করেছিল যে, সব ধরণের অসুস্থতা চার ধরণের রসের অসমতার জন্য সৃষ্টি হয়: রক্ত, কফ, হলুদ পাচক

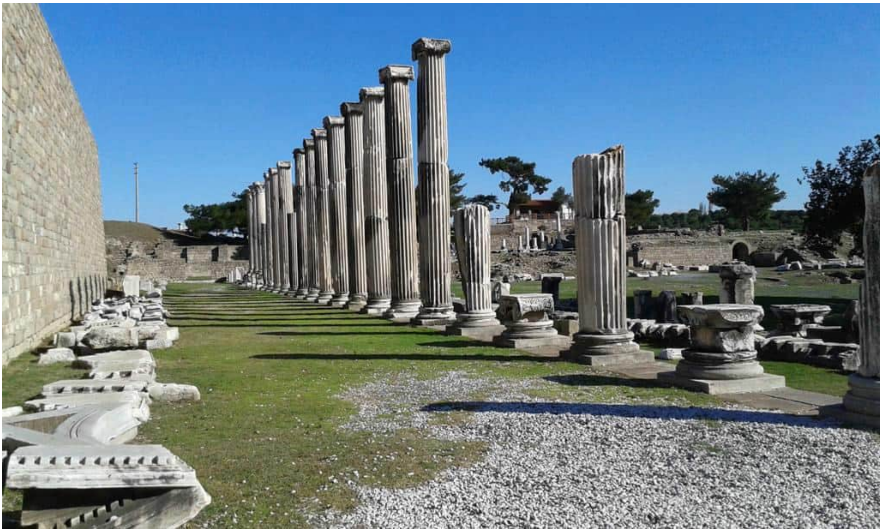

[অ্যাসক্লেপিয়াম ছিল একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, যা পার্গামামে এমনই এক জন লোক প্রতিষ্ঠিত করেন, যিনি শহর থেকে অসুস্থ অবস্থায় এসে, গ্রীসের এপিডরিয়াসের আরোগ্যকারী দেবতা অ্যাসক্লেয়াসের মন্দিরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই কেন্দ্রে একটি মন্দির, গ্রন্থাগার, রঙ্গমঞ্চ ও ঘুমানোর ব্যবস্থা ছিল।]

রস ও কাল পাচক রস।

চালসিডোনের হেরোফিলা (খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী)

[খিলানযুক্ত সুড়ঙ্গপথ, যা চলে গিয়েছে সেই কক্ষে, যেখানে চিকিৎসা দেয়া হয়। আর কখনো কখনো আঘাতজনিত চিকিৎসা প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় লোকদের উপর ঠান্ডা জল ঢেলে দেয়া হতো।]

তিনি আলেকজান্দ্রিয়াতে তার গবেষণা চালিয়েছিলেন। তিনি কেবল মৃতদেহের ব্যবচ্ছেদই করেন নি, তিনি এমনকি অপরাধীদের অঙ্গ ব্যবচ্ছেদও করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানুষের মস্তিস্কই হলো তার বুদ্ধির কেন্দ্রস্থল– কিন্তু মিশরীয়রা তার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল যে, মস্তিস্ক হলো এমন একটি বস্তু, যা দিয়ে মানুষের মাথা পূর্ণ থাকে। হেরোফিলাস সংবেদন-শীল ও গতিসঞ্চারক স্নায়ুর মধ্যে এবং শিরা ও ধমনীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধমনীর মধ্য দিয়ে মানব দেহে বাতাস প্রবাহিত– যারা এই মত পোষণ করতো হিপোক্রেটসের বিদ্যালয় তাদের বিপরীত দিক দাবী করতো। তিনি দাবী করেছিলেন যে, ধমনীর মধ্য দিয়ে মানব দেহে রক্ত পরিবাহিত হয়।

চিওসের এরাসিস্ট্রটাস

তিনি আলেকজান্দ্রিয়াতে আরও এক চিকিৎসা বিষয়ক পন্ডিত ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার জন্য মানুষ অসুস্থ হয় এবং নির্ধারিত খাদ্য তালিকায় সীমাবদ্ধ হওয়াই অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভের উপায়। তিনি বলেছিলেন যে, শক্তি ব্যবহারের ফলে প্রাণীদের শরীরের ওজন কমে।

পর্গামের গ্যালেন

তিনি রোম সাম্রাজ্যে চিকিৎসা বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন (খ্রীষ্টপূর্ব ১৩০-২০১ সাল)। তিনি স্মূর্ণা, আলেকজান্দ্রিয়া ও করিন্থে পড়াশোনা করেন। 'অন্ধবিশ্বাস' নামে একটি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তিনি কারণ ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিশ্বাস করতো যে, কেবল তারাই সত্যকে জানে। মার্কাস অর্লিয়াস থেকে শুরু করে সেপ্টেমিয়াস সেভেরাসের সময় পর্যন্ত, গ্যালেন সম্রাটদের চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন। তিনি তার ব্যবচ্ছেদ প্রক্রিয়া কেবল প্রাণীদের উপর চালিয়েছিলেন বলে তিনি

[অস্ত্রোপচারের জন্য রোমীয় চিকিৎসকদের ব্যবহৃত কিছু যন্ত্রের সংগ্রহ।]

চিকিৎসার ক্ষেত্রে কিছু ভুল ধারণা প্রকাশ করেছিলেন।

ইফিষের সোরানাস

তিনি ২য় খ্রীষ্টাব্দে খুবই সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তিনি 'মেথোডিস্ট' ঔষধ বিষয়ক বিদ্যালয়ের প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এই মেথোডিস্ট মতালম্বীরা তিনটি সম্ভাব্য রোগে বিশ্বাস করতেন: অতিরিক্ত শুষ্কতা, অতিমাত্রায় আদ্রতা ও মানবদেহে রসের অসমতা। তিনি 'কিভাবে সদ্যজাত শিশুকে চিনতে পেরে, উপযুক্তভাবে লালন পালন করা যায়' নামে একটি নিবন্ধ লিখেন। তার সবচেয়ে বিখ্যাত বইটি ছিল ধাত্রীবিদ্যার উপর।

পর্গামের ইসক্লেপিয়াস

তার আরোগ্যকারী মন্দিরের এ্যালিয়াস আরিসটাইডসের (১১৭-১৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) ব্যবস্থাদির মধ্যে আমরা একটি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি– তিনি পেশাগত দিক থেকে অলঙ্কারিক শাস্ত্রের এক জন শিক্ষক ছিলেন। আরিসটাইডস বিভিন্ন ধরণের রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, এগুলোর মধ্যে শ্বাসকষ্ট ও শোথ উল্লেখযোগ্য। যখন তার মারাত্মক জ্বর হয়েছিল, তখন তাকে একাধিক বার নদীর বরফঠান্ডা জলে স্নান করার এবং পূর্ণ গতিতে এক মাইল দূরত্ব দৌঁড়াতে বলা হয়েছিল। অন্যান সময়ে, তাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়, গরম জলে স্নান করতে হয় এবং শরীর থেকে রক্ত ঝরাতে হয়। আর আগেকার দিনে অসুস্থতার মত রক্তক্ষরণেও অসংখ্য রোগীরা মারা যেতো।

রোমীয় শহর ও নগর

রোমীয়দের ভবন ও দালানগুলো

‘পোজোলানা’ (পূতিয়লী শহরের নামানুসারে) নামের আগ্নেয় ছাই ও চুনের সংমিশ্রন ঘটিয়ে রোমীয়রা কংক্রিট আবিস্কার করে। আর এই হালকা ওজনের কংক্রিটের দক্ষ ব্যবহারে রোমীয়রা তাদের ভবনগুলোতে তোরণ, খিলান ও গম্বুজ তৈরি করে। সম্রাট হাড্রিয়ানের দ্বারা রোমে রাজা আগ্রিপ্পের পুনঃনির্মিত স্মৃতিভবনের গম্বুজ সর্বকালের সবচেয়ে আকর্ষণীয় গম্বুজগুলোর মধ্যে অন্যতম, যার ব্যস প্রায় ১৫০ ফুট (৪৫ মিটার)। সম্রাট ডমিশিয়ানের প্রাসাদে স্তম্ভকাকৃর্তি খিলান ব্যবহৃত হয়েছিল, যার আড়াআড়ি দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট (৩০ মিটার)।

কিন্তু তাদের স্থাপত্য ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, খুব কম রোমীয়রা তাদের নিজেদের আলাদা বাড়িতে থাকতে সক্ষম হতো। রোমের প্রতিটি পৃথক বাড়ির জন্য ছিল ২৬টি চারদিক রাস্তাঘেরা বহুতল ভবন– যার প্রতিটি তলায় বসবাসের জন্য অসংখ্য কক্ষের সমন্বয় ঘটেছিল। পম্পে ও হার্কুলেনিয়ামে সংরক্ষিত ছিল বিলাসবহুল বাগানবাড়ি এবং অবশিষ্ট দালানকোঠাগুলো ছিল অস্টিয়ার রোমীয় বন্দরে।

[ইতালির পম্পে শহরের একটি দৃশ্য।]

রোমীয় শহর ও নগর

মুনাফাখোর ভূস্বামীদের জমিদারদের মধ্যে রাজনীতিবিদ ক্রাসাসের নাম অন্যতম। এরা উচুঁ থেকে উচুঁতর চারদিক রাস্তা দিয়ে ঘেরা বহুতল (যার প্রতিটি তলা অসংখ্য আবাসযোগ্য কক্ষ নিয়ে তৈরি) বিশিষ্ট দালান তৈরি করতে শুরু করে। তাদের এই তৎপরতা চলতে থাকে, যতদিন না সম্রাট আগস্ত উচ্চতাকে ৭০ ফুট (২১ মিটার) অথবা ৬ তলা পর্যন্ত সীমিত করার আদেশ না দেন। সচরাচর যেমনটি হতো, তার উল্টো দিক হিসেবে, চারদিক রাস্তা দিয়ে ঘেরা বহুতল দালানের অসংখ্য কক্ষের ব্যয়বহুল তলাগুলোকে উপরের দিকে না রেখে, দোকান (তাবারনে) প্রতিস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত নীচে রাখা হতো। আবাসযোগ্য কক্ষবিশিষ্ট তলাগুলো যত বেশি উপরে হতো, ততো বেশি ওগুলো সস্তা, নোংরা ও ঘণবসতিপূর্ণ হতো। নীচ তলার বার্ষিক ভাড়া সর্বোচ্চ ৩০,০০০ দিনারি এবং উপর তলাগুলোর বার্ষিক ভাড়া সর্বনিম্ন ২,০০০ দিনারির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো।

ভবনের সব চেয়ে উচুঁ তলায় যারা থাকতো, অনেক পরিশ্রম করে উপরে জল তোলার বিষয়টি ছিল তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। কারণ কখনো কখনো ভবন তৈরিতে ভঙ্গুর উপরকরণ ব্যবহারের জন্য কক্ষগুলো হয়ে উঠতো আগুনের ফাঁদ। কবি জুভেনাল লিখেছিলেন: 'কে টিভোলির উচুঁ জায়গাতে দাঁড়িয়ে, অথবা গাবির মত ছোট শহর অবস্থান করে তার বাড়ি ধ্বসে পড়ার বিষয়ে ভয় পায়? রোম শহরটি টিকে রয়েছে তামাক খাওয়ার পাইপ ও দেয়াশলাই কাঠির উপর– কারণ ধ্বংসাবশেষ তীরে তোলার জন্য এগুলোই ভূস্বামী বা বাড়িওয়ালাদের কাছে অপেক্ষাকৃত সহজতর উপায়। দালানের পুরনো দেয়ালের ফাটল জোড়া লাগানো হয় এবং সব ভাড়াটিয়ারা তা দেখতে পায়। তারা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমায়, যদিও তাদের

[তৎকালীন সময়ে রোমীয় শহরের স্থাপত্য শিল্পের একটি চিত্র।]

উপরকার ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করে। সেখানে থাকার জন্য থাকে না কোন জায়গা, যেখানে আগুন বলে কেউ চিৎকার করে না! জলের জন্য প্রতিবেশীর চিৎকারে রাতের আতঙ্ক ধ্বণিত হয়– যিনি তার বাড়ির আসবাবপত্র ও মালামাল সরাচ্ছেন– আর পুরো তৃতীয় তলা ধোয়ায় ভরে গেছে।'

প্রায়ই আগুন লাগার বিষয়টি ৩,০০০ ভিজিলেসের কাছে একটি দিয়াশলাইয়ের চেয়ে বেশি কিছু হয়ে উঠেছিল– এই ভিজিলেস হচ্ছে তারা যাদেরকে সম্রাট আগস্ত দাসত্ব মুক্ত দাসদেরকে নিয়ে অগ্নিনির্বাপক কর্মী ও পুলিশ বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাই ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নিরোর রাজত্বকালে রোমে যে আগুন লেগেছিল, যা সুদীর্ঘ ধারাবাহিক বিষয় হিসেবে সব দিক থেকেই সবচেয়ে খারাপ বিষয় ছিল।

কৃত্রিম নালা

রোমীয়দের প্রকৌশলগত দক্ষতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ ছিল তাদের বিস্ময়কর কৃত্রিম নালাগুলো এবং তারা সেগুলো রোম ও রোমের বাইরের অন্যান্য জায়গাতে নির্মাণ করেছিল। রোমের জন্য সর্বপ্রথম কৃত্রিম নালা নির্মাণ করা হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৩১২ সালে। ব্যাপক সংখ্যক কৃত্রিম নালা আগ্রিপ্প সম্রাট আগস্তের অধীনে এবং সম্রাট ক্লৌদিয়ের মাধ্যমে নির্মাণ করেন। এটি অনুমান করা হয় যে, উল্লেখিত কৃত্রিম নালাগুলো রোম শহরে ২০-৩০ কোটি গ্যালন (৯১-১৩৬ কোটি লিটার) পানি সরবরাহ করে। গর্ব করার মত বিষয় হিসেবে, জল সরবরাহের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা, ফ্রন্টিনিয়াস ঘোষণা করেছিলেন: 'কে স্থির হয়ে থাকা পিরামিড, অথবা গ্রীকদের অন্যান্য মূল্যহীন বিখ্যাত কাজগুলোকে অসংখ্য অত্যাবশ্যকীয় কাঠামো হিসেবে এই কৃত্রিম নালাগুলোর সাথে তুলনা করবে।'

বর্তমান ইস্রায়েল দেশের কৈসরিয়াতে প্রত্নতাত্ত্বিকরা উচ্চমাত্রার ও নিন্মমাত্রার দুইটি কৃত্রিম নালার অবশেষকে খুঁজে পেয়েছেন– যেগুলো ব্যবহার করে ৫ মাইল দূর থেকে খিলান প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে জলাভূমির উপর দিয়ে জল নিয়ে আসা হতো। ফ্রান্সের নীমে অবস্থিত পোন্ট ডু গার্ড নামের তিন সারিবিশিষ্ট কৃত্রিম নালাটি আড়াআড়িভাবে একটি নদী উপত্যকা অতিক্রম করে জল পরিবহন করতো। সম্রাট আগস্ত স্পেনের সিগোভিয়াতে ৬০ মাইল (৯৬ কিলোমিটার) ব্যাপী জল সরবরাহের উদ্যোগ হিসেবে দুই তলা বিশিষ্ট যে কৃত্রিম নালাটি নির্মাণ করেছিলেন, তা আজও ব্যবহার করা হয়।

[খিলানের উপর অবস্থিত কংক্রিটের আয়তাকার পাইপ দিয়ে তৈরি কৃত্রিম নালা– চিত্রে ফ্রান্সের পন্ট ডু গার্ড নামের কৃত্রিম নালাটিকে দেখা যাচ্ছে।]

আবর্জনা পরিত্যাগ

যখন প্রেরিত পৌল তাঁর পূর্বেকার অর্জনকে খ্রীষ্টকে জানার গৌরবের সাথে তুলনার প্রয়াস পেয়েছিলেন, তখন তিনি ঐসব অতীত অভিজ্ঞতাকে একটি শব্দে প্রকাশ করেছিলেন, ‘এমন কিছু জিনিস, যা কুকুরকে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিল’। সম্ভবত তাঁর মনের মাঝে বিদ্যমান নোংরা-আবর্জনাকে তিনি প্রতিনিয়ত রাস্তায় ছুঁড়ে মারতেন যাতে কুকুরগুলো তা খেতে পারে। কোন কোন সময় দালানের উপর তলার জানালা দিয়ে ছুঁড়ে মারা হতো, যার বিষয়ে জুভেনাল সাবধান করেছিলেন: ‘রাতের বিভিন্নমুখী বিপদের মত অন্যান্য বিষয়গুলোর দিকে তাকান। দালানের কত উচুঁ কার্নিশ ভেঙ্গে গিয়েছে, আর ভাঙ্গা খন্ডাংশ পড়ে আমার মাথায় আঘাত লেগেছে। অথবা, কিছু বোকা লোক জানালা দিয়ে বড় মাটির পাত্র টেনে উঠাতে গিয়ে তা ভেঙ্গে গেল, অথবা তাতে চিড় খেলো। রাতে যত বেশি দালানগুলোর জানালা খোলা থাকবে, মৃত্যুর সংখ্যাও তত বেশি হবে। তাই যখনই রাতে আপনি কোন জায়গা দিয়ে পথ চলেন, আপনি বুদ্ধিমান হন, তবে তখনই আপনি আপনার এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় একনিষ্ঠভাবে প্রার্থনা করবেন। আর পাত্র থেকে তরল ছিটকে পড়ার থেকে বেশি কিছু না পড়ায় লোকেরা সন্তুষ্ট থাকবে।’

ভবনের উচুঁ তলায় বসবাসকারী লোকদের তাদের শয়নকক্ষে ব্যবহার্য মূত্রধানীর বর্জ্যকে নীচে মাটিতে ময়লার গর্তে ফেলে আসার কথা। কিন্তু তারা প্রায়ই তাদের ময়লার পাত্রের বর্জ্যকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলত, যা অসর্তক পথচারীদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে উঠতো। যেহেতু কাপড় ধোয়ার কাজে প্রস্রাব ব্যবহার করা হত, তাই কাপড় পরিস্কারের জন্য গণ প্রস্রাব-খানাগুলোকে প্রায়ই ধোপাখানাগুলোর সামনে স্থাপন করা হতো। আর গণ পায়খানাগুলোকে সামান্য টাকার বিনিময়ে ব্যবহৃত হতো। ব্যবহারের পরে কৃত্রিম নালা থেকে আসা জলপ্রবাহ দিয়ে পায়খানার বর্জ্যকে সরিয়ে দেয়া হতো যেন তা ভূ-গর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীতে গিয়ে পড়ে প্রবাহিত হতে পারে। আর এই সব ভূ-গর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীগুলোর মধ্যে 'ক্লোয়াকা ম্যাক্সিমা' ছিল অন্যতম, যার মধ্য দিয়ে বর্জগুলো প্রবাহিত হয়ে টাইবার নদীতে গিয়ে পড়তো।

[রোমীয় গণ শৌচাগারের ভগ্নাবশেষ।]

স্নানাগার

সবচেয়ে যে বিশেষ সুবিধাটি ধনী-গরিব নির্বিশেষে রোমীয়রা উপভোগ করতে পারতো, সেটি ছিল গণ স্নানাগার ব্যবহারের সন্তুষ্টি। প্রাথমিকভাবে স্নানাগার ব্যবহারের জন্য পরিমিত একটি অঙ্কের টাকা দিতে হতো, কিন্তু পরবর্তীতে গণ স্নানাগার ব্যবহারের জন্য জনগণকে কোন টাকা দিতে হতো না। সম্রাট আগস্তের রাজত্বকালে রোমে ১৭০টি গণ স্নানাগার ছিল। আর এগুলো এতোটাই জনপ্রিয় হয়ে

[রোমীয়দের বিলাসবহুল স্নানাগার।]

উঠেছিল যে, এর ফলশ্রুতি হিসেবে ১ম খ্রীষ্টাব্দের আগে প্রায় ১,০০০টি ছোট গণ স্নানাগার নির্মাণ করা হয়েছিল।

সম্রাটরা সত্যিকারের ব্যয়বহুল স্নানাগারগুলো নির্মাণ করেছিলেন। সম্রাট নিরো ১,৬০০টি মত মার্বেল পাথরের স্নানের আসন তৈরি করেছিলেন। সবচেয়ে বৃহত্তম গণস্নাগারগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল দুইটি– এদের একটি কারাকাল্লায় ৩৩ একর জায়গার উপর নির্মিত ও অপরটি নির্মাণ করা হয়েছিল ডায়োক্লিশিয়ানে ৩২ একর জমির উপর। আর এই দুটোই ৩য় খ্রীষ্টাব্দে তৈরি করা হয়েছিল।

এই গণস্নানাগারগুলোতে বিভিন্ন ধরণের বিশেষ বিশেষ কক্ষের ব্যবস্থা ছিল: সাজঘর (এপোডাইটেরিয়াম), শরীর ঘষার কক্ষ (আঙ্কটোরিয়াম), বাষ্পাগার (লাকোনিকাম), গরম স্নান (ক্যালডারিয়াম), উষ্ণ স্নান (টেপিডারিয়াম) এবং ঠান্ডা স্নান (ফ্রিজিডারিয়াম)। তবে যাহোক না কেন, রাজকীয় স্নানাগারে (থার্মে) স্নানের চেয়ে আরও বেশি কিছু ছিল। এগুলো ছিল ছোট শহরের মত বিষয়, যাতে স্থান পেতো– মল্লযুদ্ধ ও ব্যায়াম করার কক্ষ, গ্রন্থাগার, যাদুঘর, দোকান, রেস্তোরা, খেলাধুলার কক্ষ এবং পতিতালয়। আর মধ্যাহ্নের সময় এই স্নানাগারগুলো খুলতো এবং সূর্যাস্তের সময় বন্ধ হতো।

[রোমীয় জনগণের বিণোদনের কেন্দ্রস্থল হিসেবে চিহ্নিত এক সময়ের স্নানাগার।]

রোমীয় শহর ও নগর

সম্রাট হাড্রিয়ানের রাজত্বকাল পর্যন্ত নারী ও পুরুষ একত্রে স্নান করতো− স্ত্রীলোকেরা দিনের প্রথম দিকে আসলেও, পুরুষরা অপেক্ষাকৃত পরে আসতো। স্নানাগারগুলো লোকজন ও তাদের কোলাহলে পূর্ণ থাকতো। লেখক সেনেকা এক সময় একটি গণ স্নানাগারের কাছাকাছি থাকতেন, তাই সেখানকার দৃশ্য নিয়ে তিনি তার অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছিলেন এভাবে− 'যখন আপনার তেজস্বী পুরুষটি শারীরিক কসরতের মাধ্যমে ব্যায়াম করছে; যখন সে কঠোর পরিশ্রম করে, অথবা কঠোর পরিশ্রম করার ভান করে, তখন আমি তার রাগে বিড়বিড় করা অস্ফুট শব্দ শুনতে পাই এবং যখন সে তার বুকের রুদ্ধ শ্বাসকে ছাড়ে, তখন তার হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ এবং দীর্ঘশ্বাসের কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাই ... বাড়তি মাত্রা হিসাবে যদি এর সাথে যোগ হয় মাঝে মধ্যে হৈ-হুল্লোড়কারী, অথবা পকেটমারের গ্রেফতার হওয়ার মত বিষয়, সেই লোকটির হৈচৈ যে লোকটি সব সময় স্নানঘরে নিজের কণ্ঠের শব্দ শুনতে ভালবাসে, অথবা জলাধারে কৌতূহলী ব্যক্তিটি জলে নিমজ্জিত হয়ে বিবেকবর্জিত লোকের মত যদি কোলাহল করে, অথবা জল ছিটায় ...।'

সভ্য জগতের অত্যাবশ্যকীয় দিক হিসবে স্নানাগারকে বিবেচনা করা হতো, যার ফলে মহান রাজা হেরোদ হেরোদিয়াম, ম্যাখায়েরাস এবং ইস্রায়েল দেশের মাসাদার মত জায়গাতে থার্মে বা গণস্নানাগার নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে জল সরবরাহ কম ছিল।

রোমীয় সড়ক ও জনপথ

রোমের রাস্তাগুলো ছিল সরু, যা প্রস্থে ১৩-১৬ ফুট (৪-৫ মিটার)। প্রস্তর ফলকগুলোকে কখনো কখনো রাস্তা পারাপারের জন্য রাখা হতো এবং এটি এখনো পম্পেতে দেখতে পাওয়া যায়।

[তখনকার রোমীয়দের তৈরি রাস্তা।]

রোমে যানবাহন সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে, সম্রাট যুলিয় কৈসর সব যানবাহনকে সূর্য ওঠা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত নিষিদ্ধ করেছিলেন কেবল চারটি বিষয় ছাড়া: নির্মাণ অথবা উচ্ছেদনের মালগাড়ি; বিজয়ী রথ; শবযাত্রা এবং ভেস্টা দেবীকে উৎসর্গকৃত কুমারী ও পুরোহিতের ঘোড়ায় টানা গাড়ি। এটি দিয়ে বোঝায় যে, অধিকাংশ মালবাহী গাড়িগুলো রাতে শহরে প্রবেশ করতো বলে শহরবাসীরা রাতে একটুও

ঘুমাতে পারতো না। অসন্তোষের সুরে জুভেনাল বলেছিলেন: ‘ধনী ছাড়া কারইবা ঘুমানোর অথবা, বাগান বাড়ি থাকার সামর্থ রয়েছে? আর ঐটিই হলো সমাজে প্রদাহ ছড়িয়ে পড়ার উৎস। রাতের আধারে জেলা শহরগুলোর সরু রাস্তায় গাড়ির চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হয়– যখন চালকদের গাড়িগুলো থামে, তখন তারা চিৎকার করে তুমুল ঝগড়া শুরু করে, যা (ঘুম থেকে জাগান কঠিন এমন) গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সিন্ধুঘোটকের শাবকের ঘুমে বাধা দেয়ার জন্য যথেষ্ট।’

রোমীয়দের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদানগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলসমূহকে একত্রে ধরে রাখতে তাদের জালের মত সুবিস্তৃত সড়ক পথ। খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীরও আগে এই সড়কগুলো শুরু হয়েছিল, তবে এগুলো বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল রোম সাম্রাজ্যের শাসন শুরুর আগে।
চূড়ান্তভাবে রোমীয়রা ২৫০,০০০ মাইল পাথরে আবৃত রাস্তা তৈরি করতে সক্ষম হয়। আর এগুলোর অনেক রাস্তাই নতুন গমন পথ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল এবং তীরের মত সোজা হয়ে চলে গিয়েছিল।

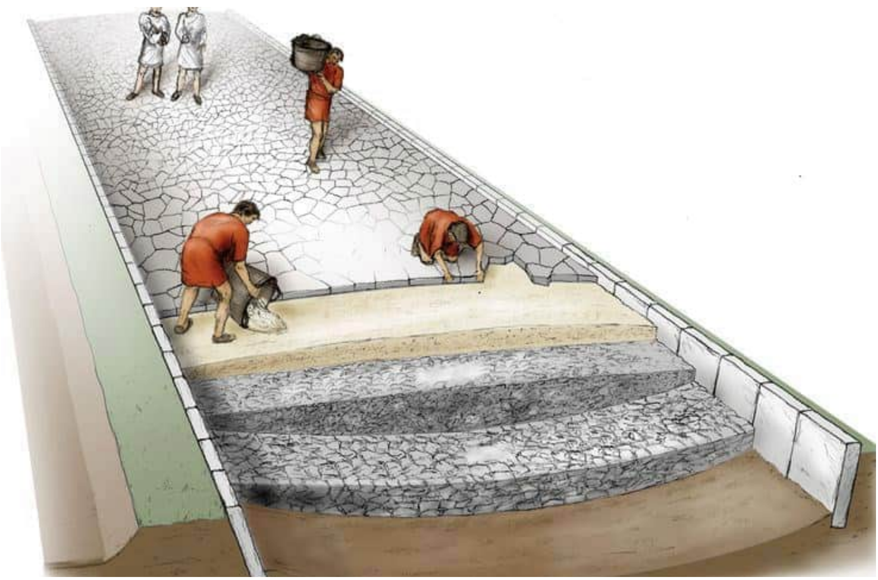

[নির্মাণাধীন অবস্থায় একটি রোমীয় সড়কের ভিত্তি স্তরটি বালু বা চুন সুরকি দিয়ে তৈরি করা হতো। ভাঙ্গা পাথর ও নুড়ির একটি স্তর তার উপর দেয়া হতো। প্রস্তর খন্ডগুলোকে কংক্রিটের আকারে বসিয়ে সড়কটির উপরের কঠিন স্তরটি তৈরি করা হতো। পয়ঃনালা দিয়ে বৃষ্টির জল প্রবাহিত হতো। সড়কে রাখা প্রস্তর ফলকগুলো শহরের মধ্যে রাস্তায় যানবাহনের গতি কমিয়ে দিতো এবং তা অতিক্রম করার সময় পথচারীদেরকে সড়কটি শুকনো রাখতে সাহায্য করতো।]

রোমীয় শহর ও নগর

[রোমীয়দের তৈরি রাস্তার সাধারণ দৃশ্য।]

যখন রাস্তা নির্মাণ শুরু হতো, তখন প্রকৌশলীরা এর ভিত্তি হিসেবে ৩ ফুট (১ মিটার) গভীর পরিখা নির্মাণ করতো। তারপর তারা তাতে বালু, পাথর, নুড়ি ও নির্মাণ সামগ্রীর ভিত্তি স্তর স্থাপন করতো এবং এগুলোর উপরে বালু, চুন ও পানির মিশ্রণের মধ্যে পাথরের খোয়া বিছিয়ে দিতো। শহরের সড়কে ব্যবহৃত পাথরের খোয়াগুলো সমতল প্রস্তর ফলকবিশিষ্ট হতো। কিন্তু এক্ষেত্রে অন্যান্য জায়গাতে অসমতল প্রস্তর খন্ড ব্যবহার করা হতো।

রোমীয়রা নদীর উপর দিয়ে অসংখ্য চমৎকার সেতু তৈরি করেছিল। এগুলোর কিছু কিছু সেতু এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেমন– রোম থেকে উত্তর ইতালির রিমিনিতে যেতে 'ভিয়া ফ্লামিনিয়া' নামের সড়কের উপর অবস্থিত 'পন্টি গ্রসো' সেতু। পর্তুগালের লুসিটানিয়ার টাগুস নদীর উপরে নির্মিত সুরক্ষিত সেতুটি দৈর্ঘ্যে ৬১৭ ফুট (১৮৮ মিটার) এবং এর খিলানগুলোর ব্যস প্রায় ৯০ ফুট (২৭ মিটার)। এগারো জন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এটি তৈরির প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করেছিলেন।

রোমের সর্বসাধারণের সভাস্থলে গোল্ডেন মাইলস্টোন নামের স্মৃতিস্তম্ভ থেকে সড়কগুলো পরিমাপ করা হতো। ল্যাটিন থেকে আসা এক হাজার (মাইল) এর জন্য এক হাজার পদক্ষেপকে রোমীয় মাইল হিসেবে পরিমাপ করা হয়েছিল। এটি ছিল ইংরেজী মাইলের হিসাব থেকে একটু কম ছিল– ১,৭৬০ গজের (১,৬০৮ মিটার) জায়গায় ১,৬২০ গজ (১,৪৮০ মিটার) ছিল। একেকটি মাইলকে চিহ্নিত করতে ৬ ও

৮ ফুট উচ্চতার পাথরের থাম (১.৮-২.৪ মিটার) স্থাপন করা হয়েছিল। রোম প্রজাতন্ত্রের সময়, এই পাথরের থামগুলো দিয়ে কেবল দূরত্ব নির্দেশ করা হতো। কিন্তু সাম্রাজ্যের শাসনামলে, এগুলো সম্রাটদের নাম ধারণ করতো। যুগোশ্লাভিয়ায় মাইলের একটি থামে সংরক্ষিত রয়েছে যে, 'সম্রাট ট্রাজান পাহাড় কেটে ও পাহাড়ী বাঁকগুলো দূর করে সেগুলোর মধ্য দিয়ে রাস্তা তৈরি করেছিলেন।' মিশরে আবিস্কৃত সম্রাট হাড্রিয়ানের রাজত্বকালে নির্মিত একটি মাইল ফলক আমাদের কাছে তথ্য সরবরাহ করে যে, এই সড়ক নির্মাণ করার সাথে সাথে তিনি 'গমন পথের বিরতি হিসেবে জলাধার, বিশ্রামস্থান ও সেনানিবাসের' ব্যবস্থা করেছিলেন।

রোম থেকে ছড়িয়ে পড়া প্রধান পাঁচটি সড়কের মধ্যে ছিল– খ্রীষ্টপূর্ব ৩২১ সালে সম্রাট আপিয়াস ক্লৌদিয়ের নির্মিত রোম থেকে কাপুয়া অভিমুখী বিখ্যাত আপিয়ান সড়ক (ভায়া আপিয়া)। নিয়াপলির (নেপলস) কাছে কাপুয়াতে রাস্তা দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল: এদের একটি শাখা মেসিনাতে গিয়েছে এবং অন্যটি ব্রান্ডিসিয়ামে গিয়েছে। আপিয়ান পথটি অস্বাভাবিকভাবে প্রশস্ত ছিল– আড়াআড়িভাবে ১৪-২০ ফুট (৪-৬ মিটার) চওড়া রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি দুইটি গাড়ি চলতে সক্ষম হতো।

ইগনেশিয়ান সড়ক (ভায়া ইগনেশিয়া) ম্যসিডোনীয় পশ্চিম উপকূলের ডাইরাশিয়াম থেকে থিষলনীকী, আম্ফিপলি, ফিলিপী ও সর্বশেষে কনসটান্টিনোপল– যার সম্পূর্ণ দূরত্ব ছিল ৫০০ মাইল। এটিই ছিল সেই গমন পথ, যা প্রেরিত পৌল, সীল ও

[রোমান সম্যাজ্যের চলাচলের পাকা রাস্তা।]

তীমথি তাঁদের যাত্রাপথ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

যদিও যিহূদিয়া, শমরীয়া ও পলেষ্টিয়া সহ আশেপাশের অঞ্চলের কিছু রাস্তাঘাট সম্রাট আগস্তের রাজত্বের প্রথম দিকে তৈরি করা হয়েছিল, তা সত্ত্বেও এই সমস্ত অঞ্চল ও সিরিয়ার ৫০,০০০ প্রস্তর ফলক আবৃত সড়কের অধিকাংশই সম্রাট ট্রাজান ও হাড্রিয়ানের রাজত্বকালে নির্মাণ করা হয়েছিল। পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে উল্লেখিত সেই বিখ্যাত দামেস্কের ‘সোজা নামের রাস্তা’ (ভায়া রেক্টা), যেখানে প্রেরিত পৌল অবস্থান করেছিলেন (প্রেরিত ৯:১১) – বর্তমানে এটি বাব শার্কি রাস্তা বলা হয়। এটি এখনো একটি রোমীয় খিলানের দ্বারা চিহ্নিত রয়েছে, যা সিরিয়রা সম্প্রতি বর্তমান রাস্তার যে স্তর তার ১৩ ফুট বা ৪ মিটার নীচে খুঁজে পেয়েছে এবং পূর্ব দিকের রাস্তার শেষ প্রান্তে তারা একটি ত্রিমাত্রিক খিলান আবিস্কার করেছে।

[রোমীয় পান্থশালার একটি চিত্র।]

জালের মত রোমীয় সড়ক ও রাস্তাঘাটগুলোর বিস্তৃতি প্রারম্ভিকভাবে সৈন্যবাহিনীর সহজে পথ চলার এবং সম্রাট আগস্ত নির্দেশিত সাম্রাজ্যের ডাক চলাচলের জন্য স্থাপন করা হয়েছিল। পারসিকদের ‘দ্রুতগামী টাট্টুঘোড়ার সেবা’ কার্যক্রমের রোমীয় অনুকরণে প্রতি ১০ মাইল/ ১৬ কিলোমিটার দূরত্বে ঘোড়া সরবরাহ এবং প্রতি ২৫ মাইল/ ৪০ কিলোমিটার দূরত্বের ব্যবধানে বিশ্রামের জন্য সরাইখানার ব্যবস্থা ছিল। প্রতিদিন সংবাদবাহকরা গড়ে ১২০ মাইল/ ১৯২ কিলোমিটার পথ যেতে সক্ষম হতো।

সর্বসাধারণের জন্যও সরাইখানার ব্যবস্থা ছিল। প্রেরিত পৌল তিন-সরাই-গ্রাম নামে ইতালির একটির জায়গাতে আসার পর সেখানে রোম থেকে আসা লোকেরা তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন, রোম থেকে ঐ জায়গাটির দূরত্ব ছিল ৪৩ মাইল (প্রেরিত ২৮:১৫)। তবে অসাধু সরাইখানার মালিক, ডাকাতদের আড্ডা এবং ছাড়পোকার বিরক্তিকর কক্ষের জন্য প্রায়ই এই সব প্রতিষ্ঠানগুলো অপ্রীতিকর বিষয় হয়ে উঠেছিল। আর যারা সচ্ছল বেশ কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে চলাফেরা করতো, তারা সেখানকার জলবায়ুর সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে পারতো, সেখানে তাদের নিজেদের তাঁবু খাটাত। বিভিন্ন জায়গায় অবস্থানকারী বন্ধু মহল যদি তাদের বন্ধুদের, অথবা অন্যান্য সংশ্লিষ্টদেরকে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে ইচ্ছুক থাকতো, তবে তাদের ক্ষেত্রে

ভ্রমণ অপেক্ষাকৃত সহজতর ছিল।

পায়ে হেঁটে যারা পথ চলতো, এমন পথচারীরা প্রতি ঘন্টায় ৩ মাইল পথ অতিক্রম করতে পারতো। সৈনিকরা সাধারণভাবে কুচকাওয়াজ করে পথ চললে ঘন্টায় ৪ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতো। কিন্তু যদি তারা বাধ্যতামূলকভাবে কুচকাওয়াজ করতে করতে সামনে এগিয়ে যেতো, তবে তারা প্রতি ঘন্টায় ৫ মাইল পথ যেতে সক্ষম হতো। পায়ে হেঁটে গড়ে এক দিনের অতিক্রান্ত দূরত্ব ছিল ১৫-২০ মাইল; গাধার পিঠে চড়ে যারা পথ চলতো, তারা দৈনিক ২০ মাইল এবং যারা ঘোড়ার গাড়িতে চড়তো, এক দিনে ২৫-৫০ মাইলের মত পথ অতিক্রম করতে পারতো। সম্রাট যুলিয় কৈসর এক বার ৮০০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ৮ দিনে রোন নদী থেকে রোমে পৌঁছেছিলেন। ২৫ ঘন্টায় ২০০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে সম্রাট তিবিরিয় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। জালের মত বিস্তৃত এই চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম প্রচারকরা ব্যবহার করেছিলেন, যেমন– প্রেরিত পৌল খ্রীষ্টের সুখবর প্রচারে এই গমন পথ ব্যবহার করেছিলেন। ফ্রান্সের আইরেনিয়াস ১৮০ খ্রীষ্টাব্দে (প্রায়) লিখেছিলেন: ‘রোমীয়রা পৃথিবীকে শান্তি দিয়েছে এবং আমরা নির্ভয়ে রাস্তায় পথ চলতে পারি এবং সাগর পাড়ি দিতে পারি– যেতে পারি যেখানে ইচ্ছা সেখানে।’

[প্রাচীন রোমীয়দের সাধারণ যোগাযোগের বাহন।]

খ্রীষ্টয়ানরা আতিথিয়তার চর্চা করতেন– তাই তারা বিশ্বব্যাপী ভ্রমণকারীদেরকে সাহায্যের জন্য জনকল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ‘দিদাখে’ নামের অনেক প্রাচীন একটি খ্রীষ্টিয় লেখা খ্রীষ্টিয়ান আতিথিয়তার অপব্যবহারের বিষয়ে সাবধান করে বলেছিল: ‘যখন আপনার কাছে কোন প্রেরিত আসেন, তখন তাকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করুন। তবে এক দিনের বেশি আপনার বাড়িতে তার থাকা উচিৎ নয়, যদি প্রয়োজন হয়, তবে দুই দিনের বেশি নয়। কিন্তু যদি সে তিন দিন আপনার কাছে থাকেন, তবে তিনি এক জন ভন্ড প্রেরিত।’

খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন

রোমীয় নাটক

রোমীয়রা প্রজাতান্ত্রিক শাসনামলে অপেক্ষাকৃত দেড়ি করে তাদের নাট্য শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছিল এবং এক্ষেত্রে তারা সচেতনভাবে গ্রীকদেরকে অনুকরণ করে। রোমীয় বিয়োগন্তক নাটকগুলো কখনো জনপ্রিয় হয় নি– সেনেকার লেখা এই জাতীয় নাটকগুলো লেখা হয়েছিল কেবল আবৃত্তিমূলক উদ্দেশ্য নিয়ে, কিন্তু অভিনিত বা মঞ্চস্থ হওয়ার জন্য নয়। প্লাউটাস ও (খ্রীষ্টপূর্ব ২৫৪-১৮৪ সাল) এবং টেরেন্স (খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৫-১৫৯ সাল) ছিলেন রোমীয় মিলনান্তক নাটকের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। তারা স্বাধীনভাবে হেলেনীয় লেখক মিনানদারে নতুন ধারার মিলনান্তক নাটকগুলোকে পরিবর্তনের দ্বারা উপযোগী করে নিতেন। গ্রীকদের দুর্বলতা নিয়ে বিদ্রুপ করার জন্য রোমীয়রা পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত থাকতো।

খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৯ সালের প্রথম দিকে কাঠের মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। প্রথম প্রস্তরের

[২৫,০০০ দর্শক আসনবিশিষ্ট ইফিষের নাট্যমঞ্চ।]

মঞ্চ নির্মাণ করা হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫ সালে পম্পে শহরের জন্য এবং এতে ২৮,০০০ আসনের ব্যবস্থা করা হয়। ৮,০০০ দর্শকের আসন সমৃদ্ধ বালবাস নাট্যমঞ্চ রোমে খ্রীষ্টপূর্ব ১৩ সালে তৈরি করা হয়। মার্সেলাস নাট্য মঞ্চটি তৈরি করা হয় খ্রীষ্টপূর্ব ১১ সালে, যার আসন সংখ্যা ছিল ১৫,০০০– এই নাট্যমঞ্চটি এখনো দাঁড়িয়ে থাকলেও, এটিকে বহুতল ভবনে পরিণত করা হয়েছে। এক জন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছিলেন যে, 'বস্তুত নাট্যমঞ্চটি অভিনয়ের জন্য খুবই বড় ছিল।' সাধারণ শ্রেণীর দর্শকদের আসনের সংখ্যাই বেশি ছিল।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা তাদের পোশাক-পরিচ্ছেদের দ্বারা চিহ্নিত হতেন: সাদা রঙের পোশাক ছিল বয়স্ক পুরুষদের, বেগুণী রঙ ছিল ধনীদের এবং হলুদ রঙ ছিল পতিতাদের। অভিনয়ের মাধ্যমে অভিনেত্রীরা এতোটাই কুখ্যাত ছিলেন যে, তাদেরকে পতিতা বলে মনে করা হতো। নাচ বহুল অভিনয় এবং মূক অভিনয় খুবই জনপ্রিয় ছিল। 'জীবনের খন্ডাংশ' প্রকাশ করতো বলে রোমীয়রা মূক অভিনয় খুবই উপভোগ করতো। রোমীয় দর্শকদের মধ্যে অভিনেত্রীরা তাদের কাপড় খুলে নগ্ন হতো, যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হতো, অপরাধীদেরকে নির্যাতন করা হতো এবং কখনো কখনো তাদেরকে মঞ্চের উপরেই ক্রুশবিদ্ধ করা হতো।

রথের দৌড় প্রতিযোগীতা

রথের দৌড় প্রতিযোগীতা ছিল রোমের সব চেয়ে বড় আকর্ষণ। প্যালেটাইন পাহাড়ের পাদদেশে ম্যাক্সিমাস সার্কাসের বিস্তৃত পরিসরে এর আয়োজন করা হতো। সবচেয়ে বৃহৎ দৌড়ের মাঠটি এখনো সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং এই মাঠ দৈর্ঘ্যে ছিল ৬৪৫ গজ/ ৬০০ মিটার এবং প্রস্থে ছিল ২১৫ গজ/ ২০০ মিটার। সম্রাট ফ্লাভিয়ানের রাজত্বকালে এতে প্রায় ২৫৫,০০০ দর্শক একসাথে বসে দেখতে পারত।

সাধারণত রথগুলোর প্রতিটিকে চারটি ঘোড়ায় টেনে নিয়ে মাঠের কেন্দ্রস্থলের চারদিকে সাত বার ঘুরতে হতো– সর্বমোট দূরত্ব প্রায় ২ মাইল/ ৩ কিলোমিটার। দৌড় চলাকালে যতটা সম্ভব কাছাকাছি থেকে ঘড়ির কাটার বিপরীতে বাঁক নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই রথচালকদের দক্ষতা হিসেবে বিবেচিত হতো। আধুনিক সময়ের মটরগাড়ির দৌড় প্রতিযোগীতার মত এর অতিরিক্ত উত্তেজনা বিপদের কারণ হয়ে উঠতো। দর্শকরা রথের বিধ্বস্ত হয়ে পড়া অথবা অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় রথচালকের মৃত্যুমুখী হওয়ার মত দৃশ্য দেখার প্রত্যাশা করতো।

আলোচনার ক্ষেত্রে রথের দৌড় প্রতিযোগীতার বিষয়টি ছিল অন্য সব বিষয়গুলোর

[রথের দৌড় খুবই জনপ্রিয় একটি বিষয় হলেও এটি ছিল খুবই বিপজ্জনক একটি প্রতিযোগীতা।]

মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়। ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন: 'খুব কম লোকই পাওয়া যায়, যারা তাদের বাড়িতে রথের দৌড় প্রতিযোগীতার কথা রেখে, অন্য বিষয়ে কথা বলেন। আর যখনই আমরা কোন শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করি, তখন যা দেখতে পাই, তা তরুণদের আলোচনার আর কোন বিষয়টি হতে পারে? শিক্ষকরা অভিযোগ করতেন যে, তাদের ছাত্ররা রথের দৌড় প্রতিযোগীতার দিনগুলোতে পাঠে মনযোগ দিতে পারতো না কারণ ম্যাক্সিমাস সার্কাসের দর্শকদের চিৎকার পুরো শহর জুড়ে প্রতিধ্বণিত হতো। ছোট ছোট ছেলেরা তাদের খেলনা রথ টানতে কুকুর বা ছাগল ব্যবহার করে, ওগুলো নিয়ে খেলা করতো।'

সাদা, সবুজ, নীল ও লাল নামের চারটি প্রতিষ্ঠান রথ ও রথচালকদের ব্যয়ভার বহন করতো। নিম্ন শ্রেণীর রথচালকরা যদি প্রতিযোগীতায় বিজয়ী হতো, তবে তারা ধনী হতে পারতো। লেখক জুভেনাল ঘোষণা করেছিলেন: 'লাল দলের এক জন রথচালক বা "টিকটিকি" যা আয় করতো, এক শত জন আইনজীবি তার চেয়ে কম আয় করতো।' ডায়োক্লিস নামের ১৫০ (প্রায়) খ্রীষ্টাব্দের লাল দলের এক জন রথচালক ২,০০০ এর বেশি প্রতিযোগীতায় বিজয়ী হয়ে সাড়ে তিন কোটি সেস্টার্সের (দশ লক্ষ পাউন্ড) মালিক হয়েছিল।

রথের দৌড় প্রতিযোগীতার জুয়াখেলার আয়োজনে অংশগ্রহণ আসক্তির সমতুল্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। নিরোর স্ত্রী পপ্পিয়া রথের দৌড় প্রতিযোগীতার প্রতি আসক্তির জন্য স্বামী নীরোর সমালোচনা করেছিলেন। যার কারণে তিনি তার গর্ভবতী স্ত্রীকে লাথি মেরেছিলেন বলে তিনি মারা গিয়েছিলেন। ফুটবল প্রতিযোগীতার ভক্ত

দর্শকদের মত, এক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দী দলগুলোর সমর্থকদের মধ্যে প্রায়ই দাঙ্গা বাধতো। আর এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাতটি ছিল 'নিকা দাঙ্গা', যেটি কনসটান্টিনোপলের মল্লভূমিতে রথের দৌড় প্রতিযোগীতার মাঠে ৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল। সবুজ ও নীল দলের সমর্থকরা একে অপরের সাথে দাঙ্গায় মেতে উঠেছিল এবং প্রায় ৩০,০০০ লোক মারা গিয়েছিল। ৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চূড়ান্তভাবে রথের দৌড় প্রতিযোগীতাকে নিষিদ্ধ করা হয়।

গ্লাডিয়েটর ও (বিনোদনমূলক) রক্তাক্ত খেলা

রোমীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে বাজে দিক ছিল বিনোদনের জন্য গ্লাডিয়েটরদের রক্তাক্ত খেলা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্রমবর্ধমানভাবে এর জনপ্রিয়তা বেড়ে উঠেছিল।

রোমের খুবই প্রাচীন জনগোষ্ঠী এট্রাস্ক্যানদের মধ্য থেকে এই খেলার উৎপত্তি হয়েছিল। এট্রাস্ক্যানরা নিজেদের পতিত বীর যোদ্ধাদের আত্মার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ বন্দীদেরকে উৎসর্গ করতো। রোম প্রজাতান্ত্রিক শাসনামলে, জনগণের সমর্থন লাভের জন্য নিজেদের তহবিল থেকে এই ধরণের খেলার আয়োজন করা ঐ সময়কার 'মেয়রদের' জন্য যেন প্রথাগত রীতি হয়ে উঠেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৬৫ শতাব্দীতে সম্রাট যুলিয় কৈসর ৩২০ জোড়া গ্লাডিয়েটরের মধ্যে আক্রমণাত্মক খেলা আয়োজনের ব্যয়ভার বহন করে জনমনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিলেন।

ব্যয়ভার বহনের মধ্য দিয়ে ১০,০০০ জন যোদ্ধার উপস্থিতিতে সম্রাট আগস্ত ২৭টি

[চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের পাথরের শিল্পকর্মে বিজয়ী গ্লাডিয়েটরদের ছবি তুলে ধরা হয়েছে।]

প্রদর্শনী এবং ২৬টি প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা করেছিলেন। আর এই ২৬টি প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী ৩,৫০০টি হিংস্র প্রাণীকে হত্যা করা হয়েছিল। যখন সম্রাট তীত ফ্লাভিয়ান রঙ্গমঞ্চকে ৮০ খ্রীষ্টাব্দে উৎসর্গ করেছিলেন, তখন তিনি ১০০ দিন ব্যাপী এই খেলার আয়োজন করেন এবং তাতে যিহূদিয়া থেকে আসা ২,৫০০ বন্দী অংশগ্রহণ করে। সম্রাট ট্রাজান তার ডাসিয়ান বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে, চার মাসব্যাপী এই রক্তাক্ত বিনোদনমূলক খেলার আয়োজন করেন এবং তাতে ৫,০০০ জোড়া গ্লাডিয়েটর অংশগ্রহণ করে।

সম্রাট কৈসরের রাজত্বকালে, বছরে ১৩২ দিন ছুটি ছিল। কিন্তু সম্রাট ক্লৌদিয়ের শাসনামলে, এই ছুটির দিনকে বাড়িয়ে ১৫৯ দিন করা হয়েছিল– আর ১৫৯ দিনের ৯৩ দিন গ্লাডিয়েটরদের খেলার জন্য নির্ধারিত ছিল। ৩য় খ্রীষ্টাব্দে বার্ষিক এই ছুটির দিনকে বাড়িয়ে ২০০ করা হয় এবং তার মধ্যে ১৭৫ দিন এই রক্তাক্ত বিনোদনমূলক খেলার জন্য নির্ধারিত ছিল। আর পরবর্তীতে বছরে কার্যদিবসের চেয়ে ছুটির দিনই বেশি হয়ে উঠেছিল।

শিকার ও বন্য প্রাণীর সাথে যুদ্ধ করার মত বিষয়ও এই খেলায় স্থান পেয়েছিল। এই সব দৃশ্যের প্রাণী সরবরাহের জন্য পৃথিবীর সব জায়গার পশুগুলোকে এমনভাবে রোমে নিয়ে আসা শুরু হয়েছিল যে, নুবিয়ার জলহস্তি, উত্তর আফ্রিকার হাতি এবং মেসোপটমিয়ার সিংহ বিলুপ্ত হওয়ার পথে চলে গিয়েছিল। রোমীয়রা এমনকি আরও হিংস্র জানোয়ার খুঁজে বেড়িয়েছিল। সম্রাট কৈসর পার্থিয়া থেকে জিরাফ, বাঘ এবং অন্যান্য জায়গা থেকে গন্ডার ও কুমির আনার প্রস্তাব করেছিলেন। এই রক্তাক্ত বিনোদনমূলক খেলার বিষয়ে বক্তা সেনেকা এক বার হুমকি দিয়েছিলেন: ‘একটি বিশাল প্রাণী যখন অসহায় এক জন মানুষকে ছিঁড়েকুঁড়ে খায়, অথবা একটি চমৎকার প্রাণীকে যখন বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করে ফেলা হয়, তখন এক জন সভ্য মানুষ এর মাঝে কি ধরণের আনন্দ পায়?’

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, যে সব লোকদেরকে পশুদের সাথে লড়াই করতে বাধ্য করা হতো, তাদের অধিকাংশই ছিল অপরাধী অথবা যুদ্ধবন্দী। তবে এদের মধ্যে পেশাগত গ্লাডিয়েটরও ছিল, যাদেরকে রোম, কাপুয়া ও পম্পের গ্লাডিয়েটর বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। জুভেনাল তার সময়কার নারী স্বাধীনতা বিষয়ক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন– তাদের এই আন্দোলন এতোটাই এগিয়ে গিয়েছিল যে, স্ত্রীলোকেরাও গ্লাডিয়েটর হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল।

স্যামনাইট হিসেবে পরিচিত গ্লাডিয়েটররা ভারী সাজ-পোশাক সজ্জিত হয়ে এই ধরণের লড়াইয়ে অংশে নিত। কিন্তু অন্যরা, যারা রেটিয়ারি বলে পরিচিত ছিল, তারা কেবল একটি জাল, ত্রিশূল ও ছোরা নিয়ে সজ্জিত থাকত। যোদ্ধারা সম্রাটের সামনে উপস্থিত হয়ে চিৎকার করে বলতো: 'মহামান্য সম্রাট, যারা মরার জন্য প্রস্তুত, তারা আপনাকে অভিবাদন জানাচ্ছে।' আর এই খেলায় যখন কেউ পড়ে যেতো, তখন দর্শকরা তার জীবনের অনুরোধ জানাতো, অথবা তার মৃত্যুর জন্য চিৎকার করে উঠতো। যদি তারা তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইতো, তবে রুমাল নাড়াতো– তারা বৃদ্ধাঙ্গুল উপরের দিকে তুলে, 'মিত্তি' বলে চিৎকার করতো। আর যদি তারা তাকে মেরে ফেলতে চাইতো, তবে তারা তাদের আঙ্গুল দিয়ে নীচের দিক ইঙ্গিত করে, 'আয়ুগুলা' বলে চিৎকার করতো, ফলে শিকারের গলায় ছোরা চালিয়ে দেয়া হতো। এরপর মৃতদেহ সেখান থেকে সরিয়ে, ঐ জায়গার উপর বালি দিয়ে ঢেকে দেয়া হতো, যেন পরবর্তী প্রতিযোগীরা সেখানে উপস্থিত হতে পারে।

রক্তাক্ত এই বিনোদনমূলক বর্বরতার বিরুদ্ধে কিছু অপেক্ষাকৃত প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বণিত হয়েছিল। সিসেরো সাধারণভাবে মন্তব্য করেছিলেন, 'এই ধরণের প্রদর্শন

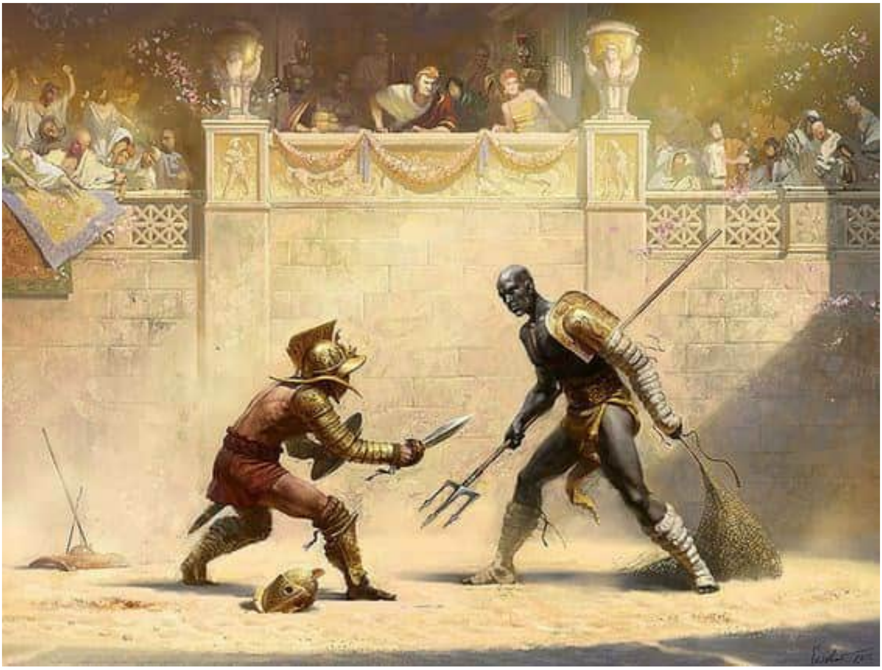

[গ্লাডিয়েটররা মূলত তাদের জীবনের জন্য লড়াই করতো। জাল ও ত্রিশূলে সজ্জিত এক জন রেটারিয়াস যোদ্ধার মুখোমুখি তরবারি ও ঢালে সজ্জিত এক জন স্যামনাইট যোদ্ধা।]

কিছু লোকের চোখে নিষ্ঠুর ও বর্বর বলে মনে হয় এবং আমিও তাই মনে করি, যেভাবে এখন তা ঘটেছে।' এমনকি বিরতির সময়েও সংঘটিত এমন অর্থহীন হত্যাকান্ডের আপত্তি জানিয়ে সেনেকা বলেছিলেন: 'প্রতিটি লড়াইয়ের সর্বশেষ পরিণতি হলো মৃত্যু; প্রতিদ্বন্দী যেই হোক না কেন, পতিত হলে, তাকে জীবন ভিক্ষা দেয়া হয় না। দর্শকদের আসন খালি হলেও এই প্রক্রিয়া অব্যহত থাকে। কিন্তু এই প্রতিপক্ষ লোকটি হয়তো এক জন ডাকাত; সে এক জন লোককে হত্যা করেছিল! তাতে কি? কারণ সে এক জন লোককে হত্যা করেছে, তাই তার পরিণতি এটাই। কিন্তু হে হতভাগ্য লোক তুমি কি করেছিলে, যার জন্য তোমাকে এটি দেখতে হচ্ছে?' তিবিরিয় ও মার্কাস অর্লিয়াসের মতো কেবল কিছু সংখ্যক সম্রাট ছিলেন, যারা এই রক্তাক্ত খেলাকে অপছন্দ করতেন। তবে মার্কাস অর্লিয়াসের অযোগ্য সন্তান কমোডাস নিজে এই খেলায় অংশগ্রহণ করে খুবই আনন্দ পেতেন।

যিহূদী রব্বিরা এই খেলার বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন কারণ এটি তাদেরকে মূর্তি পূজার সাথে সংশ্লিষ্ট করতো। এই প্রসঙ্গে রব্বি মেয়ার বলেছিলেন, 'মূর্তি পূজার কারণে অযিহূদীদের রঙ্গমঞ্চে যিহূদীদের যাওয়া নিষেধ।' 'মূর্তি পূজার' উপর একটি যিহূদী লেখায় বর্ণনা করা হয়েছে: 'এক জন লোককে অযিহূদীদের রঙ্গমঞ্চে যাওয়ার অনুমোদন রয়েছে, যদি তিনি সর্বসাধারণের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন। তবে তিনি যদি যিহূদী সম্প্রদায়ের কেউ হয়ে থাকেন, তাহলে তার সেখানে যাওয়া নিষেধ। কোন লোক যদি এমন স্টেডিয়ামে গিয়ে বসেন, তবে তিনি রক্ত ঝরানোর দায়ে অভিযুক্ত।' তবে রব্বি নাথান এই বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছেন কারণ একজন দর্শক হিসেবে, সে দয়ার জন্য চিৎকার করবে এবং এভাবে জীবন রক্ষা পাবে এবং সে সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হবে (এক জন স্ত্রীলোকের স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে) এবং তাতে সেই স্ত্রীলোকটি পুনরায় বিবাহ করতে সমর্থ হবে।

৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট নিরোর রাজত্বকালে রোমে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনা থেকে, খ্রীষ্টিয়ানদের গ্লাডিয়েটরের ভয়ানক খেলার জন্য শিকার হিসাবে সরবরাহ করতেন। ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস সম্রাট নিরোর নিষ্ঠুরতার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে: 'সব ধরণের উপহাসকে তাদের এই মৃত্যুর সাথে যোগ করা হয়েছিল। পশুর চামড়ায় ঢেকে তাদেরকে কুকুর দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে শেষ করে দেয়া হতো, অথবা তাদেকে ক্রুশবিদ্ধ করা হতো, আগুনের শিখায় পুড়িয়ে মারার দন্ডাজ্ঞা দেয়া হতো এবং দিনের আলো চলে গেলে, ঐ জ্বলন্ত দেহকে রাতের আধার দূর করতে ব্যবহার করা হতো।' পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরণের দুর্যোগ, যেমন– দুর্ভিক্ষ ও মহামারির জন্য বলির পাঁঠা হিসেবে খ্রীষ্টিয়ানদেরকে দোষীসাব্যস্ত করা হয়েছিল। খ্রীষ্টিয়ান লেখক টার্টুলিয়ানের

মতে, ঐ সময়ের চিৎকার ছিল 'খ্রীষ্টিয়ানদেরকে সিংহের মুখে দেও!'

অবশেষে যখন এক জন সন্যাসী বদ্ধভূমিতে লড়াইরত দুই জন যোদ্ধাকে ছাড়াতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন, তখন সম্রাট হনোরিয়াস ৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্লাডিয়েটরের এই খেলাকে বন্ধ করে দেন। কিন্তু হিংস্র প্রাণীদেরকে ব্যবহার করে ৬৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্লাডিয়েটরের এই রক্তাক্ত বিনোদনমূলক খেলা চলতে থাকে।

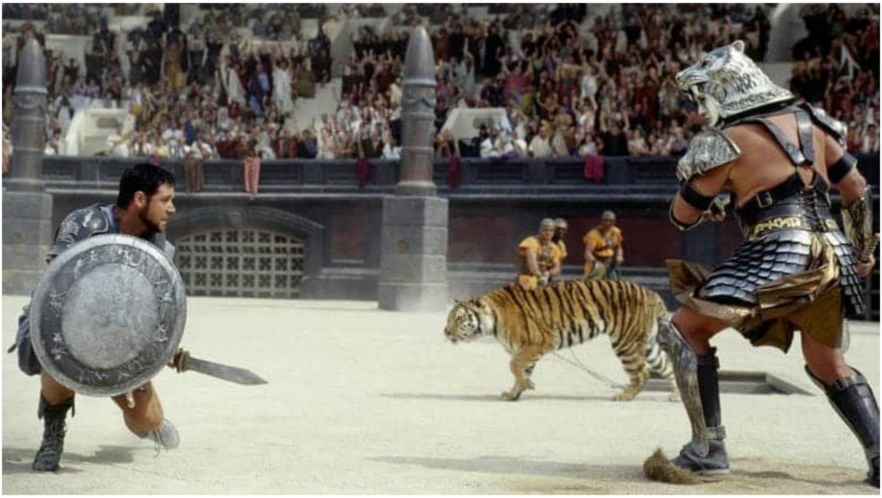

[বন্য প্রাণীদেরকে শিকার করে গ্লাডিয়েটরের খেলায় উপস্থাপনের জন্য রোমে পাঠিয়ে দেয়া হতো। ৩য় অথবা ৪র্থ খ্রীষ্টাব্দের সিসিলি থেকে পাওয়া পাথরের শিল্পকর্মে একটি বাঘিনীকে ধরার চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।]

রোমীয়দের ধর্ম

রোমীয়দের দেব-দেবতারা

রোমীয়দের ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল মৃত্তিকা বিষয়ক ধর্ম থেকে, এক রহস্যময় নৈর্ব্যক্তিক শক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটতো। সঠিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হতো। 'ধর্ম' কথাটি এসেছে একটি ল্যাটিন শব্দ থেকে, যার অর্থ 'বেঁধে ফেলা'। ধর্ম ছিল একটি চুক্তি– ল্যাটিন বাক্যাংশের মধ্য দিয়ে সংক্ষেপে প্রকাশ করলে যার অর্থ হয়, 'আমি দিই যেন তুমি দাও।'

পাপের উৎসর্গ এবং দেবতাদের প্রতিমূর্তির বৈশিষ্ট্যসূচক ভোজের আয়োজনের মত বেশ কিছু উপায়ে রোমীয়রা 'দেবতাদের শান্তি' সুনিশ্চিত করার বিষয়ে খুবই সতেচন

[কৃষি বিষয়ক দেবতা স্যাটার্নের সম্মানে ডিসেম্বরের মাঝ দিকে অনুষ্ঠিত হতো রোমীয়দের সবচেয়ে জনপ্রিয় উৎসব, 'স্যাটার্নালিয়া'। সর্বস্তরের রোমীয় জনগণ, এমনকি দাস/দাসীরাও এতে যোগ দিতো। বর্তমানে উদ্ধারকৃত এই ভাস্কর্যটি উৎসবের সেই পরিবর্জিত রূপটিকে তুলে ধরেছে।]

থাকতো। প্রতি বার খাবারের সময় খামার ও ভাঁড়ার ঘরের আত্মাদের উদ্দেশ্যে রোমীয় প্রত্যেক কৃষক উৎসর্গ করতো। রোমের সমাজতান্ত্রিক শাসনামলে, রোমীয়রা অনেক গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীকে গ্রহণ করে এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রীক দেব-দেবতাদেরকে নিজেদের স্থানীয় দেব-দেবতা হিসেবে চিহ্নিত করে।

উপরোল্লিখিত গ্রীক দেব-দেবতাদের মধ্যে জুপিটার (গ্রীক জেউস) ছিলেন 'সর্বোৎকৃষ্ট ও মহান'। এট্রাস্ক্যান আদর্শদের অনুকরণে ও সব দেব-দেবতাদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করতে তার মন্দিরটি রোমের ক্যাপিটোলিন পাহাড়ে নির্মাণ করা হয়। এটি বিশ্বাস করা হতো যে, বজ্র ও বিদ্যুতের মধ্য দিয়ে তিনি তার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেন। এটি ছিলো সেই জুপিটার দেবতার মন্দির, যেখানে 'বিজয়োৎসব' এর মধ্য দিয়ে এক জন বিজয়ী সেনাপতি অথবা সম্রাট যুদ্ধবন্দীদেরকে নিয়ে লুণ্ঠিত মালামাল সমেত আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রা সহকারে প্রবেশ করতেন।

[রোমীয় প্রধান দেবতা জুপিটার।]

জুনো (গ্রীক হেরা) স্ত্রীলোক ও বিয়ে বিষয়ক পৌরহিত্য করতেন। তার নির্ধারিত মাসটির দ্বিতীয় অর্ধাংশটিকে বিয়ের জন্য শুভ বলে মনে করা হতো। ক্যাপিটোলিন পাহাড়ে অবিস্থত মনেটা 'সতর্ককারিণী' নামে পরিচিত মন্দিরটিতে মুদ্রা তৈরি করা হতো এবং বর্তমানে প্রচলিত 'অর্থ' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে এখান থেকেই।

মার্স (এরেস) ছিলেন যুদ্ধ দেবতা এবং কেবল তিনিই ছিলেন গুরুত্বের দিক থেকে জুপিটারের কাছে দ্বিতীয়তম। সালি নামের তার পুরোহিত দলের সদস্যরা যুদ্ধের সাজ-পোশাকে সজ্জিত হয়ে মার্টিয়াস এলাকাতে অথবা 'মার্সের ময়দানে' যে মাসে নেচেছিলেন, ঐ মাসটিকে তার নামানুসারে মার্চ রাখা হয়েছিল।

[যুদ্ধ দেবতা মার্স (মঙ্গল)।]

ভেস্টা (গ্রীক হেস্টিয়া) ছিলেন রাজ্যের অগ্নিকুন্ড বিষয়ক দেবী এবং যার সাথে থাকতো উৎসর্গীকৃত ছয় জন

কুমারী– ত্রিশ বছর করে তারা প্রত্যেকে তার সেবা করতো। আর এই কুমারীদের কেউ যদি অসতী হতো, তবে তাকে জীবিত অবস্থায় সমাহিত করা হতো। এই কুমারীদেরকে তার মন্দিরে আগুনের একটি জ্বলন্ত শিখাকে সব সময় জ্বালিয়ে রাখতে হতো। তবে ৩৮২ খ্রীষ্টাব্দে এটিকে চূড়ান্তভাবে নিভিয়ে ফেলা হয়েছিল।

[মেষপাল, চোর ও বণিকদের রক্ষাকারী দেবতা মার্কারি।]

নেপচুন (গ্রীক পোসিডন) ছিলেন রোমীয়দের সমুদ্র দেবতা– তবে তিনি কেবল সমুদ্র দেবতাই ছিলেন না, তিনি নদীরও দেবতা ছিলেন। তার পুরোহিতরা পোন্টিফিসেস নামে পরিচিত ছিলেন, যার দ্বারা আক্ষরিক অর্থে 'সেতু নির্মাণকারী' বোঝাতো। আর এই পুরোহিতদের নেতা পন্টিফেক্স ম্যাক্সিমাস ছিলেন এক জন নির্বাচিত কর্মকর্তা, যিনি ধর্মীয় বর্ষপঞ্জী ও উৎসর্গগুলোকে তত্ত্বাবধান করতেন। এই উপাধিটি এখনো রয়ে গিয়েছে। এটি এখন রোমের ক্যাথলিক মণ্ডলীর 'প্রধান ধর্মযাজক' বা পোপের ক্ষেত্রে আরোপ করা হয়েছে।

ভাল ও মন্দের এক অদ্ভুত সমন্বয় হিসেবে মার্কারি (গ্রীক হার্মিস, অর্থাৎ গ্রীক দেবতাদের বার্তাবাহী দেবতা) ছিলেন বণিক ও চোর– উভয়েরই দেবতা। রোমের অ্যাভেন্টাইন পাহাড়ে তার মন্দির রয়েছে। ভেনাস (গ্রীক অ্যাফ্রোডাইটি, অর্থাৎ গ্রীকদের প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী) ছিলেন ভালবাসা ও সৌন্দর্যের দেবী। খ্রীষ্টপূর্ব ২১৭ সালের পিউনিক যুদ্ধের সময় পতিতাবৃত্তি পবিত্র হিসেবে প্রচলিত ছিল যে অঞ্চলে,

রোমীয়দের ধর্ম

সেই পশ্চিম সিসিলির এরিক্সের ফৈণীকীয় উপনিবেশ থেকে এই দেবীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি ধর্মমত নিয়ে আসা হয়। করিন্থে যদিও তার ধর্মগোষ্ঠীর প্রায় এক হাজার পতিতা এই পেশাকে অবলম্বন করে তাদের ব্যবসা চালাতো, কিন্তু রোমীয়রা এই চর্চাকে উৎসাহিত করে নি।

আমাদের বছরের অনেক মাসের নাম রোমীয় ধর্মের অনেক শব্দ থেকে এসেছে: জানুয়ারী নামটি এসেছে দুই মুখমন্ডলবিশিষ্ট দেবতা জানুসের নাম থেকে– তার মন্দিরের দরজা যুদ্ধচলাকালীন সময়ে খোলা থাকতো এবং শান্তির সময় বন্ধ থাকতো। তবে সচরাচর এটি খোলাই থাকতো! ফেব্রুয়ারী নামটি এসেছে ফেব্রুয়া তথা আচার-অনুষ্ঠান থেকে, যেগুলো লুপারকালিয়া অর্থাৎ আদিম উর্বরতা বিষয়ক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হতো। উৎসর্গীকৃত ছাগল বা কুকুরের চামড়া থেকে তৈরি ফালি বন্ধ্যা স্ত্রীলোকদেরকে সন্তান ধারণের উর্বরতা দিতে সক্ষম হতো বলে বিশ্বাস করা হতো। এপ্রিল হলো পৃথিবীর জন্য উন্মুক্ত হওয়ার মাস (ল্যাটিন এপেরিয়া)। মে নামটি এসেছে মায়ুস ‘বৃহত্তর’ শব্দ থেকে, যা জুপিটারের অপর একটি নাম। সম্রাট যুলিয় সিজার (কৈসর) ও আগস্তের নাম অনুসারে মাসের নাম যথাক্রমে জুলাই ও আগস্ট নাম রাখা হয়েছিল। রোমীয় বছর মূলত মার্চ মাস দিয়ে শুরু হতো বলে, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ছিল তাদের বছরের অষ্টম, নবম ও দশমতম মাস (ল্যাটিন ভাষায় তাদের অর্থ অনুযায়ী)।

দৈববাণী

ভবিষ্যৎ বিষয়ক ঘটনা নিয়ে দৈববাণী এবং অতীতে সংঘটিত ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা (যাকে ‘দৈববাণী’ বলা হয়) রোমীয়দের ধর্ম, রাজনীতি ও সামরিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতো।

রোমীয়রা অনাকাঙ্খিত ঘটনাকে দেবতাদের দেয়া শান্তি ভঙ্গের চিহ্ন বলে মনে করতো। অমঙ্গলসূচক দিক হিসেবে, তাদের কাছে লক্ষ্যণীয় বিস্ময়কর ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে ছিল অদ্ভুত কিছু বিষয়, যেমন– পাঁচ পায়ের অশ্বশাবক, আকাশ থেকে পড়তে থাকা গরম পাথরের টুকরা, অথবা ঢালে ঝরতে থাকা রক্ত, ইত্যাদি।

রোমীয়রা বিশেষত পাখির (অসপিসেস) মধ্য দিয়ে তুলে ধরা চিহ্নকে লক্ষ্য করার মাধ্যমে দেবতাদের ইচ্ছাকে জানার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থাকতো। আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে, তারা মন্দির এলাকা থেকে পাখিদের উড়ে চলা, তাদের সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখতো এবং আওয়াজ শুনতো। রোমীয়রা সৈন্যদের সামরিক প্রচারণা

চলাকালীন মোরগ-মুরগীদের খাবার খাওয়াকে পর্যবেক্ষণ করতো। তাই এই সময় যদি কোন সৈনিকের কিছু সংখ্যক পবিত্র মোরগ-মুরগী খাবার খাওয়া খেতে বিরত থাকতো, তবে নৌসেনাপতি অস্থির হয়ে উঠে এই মন্তব্য করে ওগুলোকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতো: 'যেহেতু তারা খাবার খাবে না, তাই তাদেরকে পানীয় দেয়া হোক!'– একটি জঘণ্য কাজ যা তাকে যুদ্ধের জন্য মূল্য দিতে হয়েছে বলে বলা হত।

[মন্দকে দূরে সরিয়ে রাখতে যাদুর প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত হাতের নমুনা।]

আর এই সময়ে ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক কিছু কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেবতাদের ইচ্ছা আবিস্কার করা ছাড়া অন্য যে কোন সামরিক প্রচারণা অথবা দাপ্তরিক কর্মকান্ড পরিচালনা নিষিদ্ধ ছিল। কোন চিহ্নকে উপেক্ষা করা, অথবা দুর্যোগের বিষয়ে জ্যোতিষীদের কোন ভবিষ্যদ্বাণীর অবজ্ঞা রোমীয়দের জীবনে মারাত্মক বিপর্যয় বয়ে নিয়ে আসতো বলে তারা মনে করতো। উদাহরণ হিসেবে যুলিয় সিজারের (কৈসর) কথা ধরা যাক– যাকে স্বপ্ন ও অন্যান্য লক্ষণের দ্বারা আগেই তার গোপন হত্যার বিষয়ে সাবধান করে দেয়া সত্ত্বেও তিনি তা উপেক্ষা করেছিলেন।

রোমীয়দের এট্রাস্ক্যান পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে তারা বিভিন্ন ধরণের বজ্র ও বিদ্যুতকে ব্যাখ্যা করা শিক্ষা লাভ করেছিল। উৎসর্গীকৃত প্রাণীর নাড়িভুড়ি পরীক্ষা করার মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করার পদ্ধতিও তারা তাদের এট্রাস্ক্যান পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শিখেছিল। আর সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন শাখায় এক এক জন করে ভবিষ্যদ্বক্তা থাকতো।

ভবিষ্যদ্বাণীর এই ধরণের চর্চা সাম্রাজ্যের শাসন আমলের শেষ পর্যন্ত চলেছিল। অযিহূদী ভবিষ্যদ্বক্তাদের উৎসর্গ করার প্রক্রিয়া খ্রীষ্টিয়ানদের ক্রুশের চিহ্নের দ্বারা প্রতিহত হয়েছিল বলে ২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ডায়োক্লিশান এবং সিজার (কৈসর) গ্যালিয়েনাস রেগে গিয়েছিলেন এবং যার ফলশ্রুতি হিসাবে, খ্রীষ্টিয়ানদের উপর নির্মম নির্যাতন চালানো হয়। এমনকি সম্রাট কনস্টানটাইন ৩১৮-৩২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে, কালো যাদু চর্চাকে নিষিদ্ধ করেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট গণক বা

ভবিষ্যদ্বক্তাদেরকে কোন ব্যক্তির বাসা-বাড়িতে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন এবং পরিবর্তে কোন সরকারী ভবনের উপর বজ্রপাত ঘটলে কি বোঝায়, তা খুঁজে বের করতে ভবিষ্যদ্বাণী চর্চার অনুমোদন দেন।

সম্রাটের উপাসনা

সুদীর্ঘ সময় ধরে প্রাচীন মিশরের ফরৌণদেরকে ঐশ্বরিক বলে বিবেচনা করা হতো। মহান গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার চাইতেন যেন লোকেরা তার সামনে নতজানু হয় এবং তার উত্তরসূরী হিসেবে টলেমী মিশরে নিজেকে স্বর্গীয় রাজা হিসেবে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে এক ধর্মমতের প্রচলন করতে থাকেন। খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীর প্রাথমিক অবস্থায় প্রাচ্যের রোমীয় সেনাপতিদেরকে গ্রীক শহরগুলোর লোকেরা ঐশ্বরিক সম্মান দিয়েছিল। সম্রাট যুলিয় সিজারকে (কৈসর) গোপনে হত্যার দুই বছর পরে খ্রীষ্টপূর্ব ৪২ সালে উচ্চতম রাষ্ট্রীয় পরিষদে তাকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করা হয়, এবং তাদের এই কর্মকান্ডই সম্রাটদের উপাসনা বিষয়ক ধর্মমতের ভিত্তি হয়ে ওঠে।

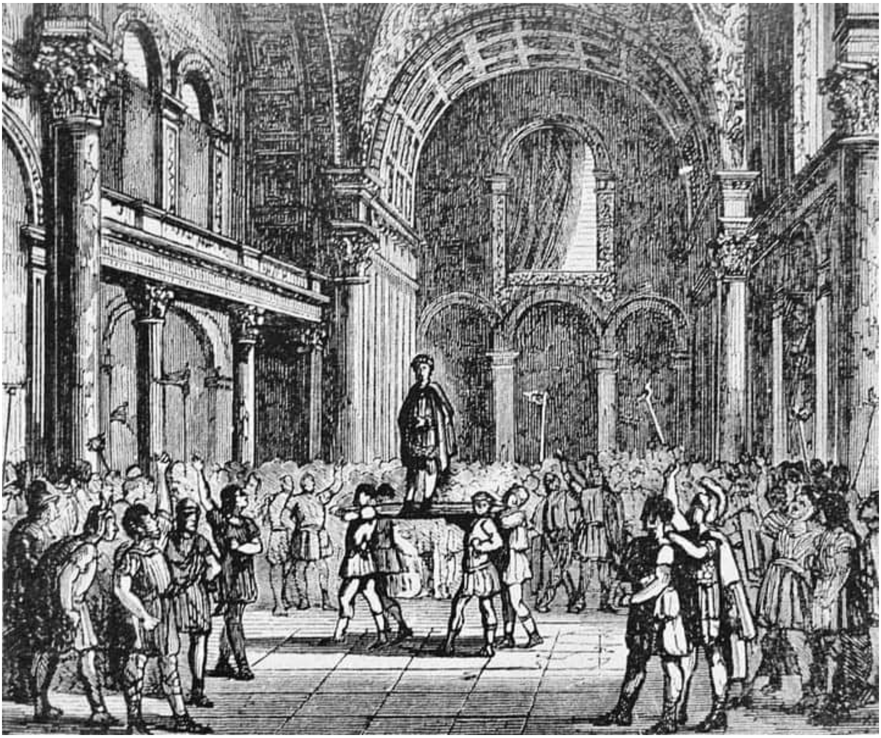

[রোমীয় সম্রাট যারা নিজেদের জন্য ঐশ্বরিক সম্মান দাবী করতেন– সেই রকম একটি চিত্র।]

রোমীয়দের ধর্ম

যদিও সম্রাট আগস্ত প্রাচ্যের ঐশ্বরিক সম্মানকে গ্রহণ করেন, তিনি এই ধরণের সম্মান প্রদর্শন করতে পাশ্চাত্যে অনুৎসাহিত করেন। গণ ও ব্যক্তিগত ভোজের আয়োজনে, তার ব্যক্তিগত মঙ্গলসাধক দেবদূতের উদ্দেশ্যে পানীয় ঢালা হতো। মহান রাজা হেরোদ সম্রাট আগস্তের জন্য কৈসরিয়া ও সেবাস্তে মন্দির নির্মাণ করেন। রোমীয় কবি ভার্জিল ও হোরেস সম্রাট আগস্তকে অধিক সম্মান সহকারে প্রশংসা করেন। কিন্তু যখন খ্রীষ্টপূর্ব ২৫ সালে আগ্রিপ্প রোমে সম্রাট আগস্তের জন্য মন্দির নির্মাণ করেন, তখন তিনি সেটিকে নিজের মন্দির হিসেবে উৎসর্গ করার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। তার মৃত্যুর পরে, উচ্চতম রাষ্ট্রীয় পরিষদ তাকে কেবল এক জন দেবতার মর্যাদায় উন্নীত করেন।

সম্রাট তিবিরিয় তার মা সম্রাজ্ঞী লিভিয়াকে দেবীত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করতে নিষেধ করেন। এক জন দুষ্ট সম্রাট হিসেবে, তিনি উচ্চতম রাষ্ট্রীয় পরিষদের কাছ থেকে এই সম্মান লাভে বঞ্চিত ছিলেন। আর উম্মত্ত সম্রাট গাইয়াস কালিগুলা কেবল নিজের জন্য স্বর্গীয় সম্মানই দাবী করেন নি; বরং, মৃত্যুর পরে তিনি তার বোন দ্রুষিলাকে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করারও আদেশ দেন। তার মৃত্যুর পর তার স্মৃতিকে কলঙ্কিত করার মাধ্যমে উচ্চতম রাষ্ট্রীয় পরিষদ তার কর্মকান্ডের প্রতিশোধ নিয়েছিল।

সম্রাট ক্লৌদিয় ঐশ্বরিক সম্মান গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। যদিও তিনি তার রাজত্বকালে রাজনৈতিক আনুগত্যের চিহ্ন হিসেবে ব্রিটেনের সদ্য অধিকৃত একটি প্রদেশে তাকে উৎসর্গীকৃত একটি মন্দির গ্রহণ করেন। কিন্তু অহঙ্কারী সম্রাট নিরো নিজের মুখমন্ডল সম্বলিত বিশাল একটি মূর্তি তৈরি করে, সেটিকে সূর্য-দেবতা বা এপোলো হেলিয়োস হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তিনি রোমে দেবতা নিরো হিসেবে তার মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করেন। যাহোক, প্রত্যাশিত বিষয়ে তিনি মন্তব্য করে বলেন যে, ‘সবচেয়ে বিশিষ্ট জনেরা দেবতার সম্মান গ্রহণ করতে পারেন না ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব শেষ না হয়।’ কিন্তু তার মৃত্যুর পরে, উচ্চতম রাষ্ট্রীয় পরিষদ তাকে এই সম্মান দিতে অস্বীকার করে।

ভ্যাসপাসিয়ান, যাকে এক জন ভাল সম্রাট বলে বিবেচনা করা হতো– তিনি যখন মারা যাচ্ছিলেন, তখন রসিকতা করে বলেছিলেন, ‘প্রিয় আমি! আমি অবশ্যই এক জন দেবতা হয়ে উঠবো!’ তার খুবই জনপ্রিয় ছেলে তীতের রাজত্বকাল অসুস্থতার কারণে খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল– মৃত্যুর পরে তার ভাই সম্রাট ডমিশিয়ান একটি ধর্মমত উপস্থাপন করেন। আর ডমিশিয়ান দাবী করেন যেন লোকেরা তাকে ‘প্রভু ও ঈশ্বর’

বলে সম্বোধন করে এবং ঐ সব যিহূদী ও খ্রীষ্টিয়ানদের উপর নির্যাতন চালাতেন, যারা তাকে ঈশ্বর হিসেবে সম্মান করতে অস্বীকার করতো। সার্বজনীনভাবে সম্রাট ডমিশিয়ানকে সবাই ভয় পেতো ও অপছন্দ করতো। তার মৃত্যুর পরে তাকে সবাই দোষী সাব্যস্ত করে।

খ্রীষ্টিয়ানরা সম্রাটদের জন্য পুরোপুরিভাবে প্রার্থনা করতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং রোমীয় কর্মকর্তাদেরকে মান্য করতেন। তীমথিয়ের কাছে লেখা চিঠিতে প্রেরিত পৌল তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি, 'সবার জন্য ঈশ্বরের কাছে মিনতি, প্রার্থনা, অনুরোধ ও ধন্যবাদ জানান এবং রাজাদের ও যাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে, তাদের জন্য প্রার্থনা করেন (১ তীমথিয় ২:১-৩)।' তিনি রোমের খ্রীষ্টিয়ানদেরকেও লিখেছিলেন যেন, 'তারা প্রত্যেকে দেশের শাসনকর্তাদেরকে মেনে চলেন, কারণ ঈশ্বর যাকে শাসনকর্তা করেন, তিনি ছাড়া আর কেউই শাসনকর্তা হতে পারেন না। ঈশ্বরই শাসনকর্তাদেরকে নিযুক্ত করেছেন (রোমীয় ১৩:১)।' তবে খ্রীষ্টিয়ানরা রোমীয় সম্রাটদের প্রতিমূর্তি বা দেবতাদের মূর্তির কাছে উৎসর্গ করতে রাজী ছিল না। যিহূদীরাও তাদের মত একই অভিমত পোষণ করতো। তবে জাতীয় 'স্বীকৃত ধর্ম' হিসেবে তাদেরকে এই সব বিষয়গুলোকে সহ্য করতে হতো। বিভিন্ন জাতি থেকে আসা লোকদের সমন্বয়ে খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায় গঠিত হওয়াতে, তাদেরকে অসাধু লোকদেরকে নিয়ে তৈরি এক গোপন সমাজ বলে সন্দেহ করা হতো। আর যখন তারা উৎসর্গ করতে অস্বীকার করেছিল, তখন দেশদ্রোহী হিসাবে তাদেরকে অত্যাচার করা হয়েছিল।

সম্রাটদের প্রবর্তিত ধর্মমতে ধর্মের চেয়ে রাজনৈতিক গুরুত্বই বেশি প্রাধান্য পেতো। দেবত্ব আরোপকারী সম্রাটদেরকে উদ্দেশ্য করে প্রার্থনার কোন প্রমাণাদিই ছিল না। রোমের প্রতি আনুগত্য রক্ষার জন্য দাপ্তরিক রাজকীয় ধর্মমতটিকে পৌর প্রশাসকেরা পুরো সাম্রাজ্যের সব প্রদেশগুলোতে সুবিন্যস্ত করতেন। রোমীয়দের ধর্মটি ছিল সর্বপরি রাষ্ট্রীয় একটি ধর্মমত। জনৈক ঐতিহাসিক তার মন্তব্যে বলেছিলেন, 'রোমীয় দেবতাদের উপাসনা ছিল একটি নাগরিক কর্তব্য এবং বৈদেশিক দেবতাদের উপাসনা ছিল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ।' রোম সমাজতন্ত্রের পরবর্তী বছরগুলোতে এবং সাম্রাজ্যের শাসন আমলের সময়, অনেক রোমীয়রা নিকটপ্রাচ্য বা মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা তথাকথিত 'প্রাচ্যের রহস্যময় ধর্মগুলোর' দিকে ক্রমান্বয়ে ঝুঁকে পড়ে।

যিহূদী ও খ্রীষ্টিয়ান

রোমীয় ঐতিহাসিক সুয়েটোনিয়াসের মতে, বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হত বলে সম্রাট

রোমীয়দের ধর্ম

ক্লৌদিয় (৪১-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) ‘ক্রেস্তাসের প্ররোচনায়’ যিহূদীদেরকে রোম থেকে বিতাড়িত করেন। ক্রেস্তাস ছিল সম্ভবত: যীশু খ্রীষ্টের অন্য একটি নাম। আক্বিলা ও প্রিষ্কিলার মত যিহূদী খ্রীষ্টিয়ান শিক্ষকরা হয়তো এই আলোড়ন তুলেছিলেন (প্রেরিত ১৮:১-২)। ৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাদেরকে রোম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং এর দুই বছর পরে করিন্থে তাদের সাথে প্রেরিত পৌলের দেখা হয়। এই প্রসঙ্গে লেখক দিও ক্যাসিয়াস তার বর্ণনায় তুলে ধরেছিলেন যে, সম্রাট ক্লৌদিয় যিহূদীদেরকে কেবল তাদের সভা করা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিলেও, তার আদেশের পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটিয়ে সম্ভবত সব যিহূদীদেরকে বিতাড়ন করা হয় নি। রোমীয়দের কাছে প্রেরিত পৌলের লেখা চিঠিতে যিহূদী ও খ্রীষ্টিয়ানদের মাঝে সংঘটিত সংঘর্ষের কোন প্রমাণও নেই।

প্রেরিত পৌলের চিঠি অবশ্যই নির্দেশ করে যে, ৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগে রোম শহরে খ্রীষ্টানদের লক্ষ্যণীয় দল ছিল এবং তার চিঠিতে পারিবারিক মণ্ডলীর নাম উল্লেখিত হয়েছে। ঐতিহ্যের দিক থেকে পিতর ও প্রেরিত পৌল উভয়েই এই একই শহরে সাক্ষ্যমর হয়েছিলেন– যদিও এর কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ নেই।

[উত্তম মেষপালক হিসাবে প্রভু যীশু, মোজাইকৃত, ৫ম শতাব্দীর গালা প্লাসিডিয়া সমাধি, রাভেনা, ইতালি]

রোমীয়দের ধর্ম

সম্রাট নিরোর স্ত্রী পপ্পায়া সম্ভবত যিহূদী ধর্মে ধর্মান্তরিত এক জন মহিয়সী নারী ছিলেন এবং তাই তিনি নিশ্চিতভাবে যিহূদীদের প্রতি স্নেহপরায়ণ ছিলেন। যখন ইতিহাসবিদ জোসিফাস ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রোমে এসেছিলেন, তখন সম্রাট নিরোর একজন প্রিয় যিহূদী অভিনেতার দ্বারা তাকে পপ্পায়ার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। ৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট নিরোর রাজত্বকালেই যিহূদিয়ায় অর্থাৎ বর্তমান ইস্রায়েল দেশে যিহূদীদের ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। গ্রীসে থাকাকালীন সময়ে তিনি করিন্থীয় যোজক পাড়ি দেয়ার জন্য একটি পরিকল্পিত খাল নিয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি যিহূদী বন্দীদেরকে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করেন। এই সব শ্রমিককে সেনাপতি ভ্যাসপেসিয়ান তার কাছে পাঠিয়েছিলেন।

যিহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হলে, হাজার হাজার যিহূদী বন্দীকে রোমে নিয়ে আসা হয় যেন তারা তীতের বিজয় শোভাযাত্রায় এবং গ্লাডিয়েটরের খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে। আর এই সময় তীতের সাথে ছিলেন উপপত্নী হেরোদীয় রাজকন্যা বর্ণীকী। ফ্লাভিয়ান সম্রাটদের অধীনে থাকার ফলে, ইতিহাসবিদ জোসিফাসকে রোমীয় নাগরিক হওয়ার সুযোগ ও ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় এবং তার নতুন রোমীয় নাম রাখা হয় ফ্লাভিয়াস।

সম্রাট ডমিশিয়ান যিহূদী ও খ্রীষ্টিয়ান– এই উভয় ধর্মের লোকদেরকে নির্যাতন করেন। আর যাদেরকে তিনি মৃত্যুদন্ড দেন, তাদের মধ্যে তার নিজের কাকাতো ভাই ফ্লাভিয়াস ক্লেমেন্স ছিলেন। তার বিরুদ্ধে 'নিরীশ্বরবাদের' এবং 'যিহূদী রীতিনীতির' সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ উঠেছিল। ক্লেমেন্সের স্ত্রী ডমিটিল্লাকে নির্বাসন দেয়া

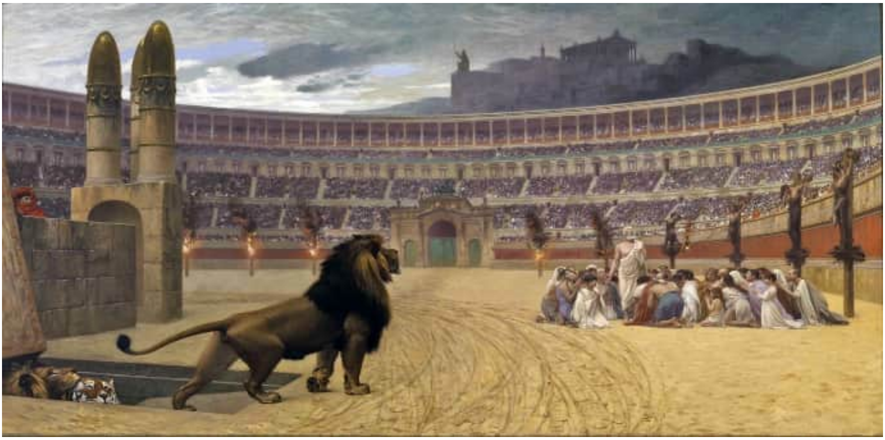

[যেসব খ্রীষ্টিয়ানরা সম্রাটদের ঐশ্বরিক সম্মান দিতে অস্বীকর করেছিলেন, তাদের যে নির্যাতন করা হতো, সিংহের মুখে ফেলে দেওয়া হতো– সেই নির্যাতনে একটি দৃশ্য।]

হয়, যাকে মণ্ডলী বিষয়ক ইতিহাসবিদ ইউসিবিয়াস খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে দাবী করেন।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা মূলত রোমের যিহূদীদের বিষয়ে প্রমাণ পেয়েছেন তাদের ভূগর্ভস্থ সমাধিক্ষেত্রে। যেসব যিহূদীরা যিহূদা ও আশে পাশের অঞ্চলে চুনাপাথরে খোদাই করে সমাধি প্রকোষ্ঠ তৈরির কাজে অভ্যস্ত ছিল, পাথর ব্যবহারে তারা তাদের এই ঐতিহ্যকে পরিবর্তন করে রোমের অপেক্ষাকৃত কোমল আগ্নেয় পাথর ব্যবহার শুরু করে। তারই নিদর্শন হিসেবে এখনো তিনটি বিশাল ভূগর্ভস্থ যিহূদী সমাধিক্ষেত্র টিকে রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরানোটি রয়েছে মন্টিভার্ডিতে– এটি সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীরও আগে ব্যবহার করা হয়েছিল। এগুলো রয়েছে খ্রীষ্টিয় ১ম থেকে ৩য় শতাব্দী পর্যন্ত ব্যবহৃত ভিয়া আপ্পিয়া ও ভিয়া নোমেনটানা নামের রোমীয় সড়কের পাশে।

বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, আবিস্কৃত ভূগর্ভস্থ সমাধিক্ষেত্রের সমাধির স্তম্ভলিপিগুলো ৭৬% গ্রীক, ২৩% ল্যাটিন এবং বাকী ১% হিব্রু অথবা অরামিক ভাষায় লেখা। এর দ্বারা তুলে ধরা হয়েছে যে, রোমীয় যিহূদীদের অধিকাংশই গরিব ছিল, কেবল কিছু সংখ্যক যিহূদী ছিল যারা ধনী। সমাধির এই স্তম্ভলিপিগুলোর দ্বারা আরও উন্মোচিত হয় যে, রোমের ১১টি যিহূদী সমাজ-ঘরের ৭টিই ছিল মূল শহরের বাইরে টাইবার নদীর ওপারে সচরাচর দেখা যায় এমন অবহেলিত ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায়।

১৯৬১ সালে টাইবার নদীর মোহনাতে অবস্থিত বন্দর নগরী অস্ট্রিয়ায় একটি সমাজ-ঘর আবিস্কৃত হয়। ভবনটি কিছু অংশের কাজ ১ম খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে শুরু হয়। পম্পেতে পাওয়া দেওয়ালের একটি ছবি প্রকাশ করে যে, ৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ধ্বংসের আগেও যিহূদীরা সেখানে বসবাস করতো। এক জন যিহূদী অথবা সম্ভাব্য খ্রীষ্টিয়ান দেওয়ালের উপর লিখে শহরটির অবক্ষয়সূচক অনৈতিকতার বর্ণনা দিয়েছিলেন এই বলে, 'সদোম ও ঘমোরা'।

যিহূদীদেরকে অবজ্ঞাসূচক উপকরণ হিসেবে রোমীয়দের ব্যঙ্গাত্মক সাহিত্যে উপস্থাপন বিশেষ লক্ষ্যণীয় একটি দিক। কবি হোরেস ধর্মান্তরিতদের জন্য যিহূদীদের অনুসন্ধান ও ঈশ্বরের অলৌকিক কাজে তাদের বিশ্বাসকে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। লেখক সেনেকা ও জুভেনাল বিশ্রামবারে তাদের অলসতার জন্য আপত্তি জানান। যিহূদীদের শূকরের মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকার বিষয়টি নিয়ে পেট্রোনিয়াস হতবাক হন। ইতিহাসবিদ ট্যাসিটাস যিহূদীদের খাবার খাওয়া নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দের বিষয়ে তীব্র বিদ্রুপাত্মক যিহূদী বিরোধী ব্যাখ্যার পুনরাবৃত্তি করেন।

রোমীয়দের ধর্ম

[রোমীয়দের ধর্ম ছিল কাল্ট-ভিত্তিক ধর্ম-বিশ্বাস। তাদের ধর্ম একজন দেবতা, দেবী বা সম্রাটের উপাসনার সাথে জড়িত ছিল। যার মধ্যে থাকত নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান এবং তা পালন করার মধ্য দিয়ে দেবতাদের অনুগ্রহ অর্জনের জন্য চেষ্টা করতো।]

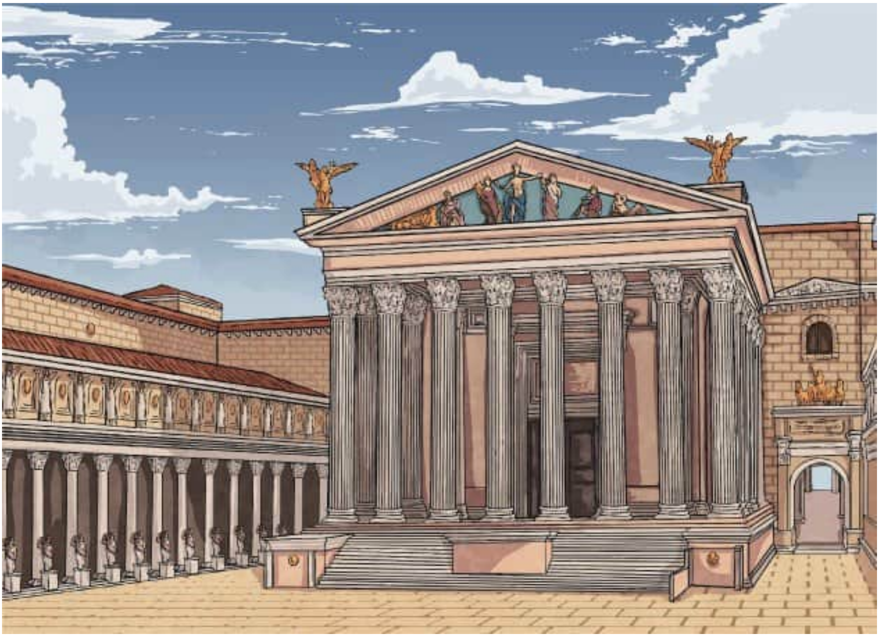

[শিল্পীর তুলির আঁচরে মার্স উল্টারের মন্দির]

খ্রীষ্টধর্মের প্রাথমিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত-সার

খ্রীষ্টধর্ম এবং খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর ইতিহাস, যীশু এবং তাঁর বারো জন প্রেরিত এবং সত্তর জন শিষ্য থেকে শুরু করে এর সমসাময়িক সময় পর্যন্ত ঘটনাবলী খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসের মধ্যে লেখা হয়েছে। খ্রীষ্টধর্ম হল একেশ্বরবাদী একটি ধর্ম যা যীশু খ্রীষ্টের আত্মপ্রকাশের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অনেক খ্রীষ্টান সম্প্রদায় "চার্চ বা মণ্ডলী" বলতে মূলত ধর্মতাত্ত্বিকভাবে মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য যীশু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে মনে করে থাকে। কখনও কখনও চার্চ বা মণ্ডলী বলতে তা সার্বজনীন মণ্ডলীকে বুঝিয়ে থাকে। তবে সময়ের সাথে সাথে স্থানীয় মণ্ডলী সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে যা সাধারণত একদল বিশ্বাসী এবং যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর জোর দিয়ে থাকে, এবং সমস্ত স্থানীয় মণ্ডলীগুলো মিলে সার্বজনীন চার্চ বা মণ্ডলীর প্রকাশ ঘটেছে।

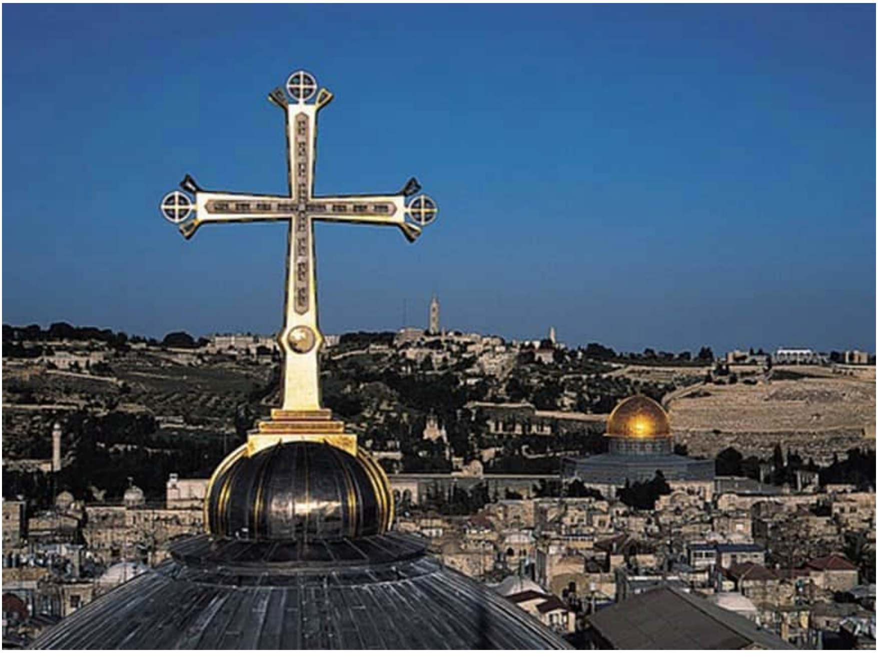

[যিরূশালেমের গল্‌গথা যেখানে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, সেখানে স্থাপিত চার্চ।]

খ্রীষ্টধর্মের প্রাথমিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত-সার

খ্রীষ্টধর্ম প্রথম শতাব্দীতে শুরু হয় বটে, কিন্তু যিহূদীদের একটি সম্প্রদায় হিসাবে যিরূশালেম এর যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু এর পর থেকে দ্রুত রোমান সাম্রাজ্য জুড়ে এবং এর বাইরে ইথিওপিয়া, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, আসিরিয়া, ইরান, ভারত এবং চীনের মতো দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাসের কারণে এর অনুসারীরা মূলত সেই প্রথম থেকেই নির্যাতিত হয়েছিল, কিন্তু এটি শেষ পর্যন্ত ৩৮০ সালে রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হয়। অন্বেষণের যুগে (Age of Exploration), খ্রীষ্টধর্ম সারা বিশ্বে প্রসারিত হয়, ও তা বিশ্বের বৃহত্তম ধর্ম হয়ে ওঠে, এবং আজও এটি সারা বিশ্বে বৃহত্তম ধর্ম হয়ে আছে।

খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস জুড়ে, এই ধর্ম-বিশ্বাসটি নানারকম বিভেদ এবং ধর্মতাত্ত্বিক বিরোধের মোকাবিলা করেছে, যার ফলে অনেক স্বতন্ত্র চার্চ ও চার্চ-কমিউনিটির সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে দুটি বৃহত্তম চার্চ হল রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চ, কিন্তু অন্যান্য বিভিন্ন ইর্স্টান চার্চ (যেমন ওরিয়েন্টাল অর্থোডক্স), প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ (যেমন লুথারের ধর্মতত্ত্ব) এবং অন্যান্যরা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশের প্রতিনিধিত্ব করে।

একবিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টধর্ম অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে ক্যাথলিক মণ্ডলী এবং ইস্টার্ন অর্থোডক্স খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর মধ্যে, ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্ব এবং প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মতত্ত্বের মধ্যে এবং সমস্ত প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সমন্বয়ের জন্য উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

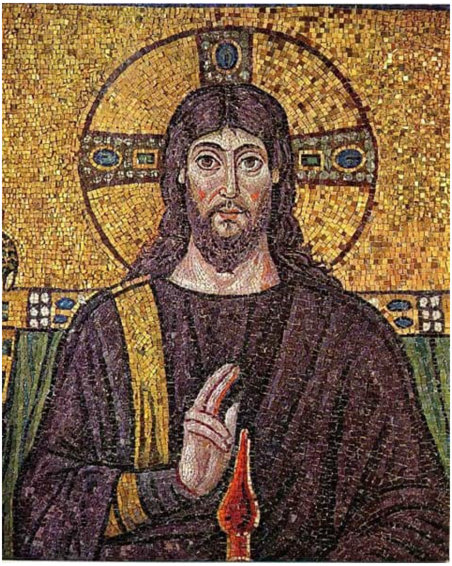

[যীশু খ্রীষ্টের প্রতিকৃতি যা শিল্পীর তুলিতে আঁকা হয়েছে।]

যীশু খ্রীষ্টের জীবন (৪ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ৩৩ খ্রীষ্টাব্দ)

যদিও যীশুর জীবন নিয়ে অনেক একাডেমিক বিতর্কের বিষয় রয়েছে, তবুও পণ্ডিতরা সাধারণত নিম্নলিখিত মৌলিক কিছু বিষয়ে একমত: যীশু খ্রীষ্টপূর্ব ৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং গালীলের নাসরতে বেড়ে উঠেন। তাঁর

পরিচর্যা কাজে শিষ্যদের নিয়োগ করা হয়, যাঁরা তাঁকে ইস্রায়েলের প্রতিজ্ঞাত মশীহ, অলৌকিক কাজের কর্মী, মন্দ আত্মা তাড়ানোর এবং সুস্থতাকারী হিসেবে বিবেচনা করতেন। যিহূদা প্রদেশের রোমান গভর্নর পন্তীয় পিলাতের আদেশে ৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যিরূশালেমে ক্রুশবিদ্ধ করে তাঁকে মতৃ্যদণ্ড দেওয়া হয়; এবং ক্রুশবিদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করার পর যীশুকে কবরে সমাহিত করা হয়। কেউ কেউ শূন্য সমাধির কাহিনীর ঐতিহাসিকতা এবং যীশুর পুনরুত্থানের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। সেই সময়ে যীশুর পুনরুত্থান খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের ভিত্তি ও প্রেরণা তৈরি করেছিল। বাইবেলে দাবি করা হয়েছে যে, পুনরুত্থানের পর খ্রীষ্ট গালীল ও যিরূশালেমে শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন এবং স্বর্গে আরোহণের আগে ৪০ দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে ছিলেন ও শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন।

যীশুর জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে তথ্যের প্রধান উৎস হল চারটি ক্যানোনিকেল সুসমাচার এবং পৌলের লেখায়ও যীশু সম্পর্কে অনেক তথ্য রয়েছে। এছাড়া, তাঁর একেবারে কাছের কিছু প্রেরিত, যেমন– পিতর, যোহন, যাকোব ও যিহূদার চিঠিপত্র থেকে তাঁর সম্পর্কীত নানা শিক্ষা ও তথ্য পাওয়া যায়।

প্রারম্ভিক খ্রীষ্টধর্ম (৩৩ - ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ)

প্রারম্ভিক খ্রীষ্টধর্ম সেই সময়কে বোঝায় যখন ধর্ম গ্রীক ও রোমীয় জগতে এবং তার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এটি প্রথম শতাব্দীর যিহূদীদের একটি সম্প্রদায় হিসাবে শুরু হয়েছিল। প্রথম খ্রীষ্টিয় যুগ আসলে প্রথম শতাব্দী থেকে শুরু করে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের নির্যাতনের সমাপ্তি পর্যন্ত, এবং ৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে মহান কনস্টানটাইনের সিংহাসনের আরোহণের পর থেকে ৩২৫ সালে নাইসিয়ার প্রথম কাউন্সিল পর্যন্ত ধরা হয়ে থাকে। এই যুগ দুটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে বিভক্ত হতে পারে: প্রথমত, প্রৈরিতিক সময়কাল, যখন প্রথম প্রেরিতরা জীবিত ছিলেন এবং তখন তাঁরা মণ্ডলীকে সংগঠিত করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, প্রেরিতদের পরবর্তী সময়কাল, যখন একটি প্রাথমিক বিশপ-সম্বন্ধীয় কাঠামো বিকশিত হয়েছিল। এই সময় বিশপগণ একজন বিশপের (অধ্যক্ষদের) মাধ্যমে পরিচালিত হত।

প্রৈরিতিক মণ্ডলী

প্রৈরিতিক চার্চ বা আদিম চার্চ ছিল যীশুর প্রেরিত এবং তাঁর আত্মীয়দের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি কমিউনিটি বা জন-সমাজ। খ্রীষ্টের মহান আদেশ অনুসারে, পুনরুত্থিত যীশু প্রেরিতদের আদেশ দিয়েছিলেন যেন তাঁরা তাঁর শিক্ষাগুলো সমস্ত জগতে ছড়িয়ে দেন। যীশুর এই আদেশটিকেই এই কালের মণ্ডলী 'মহান আদেশ বা

গ্রেট কমিশন' বলে বিশ্বাস করে (মথি ২৮:১৯-২০)। এই সময়ের জন্য তথ্যের প্রধান উৎস হল প্রেরিতদের কাজ, যা যীশুর মহান আদেশ (প্রেরিত ১:৩-১১)। পঞ্চাশত্তমীর (প্রেরিত ২) ঘটনা খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর একটি প্রারম্ভিক ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয় এবং যিরূশালেম চার্চ স্থাপন থেকে শুরু করে (প্রেরিত ১০) এবং পৌলের ধর্মান্তরণ (প্রেরিত ৯) এবং শেষ পর্যন্ত পৌলের কারাবাসের মধ্য দিয়ে (গৃহবন্দী: প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁকে রোমে নিয়ে যাওয়া হয়, প্রেরিত ২৮:৩০-৩১) পরজাতীয়দের মধ্যে প্রধানত খ্রীষ্টের ধর্মের বিস্তার শুরু হয়।

প্রথম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা মূলত জাতিগতভাবে যিহূদী বা যিহূদী থেকে ধর্মান্তরিত ছিলেন। যীশু যিহূদী লোকদের কাছে প্রচার করেছিলেন এবং যিহূদীদের মধ্য থেকে তাঁর প্রথম শিষ্যদের বেছে নিয়েছিলেন, যদিও 'সত্তর জন শিষ্য' নামে নিযুক্ত সুসমাচার প্রচারকারীদের প্রথম দলটির সবাই যিহূদী ছিলেন কি না তা জানা যায় নি। পরজাতীয় থেকে (অ-যিহূদী) ধর্মান্তরিতদের সম্বন্ধে প্রাথমিক অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। কেউ কেউ যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হওয়ার আগে তাদের "যিহূদী" হতে হবে (সাধারণত ত্বক্‌ছেদ এবং খাদ্যাভ্যাস আইন মেনে চলার কথা উল্লেখ করে)। পিতরের মধ্য দিয়ে শতপতি কর্ণেলিয়াসের ধর্মান্তরণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছিল যে, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হবার জন্য কোন অযিহূদীকে "যিহূদী" হবার প্রয়োজন ছিল না। বিষয়টি যিরূশালেম কাউন্সিলে আরও আলোচনা করা হয়েছিল।

প্রেরিতরা যা শিক্ষা দিচ্ছিলেন তাতে কিছু যিহূদী ধর্মের কর্তৃপক্ষের সাথে প্রাথমিক খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর একটি দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এর ফলে শেষ পর্যন্ত স্তিফান ও যাকোবকে সাক্ষ্যমর হতে হয় এবং তাদেরকে সিনাগগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এইভাবে, খ্রীষ্টধর্ম রাব্বিদের যিহূদী ধর্ম থেকে একটি পৃথক পরিচয় অর্জন করতে শুরু করে। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের "খ্রীষ্টিয়ান" (গ্রীক ভাষায় Χριστιανός) নামটি প্রথম আন্তিয়খিয়তে শিষ্যদের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছিল, যা প্রেরিত ১১:২৬-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

যীশু খ্রীষ্টের উপাসনা করা

যারা যিহূদী ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টিয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করছিল তাদের বিশ্বাসের উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে সুসমাচার এবং নতুন নিয়মের চিঠিগুলো। নতুন নিয়মের মধ্যে খুব প্রাচীন বিবরণগুলো রয়েছে– যেমন প্রথম দিকের খ্রীষ্টিয় ধর্ম-বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি, প্রশংসা-গীত, সেইসাথে ক্রুশারোপণের বিবরণ, শূন্য সমাধি এবং যীশুর পুনরুত্থানের বিবরণ, ইত্যাদি। যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার এক দশকের মধ্যেই এই

খ্রীষ্টধর্মের প্রাথমিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত-সার

সমস্ত বিবরণগুলো যিরূশালেম খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। প্রথম দিকের খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি ও স্তোত্রগুলো পৌলের চিঠির মধ্যে বিশেষ করে ১ করিন্থীয় ১৫:৩-৪ পদে সংরক্ষিত হয়েছে যা পুনরুত্থিত যীশুর প্রতি তাঁর বিশ্বাস প্রকাশ করে: "ফলত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আমি তোমাদের কাছে এই শিক্ষা সমর্পণ করেছি এবং তা নিজেও পেয়েছি যে, শাস্ত্র অনুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য প্রাণ দিলেন ও তাঁকে কবর দেওয়া হল, আর শাস্ত্র অনুসারে তিনি তৃতীয় দিনে উত্থাপিত হয়েছেন।"

অনেক পণ্ডিত যীশুর মত্যুর এক দশকেরও কম সময় পরে বিশ্বাসের স্বীকারোক্তিগুলো খুঁজে পেয়েছেন, যা যিরূশালেমের যিহূদী ধর্ম থেকে আসা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কাছ থেকে এসেছে। কোন পণ্ডিতই এইসব স্বীকারোক্তির লিখিত আকারের তারিখ ৪০ এর দশকের পরে দেন নি। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় ও প্রাথমিক বিশ্বাসের স্বীকারোক্তিগুলো ১ যোহন ৪:২, ২ তীমথিয় ২:৮, রোমীয় ১:৩-৪, এবং ১ তীমথিয় ৩:১৬ পদের মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে।

যিহূদী ধর্মের শিক্ষার ধারাবাহিকতা

প্রথম দিকের খ্রীষ্টধর্ম যিহূদী ধর্মের অনেক মতবাদ ও অনুশীলন নিজেদের বিশ্বাস ও অনুশীলনের মধ্যে বজায় রাখে। তারা যিহূদীদের পবিত্র শাস্ত্রকে কর্তৃত্বপূর্ণ এবং পবিত্র বলে মনে করতেন। তারা বেশিরভাগ পুরাতন নিয়মের সেপ্টুয়াজিন্ট অনুবাদ ব্যবহার করতেন এবং নতুন নিয়মের ক্যানন বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে নতুন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকগুলোকেও গ্রহণ করেছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম অন্যান্য যিহূদী প্রথাও অব্যাহত রেখেছিল: লিটার্জিকাল উপাসনা, ধূপ জ্বালানো, একটি বেদী, সিনাগগের অনুশীলন থেকে প্রাপ্ত শাস্ত্র পাঠ, প্রশংসা-সংগীত ও প্রার্থনায় পবিত্র সঙ্গীতের ব্যবহার, এবং একটি ধর্মীয় ক্যালেন্ডার ব্যবহার, সেইসাথে অন্যান্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যেমন একচেটিয়াভাবে পুরুষের পৌরহিত্য ও যাজকত্ব, এবং উপবাস ও প্রভুর ভোজ অনুশীলন করা, ইত্যাদি।

প্রথম শতাব্দীর প্রথম দিকের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা যিহোবাকে (সদাপ্রভুকে) একমাত্র সত্য ঈশ্বর, ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করতেন এবং যীশুকে পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী করা মশীহ (খ্রীষ্ট) বলে মনে করতেন।

খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপর নির্যাতন এবং প্রেরিত পরবর্তী চার্চ বা মণ্ডলী

প্রথম থেকেই খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাসীরা বিভিন্ন তাড়না বা নির্যাতনের শিকার হত। এমনকি

এই নির্যাতনের ফলে স্তিফান (প্রেরিত ৭:৫৯) এবং সিবিদিয়ের পুত্র যাকোব মৃত্যুবরণ করেন (প্রেরিত ১২:২)। রোমান সাম্রাজ্যের কর্তৃপক্ষের হাতে সবচেয়ে বেশী নির্যাতন নেমে আসে যা ৬৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু হয়। রোমান ইতিহাসবিদ ট্যাসিটাসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্রাট নিরো সেই বছরের রোম শহর আগুনে পুড়ে যাবার জন্য খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের দায়ী করেছিলেন।

[সম্রাট ভ্যালেরিয়ানাসের সামনে সেন্ট লরেন্স (২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সাক্ষ্যমর হন)।]

খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর ঐতিহ্য অনুযায়ী, সম্রাট নিরোর নির্যাতনের ফলে পিতর ও পৌল প্রত্যেকেই রোমে সাক্ষ্যমর হন। একইভাবে, নতুন নিয়মের বেশ কয়েকটি লেখায় তাড়নার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের ধৈর্যের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ২৫০ বছর ধরে খ্রীষ্টানরা রোমান সম্রাটের উপাসনা করতে অস্বীকার করার জন্য বিক্ষিপ্ত তাড়নায় ভুগছিলেন। সম্রাটের উপাসনা না করাকে রোম দেশদ্রোহী এবং মত্যুদণ্ডযোগ্য বলে মনে করতো। এই পর্যায়ক্রমিক তাড়না সত্ত্বেও, খ্রীষ্টিয় ধর্ম-বিশ্বাস ভূমধ্যসাগরীয় অববাহিকা জুড়ে তার বিস্তার অব্যাহত রাখে।

প্রেরিতদের মত্যুর পরবর্তী সময় বিশপগণ শহুরে খ্রীষ্টান জনগোষ্ঠীর অধ্যক্ষ বা ধর্মীয় নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। মহান সম্রাট কনস্টানটাইনের শাসনামলে খ্রীষ্টিয় উপাসনা আইনগত ভাবে বৈধ হওয়ার আগ পর্যন্ত নির্যাতনের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টধর্ম অগ্রসর হয়েছে। খ্রীষ্টধর্ম (গ্রীক Χριστιανισμός) এবং ক্যাথলিক (গ্রীক καθολικός)- এই শব্দগুলোর সবচেয়ে প্রাচীনতম ব্যবহার আন্তিয়খীয়ার ইগনাটিয়াসের লেখা থেকে পাওয়া যায়, যা ১০৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়েছিল।

খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর বা চার্চের কাঠামো

প্রথম শতাব্দীর শেষের দিক থেকে শুরু করে দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে, চার্চে

একটি প্রধান পৌরহিত্য-সংক্রান্ত এবং বিশপ-সংক্রান্ত কাঠামো স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক বিশপ ছিলেন রোমের ক্লীমেন্ত, আন্তিয়খীয়ার ইগনেসিয়াস, স্মূর্ণার পলিকার্প এবং লিয়ঁসের আআআইরেনিয়াস। এই কাঠামোটি প্রৈরিতিক উত্তরাধিকারের মতবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল যেখানে, হস্তাপর্ণের রীতি অনুসারে, একজন বিশপ পূর্ববর্তী বিশপের আধ্যাত্মিক উত্তরসূরি হয়ে ওঠেন। এর মধ্য দিয়ে তারা মনে করতেন যে, তারা প্রৈরিতিক ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত। প্রত্যেক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়েরও প্রেসবাইটার বা পালক ছিল, যেমনটি যিহূদী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে হয়েছিল। তারা অভিষেকের মধ্য দিয়ে নিযুক্ত হতেন এবং বিশপকে সহায়তা করতেন। খ্রীষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, প্রেসবাইটাররা আরও দায়িত্ব পালন করতেন এবং যাজক হিসাবে স্বতন্ত্র আকার ধারণ করতেন। সবশেষে, ডিকন বা পরিচারকেরাও কিছু দায়িত্ব পালন করতেন যেমন, দরিদ্র ও অসুস্থদের যত্ন নেওয়া।

প্রারম্ভিক খ্রীষ্টিয় লেখাগুলো

খ্রীষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে এর ধর্মান্তরিতদের মধ্যে হেলেনিষ্টিক বিশ্বের সুশিক্ষিত সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ বিশপ হয়েছিলেন। তারা দুই ধরনের কর্মপদ্ধতি তৈরি করেছিলেন: ধর্মতাত্ত্বিক এবং "ক্ষমা-সম্বন্ধীয় কাজ;" পরেরটি খ্রীষ্টধর্মের সত্যতার বিরুদ্ধে যুক্তি খণ্ডন করার জন্য যুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বাস রক্ষার উদ্দেশ্যে কাজ করা হয়েছিল। এই লেখকরা 'খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর পিতা' নামে পরিচিত ছিলেন, এবং তাদের লেখা যারা অধ্যয়ন করতো তাদেরকে প্যাট্রিস্টিক বলা হতো।

খ্রীষ্টধর্মের প্রাথমিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত-সার

উল্লেখযোগ্য প্রাথমিক পিতাদের মধ্যে রয়েছেন আন্তিয়খীয়ার ইগনেসিয়াস, পলিকার্প, জাস্টিন মার্টার, আইরেনিয়াস, টার্টুলিয়ান এবং আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লীমেন্ত, অরিজেন সহ অন্যান্যরা।

প্রারম্ভিক প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধ-বিশ্বাস

নতুন নিয়ম নিজেই ধর্মের গোঁড়া মতবাদ বজায় রাখার কথা বলে এবং প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তাদের যুক্তি খণ্ডন করার গুরুত্বের কথা প্রকাশ করে। মিথ্যা ভাববাদীদের (বিশেষ করে মথি ও মার্কের সুসমাচার) বিরুদ্ধে বাইবেলের বর্ণনার কারণে খ্রীষ্টধর্ম সবসময় বিশ্বাসের "সঠিক" বা গোঁড়া ব্যাখ্যার দিকে মনোনিবেশ করতে বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রথম দিকের খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর বিশপদের অন্যতম প্রধান ভূমিকা ছিল সঠিক ব্যাখ্যা নির্ধারণ করা এবং বিরুদ্ধবাদী মতামতকে খণ্ডন করা (যাদের বিধর্মী হিসাবে উল্লেখ করা হয়)। বিশপদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতামত থাকায়, গোঁড়া মতবাদ কি তা সংজ্ঞায়িত করতে শত শত বছর লেগে যায়। এই বিভিন্ন মতবাদের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়ে উঠে।

খ্রীষ্টিয় ধর্ম-বিশ্বাসের পক্ষসমর্থনকারী এবং লেখক জি কে চেস্টারটন তার 'অর্থোডক্সি' বইতে দাবি করেছেন যে, বিশ্বাস সম্বন্ধে নতুন নিয়ম ও যীশুর সময় থেকে যথেষ্ট মতবিরোধ ছিল। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রেরিতরা সবাই খ্রীষ্টের শিক্ষা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়েছিলেন যেমনটি আন্তিয়খীয়ার ইগনেসিয়াস, আইরেনিয়াস, জাস্টিন মার্টার এবং পলিকার্প সহ প্রথম দিকের খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর পিতারা অবস্থান নিয়েছিলেন (মিথ্যা ভাববাদী, খ্রীষ্টবিরোধী, পাপ-পুরুষ, জ্ঞায়বাদী নিকোলাইতীয়ের বিষয়ে প্রকাশিত বাক্য থেকে দেখুন)। যীশু নিজেও ভণ্ড ভাববাদীদের (মার্ক ১৩:২১-২৩) এবং (মথি ১৩:২৫-৩০, মথি ১৩:৩৬-৪৩) "আগাছা" বলেছেন এবং সতর্ক করে দিয়েছেন যেন খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের বিকৃতিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

প্রথম দিকের বিতর্কগুলো সাধারণত খ্রীষ্ট বিষয়ক ধর্মতত্ত্ব প্রকৃতির ছিল; অর্থাৎ, তা যীশুর (চিরন্তন) ঈশ্বরত্ব বা মানবতার সাথে সম্পর্কিত ছিল। ডসেটিজম বা দ্বৈতবাদ মনে করতো যে, যীশুর মানবতা কেবল একটি ভ্রম, এভাবে তাঁর মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করাকে অস্বীকার করা হত। এরিয়ানের শিক্ষায় বলা হয়েছিল যে, যীশু নিছক নশ্বর না হলেও চিরকাল ঐশ্বরিক ছিলেন না, এবং তাই তিনি পিতা-ঈশ্বর থেকে আলাদা ছিলেন। ত্রিত্ববাদে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর পিতা, যীশু পুত্র এবং পবিত্র আত্মা সকলেই কঠোরভাবে তিনটি দিক নিয়ে এক ছিলেন। অনেক দল দ্বৈতবাদী বিশ্বাস পোষণ

করে। তারা মনে করে যে, বস্তু দুটি আমূল বিরোধী অংশ নিয়ে গঠিত, যেখানে পদার্থ, সাধারণত মন্দ হিসাবে দেখা হয়, এবং আত্মাকে ভাল হিসাবে দেখা হয়। অন্যরা মনে করতো যে, বস্তুজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ উভয়ই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন এবং তাই উভয়ই ভাল এবং খ্রীষ্টের একীভূত ঐশ্বরিক ও মানব প্রকৃতি এর প্রতিনিধিত্ব করছে।

মতবাদের বিকাশ, অর্থোডক্স বা গোঁড়া মতবাদের অবস্থান এবং বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সম্পর্ক অব্যাহত একাডেমিক বা কেতাবী বিতর্কের বিষয়। বেশিরভাগ খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা আজও নাইসিয়ান বিশ্বাস-সূত্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মতবাদকে সমর্থন করে। আধুনিক খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদরা প্রাথমিক বিতর্ককে সংখ্যালঘু বিধর্মীদের বিরুদ্ধে একীভূত গোঁড়া অবস্থান হিসাবে বিবেচনা করেন। অন্যান্য পণ্ডিতরা অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি যিহূদী-খ্রীষ্টান, পৌলের-খ্রীষ্টান এবং অজ্ঞোয়বাদী খ্রীষ্টান এবং মার্সিওনাইটের মতো অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরে যুক্তি দেখান যে, প্রথম দিকের খ্রীষ্টধর্ম বিভক্ত ছিল, এবং সমসাময়িক গোড়া দলগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগীতা হত।

পবিত্র বাইবেলের ক্যানন

বাইবেলের ক্যানন হল সেই সব পুস্তকের সমষ্টি যে পুস্তকগুলোকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত বলে মনে করে। এভাবেই ‘পবিত্র বাইবেল’ নামে পুস্তকটি সৃষ্টি হয়েছে। যদিও প্রারম্ভিক চার্চ সেপ্টুয়াজিন্টের (LLX) ক্যানন অনুসারে পুরাতন নিয়ম ব্যবহার করেছিল, তবে প্রেরিতরাও নতুন কোন পুস্তককে শাস্ত্রের অংশ করে রেখে যাননি; পরবর্তীতে সময়ের সাথে সাথে নতুন নিয়ম বিকশিত হয়েছিল এবং তা ক্যাননভুক্ত হয়েছিল।

[পি ৪৬ থেকে একটি পৃষ্ঠা, তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকের নতুন নিয়মের প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি।]

প্রেরিতদের দ্বারা লিখিত লেখাগুলো প্রাচীনতম খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথম শতাব্দীর শেষের

দিকে পৌলের পত্রগুলো সংগৃহীত আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে জাস্টিন মার্টার "প্রেরিতদের স্মৃতিকথা" উল্লেখ করেন, যাকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা "সুসমাচার" বলে অভিহিত করেছিল এবং তা পুরাতন নিয়মের সমতুল্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। ১৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইরেনিয়াসের সময় চারটি সুসমাচার ক্যানন (*the Tetramorph*) ভুক্ত হয়েছিল বলে সরাসরি এটি উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে, অরিজেন হয়তো আধুনিক নতুন নিয়মের মতো একই ২৭টি পুস্তক ব্যবহার করে আসছিলেন, যদিও ইব্রীয়, যাকোব, দ্বিতীয় পিতর, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যোহন এবং প্রকাশিত বাক্য নিয়ে তখনও বিতর্ক ছিল। একইভাবে ২০০ সালে মুরাতোরিয়ান খণ্ডাংশ থেকে দেখা যায় যে, খ্রীষ্টিয় লেখাগুলোর একটি সেট ছিল যা এখন নতুন নিয়মের মতো ব্যবহৃত হত, যার মধ্যে চারটি সুসমাচার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এইভাবে, যখন নতুন নিয়ম ক্যানন নিয়ে প্রাথমিক চার্চে ভাল ধরনের বিতর্ক হয়েছিল, তখন দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রধান লেখাগুলো প্রায় সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা গ্রহণ করেছিল।

[রোমান সাম্রাজ্যে মণ্ডলীর অবস্থান।]

আলেকজান্ড্রিয়ার বিশপ আথানাসিয়াস তার ৩৬৭ সালের ইস্টার চিঠিতে ঠিক একই বইয়ের একটি তালিকা দিয়েছিলেন যা নতুন নিয়মের ক্যানন হয়ে উঠে এবং তিনি "ক্যানন দ্বারা গৃহীত" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন সেই পুস্তকগুলোকে উল্লেখ করার জন্য।

৩৯৩ সালে আফ্রিকান সিনোড অফ হিপ্পো নতুন নিয়ম অনুমোদন করে, যেমনটি আজ রয়েছে। এর সঙ্গে পুরাতন নিয়মের সেপ্টুয়াজিন্ট অনুবাদটিকে অনুমোদন করে যা ৩৯৭ এবং ৪১৯ সালে কাউন্সিল অফ কার্থেজ দ্বারা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল। এই কাউন্সিলগুলো সেন্ট অগাস্টিন এর কর্তৃত্বে ছিল, যিনি ক্যাননটিকে ইতিমধ্যে বন্ধ বা শেষ হয়েছে বলে মনে করতেন।

৩৮৩ সালে দামাসকাস বাইবেলের ল্যাটিন ভালগেট সংস্করণের সম্পাদন হয়েছিল যা

পশ্চিমে ক্যানন নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ৪০৫ সালে পোপ ইনোসেন্ট লিখেছেন, "আমি তুলুজের একজন গ্যালিক বিশপ, এক্সুসুপারিয়াসের কাছে পবিত্র বইয়ের একটি তালিকা পাঠিয়েছিলাম।" কিন্তু, এই বিশপ এবং কাউন্সিলগুলো যখন এই বিষয়ে কথা বলেছিল, তখন তারা নতুন কিছু সংজ্ঞায়িত করছিল না, বরং চার্চ যে বিষয়গুলোকে অনুমোদন করছিল সেই বিষয়েই তারা আলোচনা করেছিলেন।"

এভাবে চতুর্থ শতাব্দী থেকে পাশ্চাত্যে নতুন নিয়মের ক্যানন (আজকের মত) বিষয়ে ঐকমত্য ছিল এবং পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে প্রাচ্য, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটি গ্রহণ করেছিল। তা সত্ত্বেও রোমান ক্যাথলিক ধর্মের জন্য ১৫৪৬ সালের ট্রেন্ট কাউন্সিল পর্যন্ত ক্যাননের একটি গোঁড়া বক্তব্য তৈরি করা হয়নি, চার্চ অফ ইংল্যান্ডের জন্য ১৫৬৩ সালের উনত্রিশটি অনুচ্ছেদ, ক্যালভিনবাদের জন্য ১৬৪৭ সালের ওয়েস্টমিনিস্টার বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি এবং গ্রীক অর্থোডক্সের জন্য ১৬৭২ সালের যিরূশালেমের সিনোড তাদের বক্তব্য তৈরি করে।

রোমান সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর বিস্তৃতি (৩১৩-৪৪৬)

খ্রীষ্টধর্মের প্রাচীন যুগের শেষে চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে রোমের সম্রাটের পদে কনস্টানটাইনের আরোহণের সাথে শুরু হয়ে মধ্যযুগের আবির্ভাব পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এই সময়ের শেষটা পরিবর্তনশীল ছিল কারণ উপ-রোমান যুগ ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হচ্ছিল এবং বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সময়ে সেই রূপান্তর ঘটেছিল। এই রূপান্তর সাধারণত ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে স্থায়ী রূপ নিয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

[মিউসেই ক্যাপিটালিনিতে কনস্টানটাইনের মুখমণ্ডলের বিশাল মূর্তি।]

খ্রীষ্টধর্মের আইগত বৈধরূপ

গ্যালেরিয়াস ৩১১ সালের এপ্রিল মাসে তার শাসনামলে খ্রীষ্টধর্ম পালনের অনুমতি দিয়ে একটি আদেশ জারি করেছিলেন। ৩১৩ সালে কনস্টানটাইন ১ ও লিসিনিয়াস মিলানের আদেশে খ্রীষ্ট ধর্মের সহনশীলতার ঘোষণা

দেন। কনস্টানটাইন প্রথম খ্রীষ্টান সম্রাট হন। ৩৯১ সালের মধ্যে প্রথম থিওডোসিয়াসের রাজত্বকালে খ্রীষ্টধর্ম রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হয়। প্রথম সম্রাট কনস্টানটাইন প্রথম যিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তিনিও প্রথম সম্রাট যিনি একটি বৈধ ধর্ম হিসাবে খ্রীষ্ট-ধর্মবিশ্বাস প্রকাশ্যে প্রচার করেছিলেন।

মহান কনস্টানটাইন

প্রথম সম্রাট কনস্টানটাইনের মা হেলেনা তাকে খ্রীষ্টধর্মের সংস্পর্শে এনেছিলেন। তবে, কস্টানটাইন তার যৌবনে তার মায়ের নম্র খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন কিনা, অথবা তিনি তার জীবন কালে তিনি খ্রীষ্টধর্মের নম্ররূপ ধীরে ধীরে গ্রহণ করেছিলেন কিনা তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে।

খ্রীষ্টিয় সূত্রগুলোর রেকর্ড অনুসারে, কনস্টানটাইন ৩১২ সালে মিলভিয়ান সেতুর যুদ্ধে একটি নাটকীয় ঘটনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, যার পরে কনস্টানটাইন পশ্চিমে সম্রাটত্ব দাবি করেছেন। এই সূত্রগুলো অনুসারে, কনস্টানটাইন যুদ্ধের আগে সূর্যের দিকে তাকিয়ে তার উপরে আলোর একটি ক্রুশ দেখতে পান, এবং এর সাথে গ্রীক শব্দ “Εν Τουτω Νικα” (“এর দ্বারা, জয় কর!”, প্রায়শই ল্যাটিন ভাষায় একে

[কনস্টান্টিনোপলের হাগিয়া সোফিয়া চার্চ]

"ইন হক সিগনো ভিনসে" হিসাবে উপস্থাপিত হয়। কনস্টানটাইন তার সৈন্যদের তাদের ঢালে খ্রীষ্টান প্রতীক (চি-রো) দিয়ে শোভিত করার আদেশ দিয়েছিলেন। এই ব্যানারে তারা বিজয়ী হয়েছিল।

এই সময়ে কনস্টানটাইন কতটা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তা বোঝা কঠিন; সাম্রাজ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা, বিশেষ করে তার উচ্চ সামরিক কর্মকর্তারা তখনও পৌত্তলিক ছিল, এবং কনস্টানটাইনের শাসন অন্তত এই দলগুলোকে সন্তুষ্ট করার ইচ্ছা প্রদর্শন করেছিল। যুদ্ধের আট বছর পর পর্যন্ত রোমান মুদ্রাগুলোতে তখনও রোমান দেবতাদের ছবি ছিল। তা সত্ত্বেও, কনস্টানটাইনের খ্রীষ্টধর্মে অন্তর্ভুক্তি খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট ছিল।

তার বিজয়ের পর, কনস্টানটাইন চার্চকে আর্থিকভাবে সহয়তা করেন। তিনি বিভিন্ন ব্যাসিলিকা নির্মাণ করেন, পুরেহিতদের বিশেষ সুবিধা (উদাহরণস্বরূপ, কিছু কর থেকে অব্যাহতি) মঞ্জুর করেন, খ্রীষ্টানদের উচ্চপদস্থ পদে উন্নীত করেন এবং মহান ডায়োক্লিশিয়ানের নিপীড়নের সময় বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি ফিরিয়ে দেন।

৩২৪ থেকে ৩৩০ সালের মধ্যে কনস্টানটাইন বসফরাসের উপর বাইজান্টিয়ামে একটি নতুন সাম্রাজ্যবাদী রাজধানী নির্মাণ করেন এবং এই রাজধানীর নামকরণ করা হয় কনস্টান্টিনোপল। শহরটিতে অত্যধিক খ্রীষ্টান স্থাপত্য নির্মাণ করা হয়, শহরের দেয়ালের ভিতরে চার্চ ছিল ("পুরানো" রোমের মতো), এবং কোনও পৌত্তলিক মন্দির ছিল না। প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী, কনস্টানটাইন তার মৃত্যুশয্যায় বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন।

কনস্টানটাইন খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর নেতৃত্বেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। ৩১৩ সালে তিনি খ্রীষ্টিয় উপাসনাকে বৈধ করে মিলানের আদেশ জারি করেন। ৩১৬ সালে তিনি ডোনাটিস্ট বিতর্ক সম্পর্কিত উত্তর আফ্রিকার একটি বিবাদে বিচারক হিসেবে কাজ করেন। আরও তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ৩২৫ সালে তিনি এরিয়ান বিতর্ক মোকাবেলা করার জন্য নাইসিয়া কাউন্সিলকে তলব করেন যা ছিল কার্যকরভাবে প্রথম ইকুমেনিক্যাল কাউন্সিল।

কাউন্সিল নাইসিয়ান বিশ্বাসের স্বীকারোক্তির বিষয়টির জন্য আরও বিখ্যাত হয়ে উঠে, যা অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি খ্রীষ্টিয় জগতের শুরু এক পবিত্র সার্বজনীন প্রৈরিতিক খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর উপর বিশ্বাসের দাবি করেছিল। কনস্টানটাইনের রাজত্ব চার্চে খ্রীষ্টিয়ান

সম্রাটের অবস্থানের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। সম্রাটরা তাদের প্রজাদের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে নিজেকে দায়ী বলে মনে করতেন এবং এভাবে তাদের অর্থোডক্সি বা গোঁড়া বিশ্বাস বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করতেন।

সম্রাট মতবাদ স্থির করতেন না– এই দায়িত্ব ছিল বিশপদের– বরং তার ভূমিকা ছিল মতবাদ প্রয়োগ করা, যেন ধর্মদ্রোহের মূলোৎপাটন করা যায় এবং খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর ঐক্য বজায় রাখা যায়। সম্রাট নিশ্চিত করতেন যে, তার সাম্রাজ্যে ঈশ্বরের যথাযথ উপাসনা করা হয়েছে। খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর জন্য সঠিক উপাসনার সঠিক প্রকৃতি নির্ধারণ করার দায়িত্ব বিশপগণ পালন করতেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর কিছু সম্রাট কাউন্সিলের আশ্রয় না নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী আদেশ দ্বারা মতবাদ পরিবর্তন করতে না চাওয়া পর্যন্ত এই দৃষ্টান্ত অব্যাহত থাকে, যদিও কনস্টানটাইনের দৃষ্টান্ত সাধারণত আদর্শ ছিল।

কনস্টানটাইনের রাজত্ব সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্মের জন্য সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতার প্রতিনিধিত্ব করেনি, বা তাড়নারও সমাপ্তি হয় নি। প্রাচ্যে তার উত্তরসূরি, দ্বিতীয় কনস্টান্টিয়াস, এরিয়ান বিশপদের তার রাজদরবারে রেখেছিলেন যারা বিভিন্ন বিষয় দেখভাল করতেন এবং তারা অর্থোডক্স বিশপদের বহিষ্কার করতেন।

কনস্টান্টিয়াসের উত্তরসূরি জুলিয়ান, যিনি খ্রীষ্টান বিশ্বে ধর্মত্যাগী জুলিয়ান নামে পরিচিত ছিলেন। তিন একজন দার্শনিক ছিলেন যিনি সম্রাট হওয়ার পর খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করেন এবং পৌত্তলিকতার একটি নব্য-প্লেটোনিক এবং রহস্যময় রূপগ্রহণ করেন, যা খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠানকে হতবাক করে দেয়। পুরানো পৌত্তলিক বিশ্বাসের মর্যাদাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে, তিনি তাদেরকে খ্রীষ্টিয় ঐতিহ্যের মতো করে খ্রীষ্টিয় ঐতিহ্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে বিশপ-সম্বন্ধীয় কাঠামো এবং পাবলিক দাতব্য প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করেছিলেন।

খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী বা চার্চকে সরকারী রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে পূর্বে যে সব সুযোগ-সুবিধা এবং মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল তার বেশিরভাগই জুলিয়ান বাদ দিয়েছিলেন। তার সংস্কারগুলো অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি তিনি পৌত্তলিক মন্দিরগুলো পুনরায় খোলার মাধ্যমে ধর্মীয় বৈষম্যের একটি রূপ তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। পূর্বে বিধর্মী হিসাবে যে সব বিশপদের নির্বাসিত করা হয়েছিল তিনি তাদের গ্রহণ করেছিলেন, ও যিহূদী ধর্ম প্রসারের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর জমি তাদের মূল মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। যাহোক, জুলিয়ানের সংক্ষিপ্ত রাজত্ব শেষ হয়

যখন তিনি প্রাচ্যে প্রচারণা চালানোর সময় মারা যান।

জুলিয়ানের উত্তরসূরি জোভিয়ান, প্রথম ভ্যালেন্টিনিয়ান এবং ভ্যালেন্সের শাসনামলে খ্রীষ্টধর্ম আবারও তার আধিপত্য বিস্তার করে। ৩৮০ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী, প্রথম থিওডোসিয়াস আদেশ জারি করে "ক্যাথলিক ধর্ম-বিশ্বাসকে" একচেটিয়া সরকারী রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন, অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়কে অবৈধ ঘোষণা করেন এবং পৌত্তলিক মন্দির বন্ধ করে দেন। ৩৯১ সালে প্রথম থিওডোসিয়াস কর্তৃক অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করে অবশিষ্ট পরজাতীয় অনুশীলন বন্ধ করে দেন।

ডায়োসিস (বিশপদের এক্তিয়ারভূক্ত এলাকা) কাঠামো

রোম সম্রাট চার্চকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধকরণের পর, চার্চ সাম্রাজ্যের মতো একই সাংগঠনিক কাঠামো গ্রহণ করে: ভৌগলিক ধর্ম-প্রদেশ, যাকে ডায়োসিস বলা হয়, সাম্রাজ্যবাদী সরকারী আঞ্চলিক বিভাগের সাথে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। বিশপরা, যারা প্রাক-বৈধকরণ ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রধান শহুরে কেন্দ্রগুলোতে অবস্থান করতেন, তারা প্রতিটি ডায়োসিস তত্ত্বাবধান করতেন। ধর্ম-প্রদেশে বিশপের অবস্থান ছিল তার "আসন" নামে; এই সব আসন বা ধর্ম-প্রদেশের মধ্যে পাঁচটি আসনের বিশেষ খ্যাতি ছিল: রোম, কনস্টান্টিনোপল, যিরূশালেম, আন্তিয়খীয়া এবং আলেকজান্ড্রিয়া।

এই সব আসন বা ধর্ম-প্রদেশগুলোর মর্যাদা আংশিকভাবে তাদের প্রৈরিতিক প্রতিষ্ঠাতাদের উপর নির্ভর করে, যাদের কাছ থেকে বিশপদের এইভাবে আধ্যাত্মিক উত্তরসূরি হিসাবে বিবেচনা করা হত, যেমন, সেন্ট মার্ক আলেকজান্ড্রিয়া ধর্ম-প্রদেশ, রোমের ধর্ম-প্রদেশ প্রেরিত পিতর ইত্যাদির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে। তাদের অগ্রাধিকারের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল। যিরূশালেম ছিল খ্রীষ্টের মত্যু ও পুনরুত্থানের স্থান এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রথম শতাব্দীর কাউন্সিলের স্থান। আন্তিয়খীয়া ছিল যেখানে যীশুর অনুসারীদের প্রথমে 'খ্রীষ্টিয়ান' নামকরণ করা হয়েছিল। রোম ছিল যেখানে প্রেরিত পিতর এবং পৌল সাক্ষ্যমর হয়েছিলেন। কনস্টান্টিনোপল ছিল "নতুন রোম" যেখানে কনস্টানটাইন ৩৩০ সালে তার রাজধানী সরিয়ে নিয়েছিলেন। উপরন্তু, এই সমস্ত শহরে গুরুত্বপূর্ণ ধ্বংসাবশেষ ছিল।

পোপের শাসন এবং তার প্রাধান্য

পোপ হলেন রোমের বিশপ এবং তার পদটিকে বলা হয় "পাপাসি"। একজন বিশপ হিসাবে, এর উৎস প্রথম শতাব্দীতে একটি বিশপ-সম্বন্ধীয় কাঠামোর বিকাশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে, পোপের শাসনের প্রাধান্যের ধারণাও বহন করে: রোমের আসন

বা ধর্ম-প্রদেশ অন্যান্য সমস্ত আসনের মধ্যে প্রাধান্য পায়। এই ধারণার উৎপত্তি ঐতিহাসিকভাবে অস্পষ্ট; ধর্মতাত্ত্বিকভাবে, এটি তিনটি প্রাচীন খ্রীষ্টিয় ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে:

(১) প্রেরিত পিতর প্রেরিতদের মধ্যে প্রধান ছিলেন,

(২) পিতর রোমান ধর্ম-প্রদেশের জন্য তার উত্তরসূরি অভিষেক করেন, এবং

(৩) বিশপ প্রেরিতদের উত্তরসূরি ছিলেন (প্রৈরিতিক উত্তরাধিকার)।

যতদিন পোপের ধর্ম-প্রদেশ পশ্চিমা সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল, রোমের বিশপের মর্যাদা এই বিষয়গুলোর বাইরে অত্যাধুনিক ধর্মতাত্ত্বিক তর্কের প্রয়োজন ছাড়াই গ্রহণ করা হয়েছিল। পরে যখন তা মিলানে স্থানান্তর হয় ও তারপর রেভেনায় স্থানান্তর হয়, তখন মথি ১৬:১৮-১৯ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে আরও বিস্তারিত যুক্তি তৈরি করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও, প্রাচীনকালে পিতরের লেখা এবং প্রৈরিতিক গুণ, সেইসাথে রোমান ধর্ম-প্রদেশ সম্পর্কিত “সম্মানের প্রাধান্য” বিষয়টি একইভাবে সম্রাট, ইর্স্টান চার্চের পিতৃপুরুষ এবং ইর্স্টান চার্চ কোন চ্যালেঞ্জ করেন নি।

৩৮১ সালে কনস্টান্টিনোপলের ইকুমেনিক্যাল কাউন্সিল রোমের ধর্ম-প্রদেশের প্রাধান্যকে নিশ্চিত করে। যদিও পোপের আপীল এখতিয়ার, এবং কনস্টান্টিনোপলের অবস্থান, আরও মতবাদমূলক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়েছিল, খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর প্রাচীনত্বের সমাপ্তি, রোমের প্রাধান্য এবং এটি সমর্থনকারী অত্যাধুনিক ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তিগুলো সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছিল। এই প্রাধান্যের মধ্যে ঠিক কী জড়িত ছিল, এবং এটি কিভাবে প্রয়োগ করা হত, পরবর্তী সময়ে তা বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠে।

ইকুমেনিক্যাল কাউন্সিল

সেই যুগে, বেশ কয়েকটি ইকুমেনিক্যাল কাউন্সিল আহ্বান করা হয়েছিল। এগুলো বেশিরভাগই খ্রীষ্টতত্ত্বের বিরোধের সাথে সম্পর্কিত ছিল। নাইসিনি (৩২৫, ৩৮২) দুইটি কাউন্সিল এরিয়ান শিক্ষাকে ধর্মদ্রোহী বলে নিন্দা জানায় এবং একটি বিশ্বাস-সূত্র তৈরি করে যা নাইসিয়ান বিশ্বাস-সূত্র বলে পরিচিত। ইফিষীয় কাউন্সিল নেস্টোরিয়া ধর্মতত্ত্বের নিন্দা করে এবং ধন্য কুমারী মরিয়মকে ‘থিওটোকোস’ (“ঈশ্বর-বাহক” বা “ঈশ্বরের মা”) বলে চিহ্নিত করে।

সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাউন্সিল ছিল চালকেডনের কাউন্সিল যা নিশ্চিত করেছিল যে, খ্রীষ্টের দুটি প্রকৃতি ছিল– সম্পূর্ণ ঈশ্বর এবং সম্পূর্ণ মানুষ– স্বতন্ত্র কিন্তু সর্বদা

মিলনে নিঁখুত। এটি মূলত পোপ লিও দ্য গ্রেটস টোমের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল। সুতরাং, এটিতে মনোফিসিসিটিজমের (যীশু শুধু মানুষ ছিলেন) নিন্দা করেছিল এবং মনোথেলিটিজমকে (যীশুর মাত্র একটি ইচ্ছা) খণ্ডন করেছিল।

যাহোক, সব খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায়গুলো সব কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি, উদাহরণস্বরূপ নেস্টোরিয়ানিজম এবং আসিরিয় চার্চ অফ দ্য ইস্ট ৪৩১ সালে ইফিষীয় কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের উপর বিভক্ত হয়ে যায়। এরপর ওরিয়েন্টাল অর্থোডক্সি ৪৫১ সালে ক্যালসেডনের কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের উপর বিভক্ত হয়, এবং পোপ সের্গিউস প্রথম ৬৯২ সালে কুইনিসেক্সট কাউন্সিল প্রত্যাখ্যান করেন। এছাড়া, ৮৬৯-৮৭০ এবং ৮৭৯-৮৮০ এর চতুর্থ কাউন্সিল অফ কনস্টান্টিনোপল ক্যাথলিক ধর্ম এবং পূর্ব অর্থোডক্স দ্বারা বিতর্কিত হয়ে উঠে।

নাইসিন এবং নাইসিন পরবর্তী পিতাগণ

প্রথম দিকের খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর পিতাদের বিষয় ইতিমধ্যে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে; যাহোক, এর পরের প্রাচীন খ্রীষ্টধর্মের অনেক বিখ্যাত পিতা ছিলেন যারা ধর্মতাত্ত্বিক গ্রন্থগুলোর ভলিউম লিখেছিলেন, যার মধ্যে ছিলেন সেন্ট অগাস্টিন, সেন্ট গ্রেগরি সেন্ট নাজিয়ানসাস, যিরূশালেমের সেন্ট সিরিল, মিলানের সেন্ট অ্যামব্রোস, সেন্ট জেরোম এবং অন্যান্যরা। এর ফলে ভার্জিল এবং হোরেসের সময় থেকে সাহিত্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের স্বর্ণযুগ ছিল অতুলনীয়। জন ক্রিসোস্টম এবং আথানাসিয়াসের মতো এই পিতাদের মধ্যে কেউ কেউ বিধর্মী বাইজেন্টাইন সম্রাটদের কাছ থেকে নির্বাসন, নির্যাতন ভোগ করেছিলেন বা সাক্ষ্যমর হয়েছিলেন। তাদের অনেক লেখা নাইসিয়ান এবং নাইসিয়ান পরবর্তী পিতাদের সংকলন ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়।

পেন্টার্কি

পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে, চার্চ একটি শ্রেণীবদ্ধ "পেন্টার্কি" বা পাঁচটি আসন বা ধর্মপ্রদেশের (পিতৃতান্ত্রিক) ব্যবস্থা বিকশিত করেছিল, যার প্রাধান্যের একটি স্থির ক্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রোম, প্রাচীন কেন্দ্র হিসাবে এবং সাম্রাজ্যের বৃহত্তম শহর হিসাবে, বোঝাই যাচ্ছে যে, খ্রীষ্টিয় জগৎ এখন যে পেন্টার্কিতে বিভক্ত ছিল তার মধ্যে

সভাপতির পদ বা সম্মানের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল; যদিও এটা ছিল এবং এখনও এই সম্মান ধরে রাখা হয়েছে।

নীচের তালিকাটি রোমান সাম্রাজ্যের মূল পেন্টার্কির পাঁচটি পেন্টার্ক দেওয়া হল।

- রোম (প্রেরিত পিতর ও প্রেরিত পৌল), অর্থাৎ পোপ, পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের একমাত্র পেন্টার্ক।
- আলেকজান্ড্রিয়া (সেন্ট মার্ক), বর্তমানে মিশরে।
- আন্তিয়খীয়া (প্রেরিত পিতর), বর্তমানে তুরস্কে।
- যিরূশালেম (প্রেরিত যাকোব), বর্তমানে ইস্রায়েলে।
- কনস্টান্টিনোপল (প্রেরিত আন্দ্রিয়), বর্তমানে তুরস্কে।

[মহান অ্যান্টনির মঠ]

[বাইজেনটাইন সন্ন্যাসীদের একটি মঠ]

সন্ন্যাসবাদ

সন্ন্যাসবাদ হল তপস্যাবাদের একটি রূপ যার মাধ্যমে কেউ পার্থিব ভোগবিলাস ত্যাগ করে শুধুমাত্র স্বর্গীয় এবং আধ্যাত্মিক কাজে মনোনিবেশ করে, বিশেষ করে নম্রতা, দারিদ্র্য এবং সতীত্বের গুণাবলী দ্বারা। এটি খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর প্রথম দিকে একই ধরনের ঐতিহ্যের পরিবার হিসাবে শুরু হয়েছিল, শাস্ত্রীয় উদাহরণ এবং আদর্শের উপর ভিত্তি করে তা করা হয়েছিল, এবং যিহূদী ধর্মের কিছু শিক্ষার উপর এর শিকড় গ্রথিত ছিল। বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে আদি সন্ন্যাসী হিসাবে দেখা হয়ে থাকে, এবং সন্ন্যাসবাদকে প্রেরিতদের কার্যাবলিতে লিপিবদ্ধ প্রেরিত সম্প্রদায়ের সংগঠন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

সন্ন্যাস ধর্মের দুটি রূপ রয়েছে: ইরেমেটিক এবং সেনোবিটিক। ইরেমেটিক সন্ন্যাসীরা নির্জনে বাস করতেন, যেখানে সেনোবিটিক সন্ন্যাসীরা সম্প্রদায়ে বাস করতেন, সাধারণত একটি মঠে, একটি নিয়মের অধীনে এবং তারা একজন মঠাধ্যক্ষ দ্বারা পরিচালিত হতেন।

মূলত, মহান অ্যান্থনির উদাহরণ অনুসরণ করে সমস্ত খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীরা নির্জনবাসী

সন্ন্যাসী ছিলেন। যাহোক, সংগঠিত আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনার প্রয়োজনীয়তার জন্য ৩১৮ সালে সেন্ট পাচোমিয়াস তার অনেক অনুসারীদের সংগঠিত করে প্রথম সন্ন্যাসীদের মঠ তৈরি করেন। শীঘ্রই, মিশরীয় মরুভূমিতে এবং রোমান সাম্রাজ্যের বাকি পূর্ব অর্ধেক জুড়ে একই ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। সন্ন্যাসবাদের বিকাশের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বরা ছিলেন, প্রাচ্যে, সেন্ট বাসিল দ্য গ্রেট, এবং পশ্চিমে সেন্ট বেনেডিক্ট, যিনি বিখ্যাত বেনেডিক্টাইন নিয়ম তৈরি করেছিলেন, যা মধ্যযুগ জুড়ে সবচেয়ে সাধারণ নিয়ম হয়ে উঠে।

পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা

খ্রীষ্টিয় ঐক্যের ফাটল এবং যে ফাটল বড় বিভেদ সৃষ্টি করেছিল তা চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে স্পষ্ট হতে শুরু করে। যদিও ১০৫৪ সালে সাধারণত বড় ধরণের বিভেদ শুরু হয়, আসলে, কখন বিভেদের সৃষ্টি হয়েছিল তার কোন নির্দিষ্ট তারিখ নেই। আসলে যা ঘটেছিল তা ছিল ঘটনাগুলোর একটি জটিল শৃঙ্খল যার চূড়ান্ত পরিণতি ১২০৪ সালে চতুর্থ ক্রুসেড দ্বারা কনস্টান্টিনোপলকে বরখাস্ত করার সাথে সাথে শেষ হয়েছিল।

যেসব বিষয় বিভেদ সৃষ্টির দিকে পরিচালিত করেছিল তা একচেটিয়াভাবে ধর্মতাত্ত্বিক প্রকৃতির ছিল না। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং ভাষাগত পার্থক্য প্রায়শই ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ের সাথে মিশ্রিত হত। বিভেদের যে কোনও আখ্যান যা একটির উপর অন্যটি যুক্ত, তাই কোন একটি ঘটনার উপর জোর দিলে তা আংশিক হবে। পঞ্চম শতাব্দীতে চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কপ্ট বা আর্মেনিয়ানদের ছাড়া, খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর পূর্ব ও পশ্চিম অংশ সাতটি ইকুমেনিক্যাল কাউন্সিলের বিশ্বাস এবং কর্তৃত্বের প্রতি অনুগত ছিল। তারা তাদের সাধারণ বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের কারণে এক চার্চ হিসাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল।

তা সত্ত্বেও, রোমান রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে স্থানান্তরের ফলে দুই বড় আসন বা ধর্ম-প্রদেশ– রোম এবং কনস্টান্টিনোপলের সম্পর্কের মধ্যে অনিবার্যভাবে অবিশ্বাস, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেমে এসেছিল এবং একে অপরের প্রতি প্রতি ঈর্ষা করতো। রোমের পক্ষে কনস্টান্টিনোপলের প্রতি ঈর্ষা করা সহজ ছিল যখন এটি দ্রুত তার রাজনৈতিক প্রাধান্য হারাচ্ছিল।

প্রকৃতপক্ষে, রোম কনস্টিনটিনোপলকে দ্বিতীয় স্থানে উন্নীত করে এমন একটি কাউন্সিলের চার্চ বিষয়ক আইনকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু এই

বিচ্ছিন্নতার ফলে জার্মানদের পাশ্চাত্যে আক্রমণ করতে সাহায্য করেছিল, যা কার্যকরভাবে দুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগকে দুর্বল করে দিয়েছিল। ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের বেশিরভাগ অঞ্চল বিজয়ের সাথে ইসলামের উত্থান এবং একই সাথে বলকান অঞ্চলে ভূমধ্যসাগরের একসময়ের সমগোত্রীয় একীভূত জগৎ দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। ৬০০-র দশকে গ্রীক পূর্ব ও ল্যাটিন পশ্চিমের মধ্যে যোগাযোগ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল এবং কার্যত তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দুটি মৌলিক সমস্যা– রোমের বিশপের প্রাধান্য এবং পবিত্র আত্মার শোভাযাত্রা এর সঙ্গে জড়িত ছিল। এই মতবাদের অভিনবত্বগুলো প্রথমে সেন্ট ফোটিয়াসের পিতৃতন্ত্রে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা হয়েছিল। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে, খ্রীষ্টিয় জগৎ রোমের প্রাধান্য ধরে রেখে পাঁচটি ধর্ম-প্রদেশে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এটি ক্যানোনিকাল সিদ্ধান্তের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল এবং অন্যদের উপর স্থানীয় খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর আধিপত্য বা পিতৃতন্ত্র প্রয়োগ করেনি।

যাহোক, রোম সার্বভৌমত্বের দিক থেকে এবং ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকার হিসাবে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর সার্বজনীন এখতিয়ার জড়িত বলে তার প্রাধান্য ব্যাখ্যা করতে শুরু করে। খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সমঝোতামূলক প্রকৃতি, কার্যত সমগ্র খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর উপর পোপের সীমাহীন ক্ষমতার আধিপত্য ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়েছিল।

একাদশ শতাব্দীর গ্রেগরিয়ান সংস্কার আন্দোলনের সময় অবশেষে এই ধারণাগুলোকে পশ্চিমে নিয়মতান্ত্রিক অভিব্যক্তি দেওয়া হয়েছিল। ইস্টার্ন চার্চগুলো বিশপ-সম্বন্ধীয় ক্ষমতার প্রকৃতি সম্পর্কে রোমের বোঝাপড়াকে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর অপরিহার্যভাবে সমঝোতামূলক কাঠামোর সরাসরি বিরোধিতা হিসাবে দেখেছিল এবং এইভাবে দুটি চার্চতত্ত্বের পারস্পরিক বিরোধী হিসাবে দেখা হত।

চার্চতত্ত্বের এই মৌলিক পার্থক্য বিভেদগুলো নিরাময় করতে ব্যর্থ হয়েছিল। চরিত্রগতভাবে, রোম তার রাজতান্ত্রিক দাবিকে প্রেরিত পিতরের উপর "সত্য এবং যথাযথ এখতিয়ার" (যেমনটি ১৮৭০ সালের ভ্যাটিকান কাউন্সিল বলে) এই শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিল। কিন্তু, মথি ১৬:১৮-এর এই "রোমান" ব্যাখ্যা পূর্ব অর্থোডক্স খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর পিতৃপুরুষদের কাছে অজানা ছিল।

পূর্ব অর্থোডক্স খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর মতে, প্রেরিত পিতরের প্রাধান্য কখনই কোনও এক বিশপের একচেটিয়া বিশেষ অধিকার হতে পারে না। সমস্ত বিশপকে প্রেরিত

খ্রীষ্টধর্মের প্রাথমিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত-সার

পিতরের মতই যীশুকে খ্রীষ্ট হিসাবে স্বীকার করতে হবে এবং সেই হিসাবে, সকলেই প্রেরিত পিতরের উত্তরসূরি। প্রাচ্যের চার্চগুলো রোমান ধর্ম-প্রদেশকে বা আসনকে প্রাধান্য দিয়েছিল কিন্তু আধিপত্য দেয়নি। পোপ সব বিশপদের মধ্যে প্রথম, কিন্তু অব্যর্থ নয় এবং বিশেষ কর্তৃত্ব করার ক্ষমতাও নেই বলে মনে করতো।

ইর্স্টান অর্থোডক্সির আরেকটি প্রধান বিরক্তিকর বিষয় ছিল পবিত্র আত্মার শোভাযাত্রার বিষয়ে পশ্চিমা ব্যাখ্যা। রোমের প্রাধান্যের ব্যাখ্যার মতো, এটিও ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছিল এবং পশ্চিমের বিশ্বাস-সূত্রে প্রবেশ করেছিল প্রায় অজ্ঞাতসারে। এই ধর্মতাত্ত্বিক জটিল বিষয়টি ল্যাটিন বাক্যাংশ ‘ফিলিওক’ (“এবং পুত্র থেকে”) এর পশ্চিমের দ্বারা বিশ্বাস-সূত্রে যুক্ত করা হয়েছিল।

কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত এবং আজও অর্থোডক্স চার্চ কর্তৃক ব্যবহৃত মূল বিশ্বাস-সূত্রে এই বাক্যাংশটি ছিল না; এই লেখায় শুধু বলা হয়েছে, “পবিত্র আত্মা, প্রভু ও জীবনদানকারী, যিনি পিতার কাছ থেকে এসেছেন।” ধর্মতাত্ত্বিকভাবে, ল্যাটিনের ব্যাখ্যা ইর্স্টান অর্থোডক্সির কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না কারণ এটি বোঝায় যে, আত্মা এখন মূল এবং শোভাযাত্রার দুটি উৎস ছিল, পিতা এবং পুত্র, একা পিতার নন। সংক্ষেপে ত্রিত্বের তিন ব্যক্তির মধ্যে ভারসাম্য পরিবর্তন করা হয় এবং ত্রিত্ব ও ঈশ্বরের বিষয়ে উপলব্ধিতে বিভ্রান্ত সৃষ্টি হয়।

ফলস্বরূপ, অর্থোডক্স চার্চ তখন এবং এখন, ধর্মতাত্ত্বিকভাবে তা অসমর্থনযোগ্য ছিল বলে বিশ্বাস করতো। কিন্তু ‘ফিলিওক’ দ্বারা উত্থাপিত গোঁড়া বিষয় ছাড়াও বাইজেন্টাইনরা যুক্তি দেখিয়েছিল যে, বাক্যাংশটি একতরফাভাবে যুক্ত করা হয়েছে এবং তাই, এটি অবৈধ, যেহেতু প্রাচ্যের সাথে কখনও এই ব্যাপারে পরামর্শ করা হয়নি। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, কেবল মাত্র আরেকটি বিশ্বজনীন পরিষদ এই ধরনের পরিবর্তন প্রবর্তন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কাউন্সিলগুলো, যারা মূল বিশ্বাস-সূত্রটি তৈরি করেছিল, তখন স্পষ্টভাবে এই সূত্রে কোনও বিয়োগ বা সংযোজন নিষিদ্ধ করেছিল।

[ইর্স্টান অর্থোডক্স চার্চের একটি ছবি]

এক নজরে খ্রীষ্টিয় ধর্ম-বিশ্বাসের বিজয়	
৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	নাসরতীয় প্রভু যীশুর জন্ম
৩০ খ্রীষ্টাব্দ	প্রভু যীশুর ক্রুশারোপণ, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ
৬৪ খ্রীষ্টাব্দ	রোম শহরে আগুন লাগা– সম্রাট নিরো কর্তৃক খ্রীষ্টিয়ানদের উপর নির্যাতন
৭০-১০০ খ্রীষ্টাব্দ	সুসমাচার ও নতুন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকগুলো লেখা শেষ হওয়া
২৫০-২৬০ খ্রীষ্টাব্দ	সম্রাট ডেসিয়াস ও ভ্যালেরিয়ান কতৃর্ক খ্রীষ্টিয়ানদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন
৩০৩ খ্রীষ্টাব্দ	সম্রাট ডায়োকলেশিয়ান কর্তৃক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের নির্যাতন
৩১২ খ্রীষ্টাব্দ	সম্রাট গ্যালিয়ানাস কর্তৃক শহনশীলতার আদেশ জারী করা
৩১২ খ্রীষ্টাব্দ	মিলভিয়ান সেতুর কাছে যুদ্ধ - সম্রাট কনষ্টানটাইনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করা
৩১৫ খ্রীষ্টাব্দ	নাইসিয়ান কাউন্সিল গঠন
৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দ	খ্রীষ্টধর্ম সরকারী ভাবে রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হওয়া

নতুন নিয়মের পটভূমি ও প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব

যিহূদী ও খ্রীষ্টিয়ান শাস্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে, সেগুলো সুস্পষ্টভাবে অনুবাদযোগ্য। পবিত্র বাইবেলের ইংরেজি অনুবাদগুলোর একটি জরিপ থেকে এই সত্য জানা যায়। পবিত্র বাইবেল বিশেষ করে যাকে আমরা এখন পুরাতন নিয়ম বলে থাকি তা বেশিরভাগ প্রাথমিক খ্রীষ্টিয়ান এবং নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোর লেখকদের ব্যবহারের জন্য হিব্রু থেকে গ্রীক ভাষায় করা একটি অনুবাদ ছিল যেটি LXX নামে পরিচিত। সিনাগগ বা সমাজগৃহগুলো ছিল ইব্রীয় শাস্ত্রের অরামিক ভাষার ব্যবহারিক চলমান অনুবাদের স্থান, যা যীশুর সময়ে ইস্রায়েল দেশের সেই সময়ের স্থানীয় ভাষা ছিল। "সাধারণ গ্রীক" ভাষায় লেখা নতুন নিয়মের পুস্তকগুলো দ্রুত বিভিন্ন কপটিক উপভাষায় এবং ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। অনুবাদের যে ধারা শুরু হয়েছিল তার ফলে আজ সম্পূর্ণ বাইবেল বা বাইবেলের কিছু অংশ-বিশেষ বিশ্বের দুই হাজারেরও বেশি ভাষায় পাওয়া যায়।

যদিও আমরা সাধারণ লোকেদের ভাষায় শাস্ত্রের সহজলভ্যতা প্রত্যক্ষ করি, তবুও আমরা এই মৌলিক সত্যটি উপেক্ষা করতে পারি না যে, এই ব্যবহারিক শব্দগুলোর গভীরতর অনুভূতিগুলোকে বুঝতে পারার চেয়ে একটি পৃষ্ঠার শব্দগুলো অনুবাদ করা অনেক সহজ। ভাষাবিদরা দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়ে সচেতন যে, অনুবাদের মাধ্যমে যে বিষয়গুলো পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়, তার বেশিরভাগই আসলে শব্দে প্রকাশ করা যায় না, তবে অর্থ ও ভাবের অনুবাদের বিষয়গুলো থেকে তা অনেক সময় পাঠকেরা অনুমান করে নেন। পৌল করিন্থীয়দের কাছে যে ইতিহাস প্রকাশ করেছিলেন, লূক তাঁর শ্রোতাদের কাছে যে সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো প্রকাশ করেছিলেন বা যোহন রাজকীয় রোমের যে অভিজ্ঞতাগুলো প্রকাশিত বাক্যের মধ্যে উপস্থাপন করেছিলেন, একজন পাঠক হয়তো সেগুলোর সব কিছু তার মনের পর্দায় ছবির মত করে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হবেন না যদি না সেই বিষয়গুলোর পটভূমি জানতে পারেন। এই পটভূমি জানার মধ্য দিয়ে তারা উপমা বা প্রতীক বা আলঙ্কারিক বা পারিবারিক ভাষার শব্দগুলোর তাৎপর্যকে আরও গভীরভাবে বুঝতে পারেন। এটা সত্য যে, আমরা হয়তো ইংরেজিতে, গ্রীক ভাষায় বা অন্য কোন ভাষায়

নতুন নিয়মের পটভূমি ও প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব

নতুন নিয়ম পড়ছি না কারণ নিজের ভাষাতেই পবিত্র শাস্ত্রের অনুবাদ পাওয়া যায়। তবে নতুন নিয়মের পৃষ্ঠার শব্দগুলোর চেয়ে আমাদের আরও বেশি কিছু জানা দরকার। নতুন নিয়মের যুগে লোকেরা এই সব কাহিনী বা শিক্ষার যে পটভূমি ধরে নিয়েছিল তার দিকে আমাদের মনোনিবেশ করা দরকার। নতুন নিয়ম বুঝবার জন্য আমাদের তৎকালীন প্রেক্ষাপট জানা দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয় বা সেমিনারীতে বাইবেলের কোর্স গ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা প্রায়শই তাদের অধ্যাপকদের বলতে শুনবে যে, বাইবেল বোঝার মূল চাবিকাঠি হল এর প্রেক্ষাপট বা পটভূমি বুঝতে পারা। নতুন নিয়মের বার্তা ভালভাবে বুঝবার জন্য আমাদের সেই সময়কার সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানা প্রয়োজন। নতুন নিয়মের পুস্তকগুলো যে প্রসঙ্গের মধ্যে লেখা হয়েছিল সেই সম্পর্কে বৃহত্তর সচেতনতা আমাদেরকে তার শব্দগুলো বুঝতে এবং আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে।

প্রাথমিক খ্রীষ্টধর্মের জগতের পটভূমিগুলো যে প্রসঙ্গের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে এবং যে সময়ের মধ্যে নতুন নিয়মের পুস্তকগুলো লেখা হয়েছিল তা আমাদের বুঝতে পারা দরকার। ইতিহাসের যে প্রেক্ষাপট ও সময়ের পথ ধরে খ্রীষ্টিয় ধর্ম-বিশ্বাস বিকশিত হয়েছে তা জানতে পারলে নতুন নিয়মের শিক্ষাগুলো আমাদেরকে আরো আলোকিত করবে। আজ আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি তা বর্ণনা করা একটি জটিল বিষয় বটে, কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের প্রাথমিক অবস্থায় ও নতুন নিয়ম লেখার প্রথম শতাব্দীর বিশ্বও কম জটিল ছিল না। এর কারণ এই নয় যে, প্রথম শতাব্দীর ভূমধ্যসাগরীয় বিশ্ব আমাদের নিজেদের চেয়ে অনেক বেশি জটিল ছিল, কিন্তু রোমীয় সাম্রাজ্যের প্রাচীনত্ব আমাদের কাছে অনেক কম পরিচিত বলে আমাদের কাছে তেমনটা মনে হয়। বর্তমানে আমাদের ভাষায় লেখা বাইবেল পাঠ করে আমরা সহজেই ধরে নিই যে, এর লেখকরা, এর প্রথম শতাব্দীর পাঠকরা সেই সময়ের চিন্তা-ভাবনাগুলো আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। আমরা ভুলে যাই যে, নতুন নিয়মের শিক্ষা ও ঘটনাগুলো সেই একবিংশ শতাব্দীর একটি মিশ্র-সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। প্রাথমিক খ্রীষ্টিয় জগৎ গড়ে তোলার জন্য প্রথম শতাব্দীর পিতর এবং পৌল, প্রিস্কিল্লা এবং ফৈবী, সেই সাথে তৎকালীন সময়, আন্দোলন, সংগ্রাম এবং সাহিত্য কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল এবং নতুন নিয়মকে শাস্ত্র হিসাবে তার আকার দিয়েছিল। সেই জন্য তৎকালীন এই জগতকে ভাল উপলব্ধি করা দরকার।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বর্তমানে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা বুঝতে পারে যে, প্রাথমিক

নতুন নিয়মের পটভূমি ও প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব

খ্রীষ্টধর্মের যিহূদী প্রেক্ষাপট জানাটা কত গুরুত্বপূর্ণ! আমরা জানি যে, যীশু একজন যিহূদী ছিলেন এবং তাঁর প্রথম দিকের অনুসারীরা ছিলেন যিহূদী ধর্ম থেকে আসা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী। নতুন নিয়মের লেখকদের বেশিরভাগই যিহূদী ছিলেন। তারা যিহূদী সংস্কৃতিতে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কীভাবে চিন্তা করেছিলেন, শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন তা তাদের বিশ্বাসকে প্রভাবিত করেছিল। প্রথম শতাব্দীতে একটি আদর্শবাদী যিহূদী ধর্ম সম্পর্কে কথা বলা এবং একইভাবে নতুন নিয়ম যুগের যিহূদীদের সম্পর্কে ঘোষণা করা অনেকটা সাধারণ ছিল। তারা কী বিশ্বাস করতো, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের অনুশীলন, এবং আরও অনেক কিছুই বুঝতে পারা প্রয়োজন। যীশু, পৌল এবং অন্যান্য নতুন নিয়ম ব্যক্তিত্বদের মিশন এবং তাঁদের বার্তা বুঝবার জন্য সেই সময়কার প্রেক্ষাপট ও পটভূমি হল মূল চাবিকাঠি। প্রথম যুগের বিশ্বাসীদের বিশ্বাস, আশা এবং অনুশীলনগুলো প্রায়শই যিহূদীদের বিশ্বাস, আশা এবং অনুশীলনের প্রতিবিম্ব হিসাবে দেখা যেত। যিহূদীদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য সেই সময় ভাগ করে নেবার চেষ্টা হয়েছিল, যেমন ত্বক্‌ছেদ এবং বিশ্রামবার পালনের অনুশীলন, ইত্যাদি। তারা যিহূদীদের অন্যান্য বিষয়গুলোতেও কখনও কখনও ব্যাপকভাবে, যেমন মশীহের প্রত্যাশা, মৃত্যুর পরে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় লেখাগুলো যা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত ছিল সেগুলোও ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। নতুন নিয়মের যুগে যিহূদীদের সম্পর্কে আমাদের যে বোঝাপড়া, সেখানে আমরা প্রাথমিক খ্রীষ্টিয় আন্দোলনের বিশ্বাস এবং অনুশীলনগুলোর ধারাবাহিকতা খুঁজে পাই।

একইভাবে, অসংখ্য এবং বৈচিত্র্যময় যিহূদী পুস্তক এবং পবিত্র শাস্ত্র প্রাথমিক খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বাস গঠন করতে সাহায্য করেছিল। এর মধ্যে পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবে তথাকথিত অ্যাপোক্রিফা এবং বেনামী লেখা বা সুডোগ্রাফগুলোর অনেকগুলো যা যীশুর আগে, তাঁর সময়ে এবং তাঁর পরে লেখা হয়েছিল সেগুলো খ্রীষ্ট-বিশ্বাস গঠনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। যারা নতুন নিয়ম এবং প্রাথমিক খ্রীষ্টধর্মের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আরও জানতে চান তাদেরও মিশরের আলেকজান্ড্রিয়ার ফাইলো (যিনি প্রায় যীশুর সমসাময়িক ছিলেন) এবং জোসিফাসের ঐতিহাসিক লেখাগুলোর সাথে এবং প্রথম শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশের সাথে পরিচিত হওয়া উচিত। ৭০ খ্রীষ্টাব্দের আগে যে যিহূদী সম্প্রদায়গুলো সমৃদ্ধ হয়েছিল, অর্থাৎ, এসেনিসরা– যাদের মধ্যে কেউ কেউ যীশুর সমসাময়িক ছিলেন– যারা অনেকগুলো ডেড সি স্ক্রোল তৈরি করেছিলেন এবং আরও অনেক যিহূদী ধর্মীয় গ্রন্থ সংরক্ষণ করেছিলেন, যেগুলো তারা তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহার করতেন, সেগুলো সম্পর্কেও একটা ধারণা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু

নতুন নিয়মের পটভূমি ও প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব

ডেড সি স্ক্রোলগুলো যীশুর সময়ের ঠিক আগে লেখা এবং অনুলিপি করা হয়েছিল, তাই নতুন নিয়মের জগৎ এবং প্রাথমিক খ্রীষ্টিয় ধর্ম-বিশ্বাস বোঝার জন্য সেগুলো গুরুত্ব বহন করে।

রোমের সাথে যিহূদীদের যুদ্ধ এবং যিরূশালেম এবং পবিত্র মন্দির (৬৬-৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) ধ্বংস হওয়ার পর বেঁচে যাওয়া যিহূদীরা এবং যারা ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাস এবং পঞ্চপুস্তকের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রকাশ করার উপায় খুঁজে পেয়েছিল তাদের বিষয়গুলোও প্রাথমিক খ্রীষ্টধর্মের পটভূমি হিসাবে আমাদের জানা প্রয়োজন। তখনকার যিহূদীরা সাহিত্যের একটি সম্পদ গড়ে তুলেছিল যা প্রায়শই ঐতিহ্যগুলোকে প্রতিফলিত করে যা যীশু এবং প্রাথমিক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সময়ের সাথে সম্পর্কীত। তাদের কিছু লেখা যীশুর সময় থেকে শুরু করে একাধিক প্রজন্মের যিহূদী চিন্তাধারাকে প্রতিফলিত করে যা যীশুর আগে এবং তাঁর সময়কালের যিহূদী অনুশীলনগুলো বোঝার জন্য দরকারী। এই যিহূদীরা খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত যে সাহিত্য তৈরি বা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছিল তা রাব্বিনিক ঐতিহ্য হিসাবে পরিচিত।

যিরূশালেম মন্দির ধ্বংস হওয়া এবং মন্দিরের উপাসনার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির পরে, কিছু রাব্বি রোমের কাছে জামনিয়ায় (বা ইয়াভনেহ) একত্রিত হওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন, যাতে নির্ধারণ করা যায় যে, যিরূশালেমে প্রচলিত উৎসর্গ সম্পর্কীয় ব্যবস্থার সাথে আবদ্ধ একটি বিশ্বাস মন্দিরের ধ্বংসের পরেও কীভাবে অব্যাহত থাকতে পারে। বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে এই রাব্বিরা গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যের একটি বড় অংশ সংগ্রহ করেছিল এবং লিখেছিল যার মধ্যে মিশনাহ্‌, মৌখিক আইন-কানুন বা তোসেফতা এবং দুটি তালমুদ (বা তালমুদিম) অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সাহিত্যগুলো অবশ্যই বিচক্ষণতার সাথে পড়তে হবে কারণ এটি সর্বদা নতুন নিয়ম সময়ের সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে না; যাহোক, এটি নতুন নিয়মের বিভিন্ন পুস্তকগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য দরকারী উপাদান সরবরাহ করে।

নতুন নিয়ম সম্পর্কে আমাদের গবেষণায় আরও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতিগুলোর মধ্যে একটি ছিল এই যে, যীশুর সময়ে ইস্রায়েলের দেশে কেবল কয়েকটি যিহূদী সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত ছিল না, তবে যিহূদী ধর্ম নিজেই সেই সময়কার প্রভাবশালী সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, যিহূদী ধর্মের মধ্যে গ্রীক এবং তারপরে রোমান সাংস্কৃতিক প্রভাবগুলোর অনেক প্রতিফলন ঘটেছিল। ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রতি যিহূদীদের বিশ্বস্ততা গ্রীক ও রোমান শাসকদের একটি জগতে কিভাবে পরিমাপ করা যায় এবং গ্রীক এবং তারপরে গ্রীক-রোমীয় শিক্ষা, তাদের ধর্ম, স্থাপত্য, অর্থনীতি এবং রাজনীতির চাপের প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে

নতুন নিয়মের পটভূমি ও প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব

কিভাবে তারা জীবন যাপন করতো তা আমাদের জানা প্রয়োজন নতুন নিয়মের সময় সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাবার জন্য। চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে মহান আলেকজান্ডারের বিজয়ের পর থেকে ৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত নতুন নিয়মের জগৎ, এবং যিহূদী জনগণ গ্রীক (বা হেলেনিস্টিক) সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণে এসেছিল এবং তাদের অনেক বিদ্বান নেতারা তাতে প্রভাবিত হয়েছিল। আর এই প্রভাব প্রভু যীশু ও তাঁর অনুসারীদের সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

ইস্রায়েল দেশের বাইরে অর্থাৎ, প্রবাসী যিহূদীরা কিভাবে জীবন-যাপন করতো সেই বিষয়গুলোও নতুন নিয়ম বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। যেহেতু রাব্বিনিক ঐতিহ্য এবং এর সাহিত্যগুলো কেবল হিব্রু এবং অরামিক ভাষায় লেখা হয়েছিল, কিন্তু ইস্রায়েলের পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণে যেসব যিহূদী গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষায় কথা বলতো, তারা খ্রীষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দী পর্যন্ত এই ঐতিহ্য দ্বারা খুব বেশী প্রভাবিত হয় নি। বৃহত্তর ভূমধ্যসাগরীয় বিশ্বে বসবাসকারী যিহূদীরা যিহূদী ধর্মগ্রন্থের গ্রীক অনুবাদ সেপ্টুয়াজিন্ট (LXX) দ্বারা প্রভাবিত ছিল। হিব্রু বাইবেলের এই গ্রীক অনুবাদ, গ্রীক ভাষায় রচিত আরও কিছু পুস্তক প্রাথমিক মণ্ডলীগুলো ব্যবহার করতো। ৬৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রোমীয়রা ইস্রায়েল দেশের উপর প্রচণ্ড শক্তিধর হয়ে ওঠার পরে হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি বেশ প্রভাবশালী হয়ে উঠে। ভূমধ্যসাগরীয় বিশ্ব জুড়ে ভ্রমণের সময়, লোকেরা সহজেই গ্রীক ভাষায় কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে পারতো এবং হেলেনিস্টিক সংস্কৃতির প্রভাবের বিস্তৃতির সুযোগে অন্যদের সঙ্গে সহজেই মেলামেশা করতে সক্ষম হতো।

কিছু নতুন নিয়মের লেখকের কোন কোন লেখায় তখনকার লেখকদের কোন কোন উদ্ধৃতি উঠে এসেছে যাতে প্রকাশ পায় যে, তাঁরাও গ্রীক-রোমীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা যে ঘটনাগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলোর মধ্যে কিছু বিষয় কিছু গ্রীক এবং রোমান ইতিহাসবিদ এবং কবিদের লেখাগুলোতেও পাওয়া যায়। গ্রীস এবং রোমীয় জগতের মহাকাব্য, ইতিহাস, দর্শন, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অনুশীলন, এবং আরও অনেক কিছু সম্পর্কে নতুন নিয়মের লেখকগণ পরিচিত ছিলেন এবং তাদের অনেক কিছুই তাঁদের লেখায় উঠে এসেছে।

যোহনের সুসমাচার অনুসারে, "আর সেই বাক্য মানব দেহে মূর্তিমান হলেন এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করলেন" (যোহন ১:১৪ পদ), অর্থাৎ, এটি যে সুসমাচার উপস্থাপন করে তার একটি কালজয়ী আবেদন থাকলেও, নতুন নিয়ম সাক্ষ্য দেয় যে, একটি নির্দিষ্ট সময় এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানে খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পৌল

নতুন নিয়মের পটভূমি ও প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব

আকিলা এবং প্রিস্কিল্লার সাথে তাঁবু তৈরির সাথে যুক্ত হয়েছিলেন (প্রেরিত ১৮:৩)। করিন্থীয়ের লোকেরা জানত যে, প্রতিমাদের কাছে উৎসর্গীকৃত মাংসের স্বাদ কি রকম, এবং খ্রীষ্টের সেই অনুসারীরা যাদের কাছে পিতর তাঁর পত্র ১ পিতর লিখেছিলেন তারা জানতো কিভাবে বিশ্বাসীদের সঙ্গে তখনকার লোকেরা ব্যবহার করতো। তাদের লেখার প্রতিটি পৃষ্ঠায় তৎকালীন সময় এবং স্থানগুলোর সাক্ষ্য বহন করে। তারা আর যাই হোক না কেন, এই পুস্তকগুলো সেই সময়কার সাংস্কৃতিক জগতের মধ্যেই লেখা হয়েছিল।

নতুন নিয়ম বার্তা বোঝার জন্য তৎকালীন সময়ের প্রসঙ্গ ও সামাজিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যারা নতুন নিয়ম জগতের বিষয়ে ভালভাবে বুঝতে চাই ও আরও দক্ষ হয়ে উঠতে চাই তাদের জন্য নতুন নিয়মের পটভূমি আবিস্কার করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

[পবিত্র সেপালকার চার্চ, যিরূশালেম]